আরও দুই ঋজুদা

বুদ্ধদেব গুহ

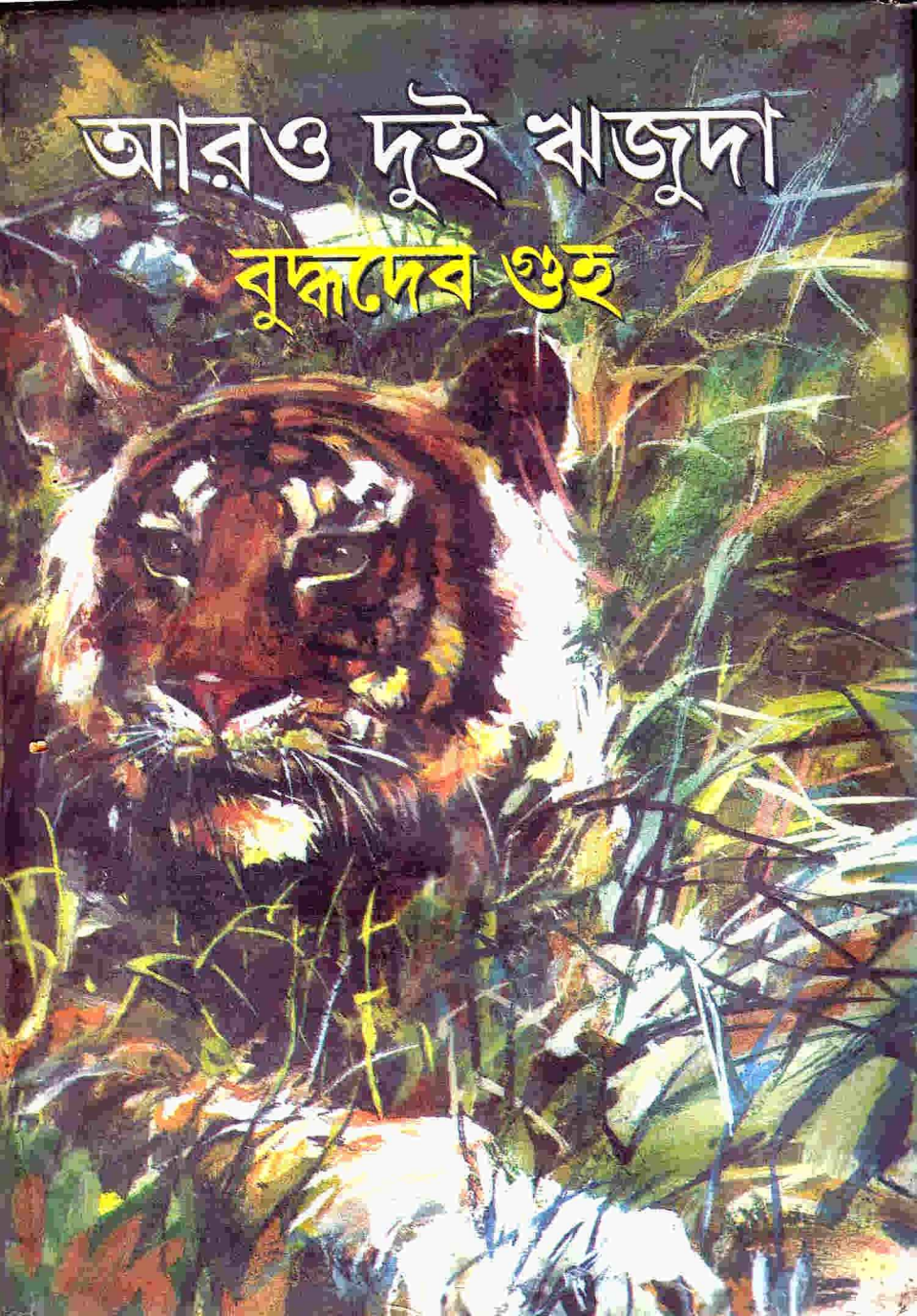

Ayan Chatterjee
Digitally signed by Ayan Chatterjee
DN: cn=Ayan Chatterjee, c=BD, o=Ayan Softex, email=ayan.00.84@gmail.com
Date: 2010.08.24 19:27:13 +06'00'

সাহিত্যম্ প্রকাশিত

লেখকের অন্যান্য বই

- চারুমতি
- দুটি উপন্যাস
- রাগমালা
- বাবলি
- বাসনাকুসুম
- মাণ্ডুর রূপমতী
- বইমেলাতে
- দু'নম্বর
- নগ্ন নির্জন
- ঋজুদার সঙ্গে সেশোলস্-এ
- ছ'টি উপন্যাস
- তিন ঋজুদা
- পাখসাট
- আরও তিন ঋজুদা কাহিনী
- ঋজুদার চার কাহিনী
- প্রিয় গল্প
- বাংরিপোসির দু'রাত্তির
- ছায়ারা দীর্ঘ হলো
- ছৌ
- জগমগি
- যুযুধান
- বাতিঘর
- ঋজুদার যুগল অ্যাডভেঞ্চার
- পরিযায়ী
- দু'টি উপন্যাস
- দুটি ঋজুদার কাহিনী

বুদ্ধদেব গুহ'র জলরঙে আঁকা ছবির অ্যালবাম

www.boiRboi.blogspot.com

প্রজাতি, প্রজাপতি

www.boiRboi.blogspot.com

ঋজুদার বাড়ি থেকে বেরিয়ে আমি আর ভটকাই একটা ট্যাক্সি ধরলাম। আমাদের পরশুই বেরিয়ে পড়তে হবে নাগপুরের উদ্দেশে। এবারে নোটিসটা বড় কম দিল ঋজুদা। ঋজুদা অবশ্য কালই সন্ধের ফ্লাইটে চলে যাবে নাগপুর। আমরা যাব পরশু। হাওড়া-বম্বে মেইল-এ এসি টু টিয়ারে। নাগপুরে পৌঁছতে পৌঁছতে পরদিন বিকেল। বিকেল গড়িয়ে রাতও হয়ে যেতে পারে। নতুন রেলমন্ত্রী লালুপ্রসাদের দয়ার ওপরে নির্ভর করবে।

ভটকাই বলল, যার নিজের বার্থই এখনও ও.কে. হয়নি তার জমানাতে 'ত রেলগাড়িতে নিশ্চিন্তে চড়া যাবে না। তবে ভাঁড়ে চা খেতে হবে। আমার তো ভাঁড়ে চা খেতে খুব ভালো লাগে। সুন্দর গন্ধ বেরোয় ভাঁড় থেকে।

—ভাঁড়কে 'কুলহার' বলে হিন্দিতে? না রে?

—হ্যাঁ। আমি বললাম।

এখন বসন্ত শেষ হয়ে গ্রীষ্ম এসেছে তাই মালপত্র আমাদের বেশি হবে না। আমি তো জিন্স আর সুতির টি শার্ট পরেই কাটিয়ে দেব।

বাহুল্যর মধ্যে জগিং শু আর গল্ফ খেলার টুপি। মেজমামা টলিতে গল্ফ খেলে। মেজমামাই প্রেজেন্ট করেছে। টলিক্লাব-এর ভিতরে একটা দোকান আছে—সব গল্ফওয়্যার পাওয়া যায়। গেঞ্জি, জুতো, মোজা, টুপি, শর্টস্। দারুণ দোকান। মেজমামার সঙ্গে গেছিলাম একবার। তারপর মস্ত খড়ের চালার নীচে বসে চা খেয়েছিলাম।

চৌরঙ্গিতে এসে ট্যাক্সিটা ছেড়ে দিলাম। আজকাল যা ট্যাক্সি ভাড়া হয়েছে তাতে আমাদের মতো ছাত্রদের পক্ষে ট্যাক্সি চড়া প্রায় অসম্ভব। ওখান থেকে ভটকাই একটা মিনি ধরে নিল। আমি গেলাম হগসাহেবের বাজারে। কিছু কেনাকাটার ছিল। ফেরার সময়ে মিনি ধরেই ফিরে যাব বাড়িতে। আজ রবিবার। মা মোচার চপ রাঁধবেন বিকেলে চা-এর সঙ্গে খাওয়ার জন্যে। বাবা বাড়িতে আছেন। বাবাকে এতই ঘুরে বেড়াতে হয় কাজে সারা ভারতবর্ষে যে রবিবারেও বাড়িতে থাকা হয় না। আজ তাড়াতাড়ি না ফিরতে পারলে ঠাণ্ডা চপ মাইক্রোআভেনে গরম করে খেতে হবে নিজেকেই। অত ঝামেলা করতে হলে খাওয়ার আনন্দই চলে যায়। তাছাড়া মায়ের বকুনিও খেতে হবে : "বাবা যেসব ছুটির দিনে বাড়িতে থাকেন সেই সব দিনেও তোমার 'অকাজ' কি বন্ধ রাখা যায় না?" মাকে কী করে বোঝাই কোনটা কাজ আর কোনটা অকাজ। ঋজুদার সঙ্গে এই যে দেশ বিদেশের বনে বাদাড়ে অ্যাডভেঞ্চারে বা রহস্যভেদে যাই নানা জায়গাতে এটা যে আমাদের সেফ্‌টি ভাল্‌ভ। দরকার নেই আর কোনও খেলার মাঠের। আমাদের সঙ্গে অন্য দশজন ছেলেমেয়ের মধ্যে যে তফাৎ তা তো এই জন্যেই। প্রকৃতির মন্ত্রে ঋজুদা দীক্ষা দিয়েছে আমাদের। আমাদের আর কোনও গুরুরই দরকার নেই। তবে মা বিরক্ত হলেও বাবা কিন্তু অ্যাপ্রিসিয়েট করেন। বাবা বলেন, জীবনে square হতে হবে, চৌকস। শুধু পড়াশুনো, শুধু কেরিয়ার বিল্ডিং করার দরকার নেই। মানুষ হতে হবে। রবীন্দ্রনাথ যাকে বলতেন পূর্ণ মানুষ।

www.boiRboi.blogspot.com

ঋজুদাও তো ঠিক এই কথাই বলে। যদিও মুখে বলে না। তার ব্যবহার দিয়েই শেখায় আমাদের। বাবার সঙ্গে ঋজুদার খুব কম দেখা হলেও দুজনের মধ্যে এক গভীর সখ্য আছে। বাবা ঋজুদাকে ডাকেন 'বোসমশাই' বলে। গতরাতেই মাকে খাবার টেবিলে বসে রাতে খাবার সময়ে বলেছিলেন : ওরা নাগপুর থেকে ফিরে এলে বোসমশাই আর তার অন্য চেলাদেরও একদিন খেতে বলো।

মা বললেন, আমাদের বাড়িতে কি তেমন ভালো রান্নার লোক আছে? পেলেও তো থাকে না। তাছাড়া যখন থাকে তখনও তো রাতে থাকতেই চায় না। তাই কারোকেই বলতে পারি না। তার চেয়ে চলো 'মেইনল্যান্ড চায়না' বা 'ওহ্ ক্যালকাটা'তে গিয়ে খাব।

আমি বলেছিলাম, হর্ষ নেওটিয়ার সল্ট লেক-এর সিটি সেন্টারে 'মেইনল্যান্ড চায়না' থাই খাবারের রেস্তোরাঁ খুলছে। সেখানেও যাওয়া যায়। মনে হয়, নাগপুর থেকে ফিরে আসতে আসতে খুলেও যাবে রেস্তোরাঁ।

মা বললেন, তোমার ছেলেকে তো কেরিয়ারিস্ট হতে বারণ করছ অথচ তার নজরটা এমনই উঁচু যে অঢেল টাকা না রোজগার করলে তো এই নজর চলবে না।

—টাকা রোজগার করবে না কেন? তবে টাকাই যেন জীবনের মোক্ষ না হয় এই কথাটা সমসময়েই মনে রাখতে হবে। বড়লোক মাত্রই খারাপ মানুষ নন আবার বড়লোকিই মানুষের সাফল্যর একমাত্র নিদর্শন নয়। ঋজু বোস কি গরিব? সে তো মস্ত বড়লোক আবার তারই সঙ্গে একজন মস্ত মানুষও। বোসমশাইকে আদর্শ করলেই আমাদের ছেলে জীবনে তরে যাবে।

আমি মুখে কিছু না বললেও মনে মনে বলেছিলাম, ঠিক। একেবারে ঠিক। আমি তিতির আর ভটকাই তো তাই করেছি—তাই তো আমাদের সঙ্গে সমসাময়িক অন্যদের মেলে না। আমরা আমরাই।

২

তিতির তাদের গাড়িতে আলাদা এসেছিল। আমরা ঠিক করেছিলাম যে হাওড়া স্টেশনের বড় ঘড়ির নীচে দাঁড়িয়ে একে অন্যের জন্যে অপেক্ষা করব। তারপর সেখান থেকে সাউথ ইস্টার্ন রেলওয়েজের নতুন প্লাটফর্মে গিয়ে ট্রেনে চড়ব। ভটকাই দাঁড়িয়েই ছিল। আমি গিয়ে পৌঁছবার পরে পরেই তিতিরও এসে পৌঁছল। সকলেরই একটা করে ছোট স্যুটকেস এবং কাঁধে ঝোলানো একটা ব্যাগ।

রিজার্ভেশন চার্ট দেখে নিজেদের কম্পার্টমেন্ট এবং বার্থ দেখে থিতু হলাম। তিতিরের আপার বার্থ। আমার আর ভটকাই-এর লোয়ার বার্থ। ওপরের অন্য বার্থে একজন মারাঠি ভদ্রলোক। ঋজুদার বয়সীই হবেন।

ট্রেন ছাড়ার পনেরো মিনিটের মধ্যেই যথারীতি ভটকাই তাঁর

www.boiRboi.blogspot.com

সঙ্গে আলাপ জমিয়ে নিল। আমি আর তিতির মুখ চাওয়াচাওয়ি করলাম। শুনলাম ভদ্রলোকের নাম গিরিশ কানিটকর। মুম্বইয়ের আকাশবাণীতে কাজ করেন। অনেকদিন নাগপুরের আকাশবাণীতে ছিলেন। এখন তিন বছর হল মুম্বইতে আছেন। কলকাতায় তাঁর শালী থাকেন। ভায়রাভাই স্ট্যানডার্ড চার্টার্ড ব্যাঙ্কে কাজ করেন। নিজের স্ত্রী বিয়োগ হয়েছে দু'বছর হল। ছেলেমেয়ে নেই। বড়ই নিঃসঙ্গ বোধ করেন। তাই প্রিয় শালীর কাছে বেড়াতে এসেছিলেন। শালীর ছেলেমেয়েদেরও খুব ভালোবাসেন নিজে নিঃসন্তান বলেই।

আমি ভাবছিলাম, ভটকাই-এর ক্ষমতা আছে। কত সহজে যে যে-কোনও মানুষের সঙ্গে মিশে গিয়ে তার পেট থেকে সব কথা টেনে বের করতে পারে তা দেখলে অবাক হতে হয়। ঋজুদারও এই গুণটি আছে। তবে আমি আর তিতির ওই গুণটি পাইনি। ভটকাই বলে, তোরা অত রিজার্ভ থাকিস কেন?

ভটকাই যে গিরিশ কানিটকর-এর কুষ্ঠী-টিকুজী জেনে নিল তাই-ই নয়। আমাদের সম্বন্ধেও অনেক কিছু তাঁকে বলে দিল। ঋজু বোস-এর কথা বলল। গিরিশবাবু বললেন ঋজুদার নাম শোনেননি। আমরা নাগপুর থেকে নাগজিরা টাইগার রিজার্ভ-এ যাব শুনে বললেন, বাঃ বাঃ। আমি যতদিন নাগপুরে ছিলাম প্রতি বছরই শীতে একবার করে সেখানে যেতাম, সস্ত্রীক। ভারী সুন্দর জঙ্গল। মধ্যে মধ্যে পাহাড়। গাউর, চিতল, শম্বার, চিতা এবং বাঘের আড্ডা। প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড শুয়োরও আছে অনেক। জংলী কুকুরও আছে। ভাল্লুক। নাগজিরাতে যত উইয়ের ঢিপি আছে তেমন খুব কম জঙ্গলেই দেখা যায়।

তারপর বললেন, নাগজিরাতে লোকে বাঘ এবং অন্যান্য জানোয়ার দেখতেই যান কিন্তু খুব কম মানুষই জানেন যে নাগজিরা

প্রজাপতির জন্যে বিখ্যাত। সেখানে অনেক বিরল প্রজাপতির বাস। এই জন্যেই পৃথিবীর নানা জায়গা থেকে লেপিডপটারিস্টরা আসেন নাগজিরাতে।

ভটকাই বলল, শব্দটার মানে কী?

গিরিশ কানিটকর হেসে বললেন, ইংরেজিতে বানান করে বলি?

—হ্যাঁ তাই বলুন।

উনি বলার আগেই তিতিরই বানান করে বলল LEPIDOPTERIST।

গিরিশবাবু বললেন, বিলকুল।

বুঝলাম যে তিনি বলছেন, ঠিক।

তিতির ভটকাইকে বলল, প্রজাপতিদের প্রজাতির বৈজ্ঞানিক নাম LEPIDOPTERA যেমন ছারপোকাদের HETEROPTERA। LEPIDOPTERA সম্বন্ধে যাঁরা বিশেষজ্ঞ তাঁদেরই বলে LEPIDOPTERIST।

ভটকাই বলল, হেটেরাপটোরাটা জানতাম। রুদ্র আমাকে শিখিয়েছিল অনেকদিন আগেই।

গিরিশ কানিটকরের কাছে আমাদের দলের ভটকাই ওই প্রশ্ন করাতে তিতিরের অভিমানে লেগেছিল। তিতির হাতের কাছে থাকতে ভটকাই কেন বাইরের মানুষের কাছে প্রশ্ন করে নিজেদের অজ্ঞতা জানান দিল?

গিরিশবাবু বললেন, নাগজিরাতে এখন যাচ্ছেন। এখন তো বেশ গরম পড়ে গেছে। তাছাড়া নাগজিরার মেইন বাংলো, ডর্মিটরি, ক্যানটিন অথবা কটেজেও ইলেকট্রিসিটি নেই। দুপুরবেলাটা খুবই কষ্ট হবে।

তারপর বললেন, নভেগাঁও-এ যাবেন না?

www.boiRboi.blogspot.com

—সেটা কোথায়?

নাগজিরার কাছেই। ইন ফ্যাক্ট, নাগজিরা পথের বাঁদিকে। একই পথে সাকোলি থেকে কিছুটা আগে গিয়ে ডানদিকে যেতে হবে নভেগাঁও পৌঁছতে।

—সেখানে কী আছে?

আমি বললাম।

—সেখানে মস্ত বড় হ্রদ আছে আর বার্ড স্যাংচুয়ারি। শীতকালে নানা দেশের পরিযায়ী পাখিরা এসে ভিড় জমায়। সকাল সন্ধে পাখির ডাকে মাথা গরম হয়ে যায়।

ভটকাই গিরিশ কানিটকরের কাছে হারতে রাজি নয় বলে বলল, আপনি ওড়িশার চিলিকা হ্রদ-এ গেছেন কখনও? অত বড় হ্রদ আর অত পাখি ভারতের খুব কম জায়গাতেই প্রতি বছরে আসে এবং থাকে। সারা বছরও থাকে পাখি। সেখানের জলে পাখির ডানার আঁশটে গন্ধ।

গিরিশবাবু ভটকাই-এর ঝগড়ুটে অ্যাটিচুডকে পাশ কাটিয়ে গিয়ে বললেন, আমি কী করে যাব! চাকরির সূত্রে নাগপুরে ছিলাম তাই কাছেপিঠে যা দর্শনীয় জায়গা আছে তাই দেখেছি। আমার স্ত্রী ছিলেন বটানিস্ট। গাছগাছালিকে খুব ভালবাসতেন। আন্ধারি তড়োবাতেও গেছি দু'বার।

—সেখানে আমরাও গেছি। ভূতগাছ আছে না? KARU-GUM TREES ?

ভটকাই বলল।

—হ্যাঁ। সত্যি প্রকৃতির এক বিস্ময়।

তিতির বলল, আকাশবাণীতে আছেন বললেন তাই জিজ্ঞেস করছি, আপনি কি গায়ক? না বাদক?

কানিটকর সাহেব হেসে ফেলে বললেন, দুটোর কোনওটাই নই। আমি অ্যাকাউন্ট্যান্ট।

চার্টার্ড অ্যাকাউন্ট্যান্সি পাস করে চাকরিতে ঢুকে যাই।

—গানবাজনা কি একেবারেই করেন না?

—মারাঠিরা এ বাবদে বাঙালিদেরই মতন। গানবাজনা সকলেই ভালোবাসেন। তবে আমি জানি না। আমার স্ত্রী খুব ভালো ভজন গাইতেন।

তারপর বললেন, আপনারা মারাঠি ভজন শুনেছেন কখনও? বিঠলদাস-এর ভজন?

তিতির বলল, কলকাতায় 'সানি-টাওয়ার্স'-এ জয়ন্ত চ্যাটার্জির বাড়িতে কয়েকমাস আগেই শুনেছি বিঠলদাস-এর ভজন পণ্ডিত ভীমসেন যোশির গলাতে। আহাঃ কী গান! দু'কান এখনও ভরে আছে।

—যোশিজীর কথা আলাদা। ওঁর মতো ক'জন গাইতে পারেন? আর কী ঈশ্বরপ্রেম? ওঁর 'যো ভজে হরিকো সদা' সম্ভবত হাজারবার শুনেছি কিন্তু কখনওই পুরনো হয় না। যতবার শুনেছি ততবারই কেঁদেছি।

গিরিশ কানিটকর বললেন।

তিতির আর আমি সমস্বরে বললাম, তা ঠিক।

কানিটকর সাহেব এবার ভটকাইকে জিজ্ঞেস করলেন, আপনি কি কারও মুখে মারাঠি ভজন শোনেননি?

ভটকাই জ্যাঠার মতো বলল, ম্যায় Gun কি সমঝদার হুঁ। গানা কি নেহি।

কানিকটর এই অদ্ভুত উত্তরে একটু থমকে গেলেন।

আমি ভাবছিলাম, কিছু কিছু মানুষ আছেন যাঁরা কথা বলতে

www.boiRboi.blogspot.com

ভারী ভালোবাসেন কানিটকর সাহেবের মতো। নইলে একঘণ্টাও ছাড়েনি ট্রেন তারই মধ্যে তাঁর সম্বন্ধে সবকিছু জেনে গেলাম আমরা। আবার এও ঠিক যে ভটকাই-এর মতোও কিছু মানুষ থাকেন যাঁরা নিজেরা ত কথা বলেনই অন্যদেরও কথা বলিয়ে নিতে জানেন। ভটকাই-এর এই গুণটি কখনও কখনও আমাদের খুবই কাজে লেগে যায়।

ভটকাই জিজ্ঞেস করল, কটা নাগাদ পৌঁছব আমরা নাগপুরে?

—সকালে বিলাসপুর, তারপর দুর্গ, তারও পরে ভিলাই, রায়পুর। রায়পুর থেকেও বেশ দুর নাগপুর। নাগপুর হচ্ছে কলকাতা আর মুম্বই-এর ঠিক মাঝামাঝি, কাক উড়ানে গেলে অবশ্য।

তারপর বললেন, কটাতে পৌঁছবেন সেটা অবান্তর। ট্রেনে যখন উঠে পড়েছেন তখন ঠিকই পৌঁছবেন। যতক্ষণ না পৌঁছচ্ছেন রিল্যাক্স করুন। আমি তো এই জন্যই সবসময়ে আপার বার্থ নিই। নাক ডাকিয়ে ঘুমোতে ঘুমোতে যাই দিনমানেও—ওপরে তো কেউ বিরক্ত করতে পারে না!

—তা ঠিক।

ভটকাই বলল, বিজ্ঞর মতো।

৩

পথে একটা মোষকে ধাক্কা দেওয়াতে এবং মোষ লাইনের ওপরেই পড়ে থাকাতে প্রায় ঘন্টাখানেক দাঁড়িয়ে থাকল ট্রেন বিলাসপুর থেকে ছাড়ার পরেই। নাগপুরে পৌঁছতে পৌঁছতে বিকেল হয়ে গেল। দেখলাম প্রদীপকাকু আর সঞ্জীবকাকু এসেছেন স্টেশনে।

—ঋজুদা এলেন না?

ভটকাই বলল।

—না। ঋজুদার একটা সেমিনার আছে পাঁচটাতে ইউনিভার্সিটি সেন্টেনারি হল-এ।

—কী বিষয়ের সেমিনার?

—"Effect of globalisation on Bengali literature and culture." আমরাই বিষয় নির্বাচন করে দিয়েছিলাম। উনি ছাড়াও অনেকে বলবেন—আলোচনা হবে। তবে আজই শেষদিন। তোমরা সেখাবে যাবে? না গেস্ট হাউসে গিয়ে বিশ্রাম করবে?

তিতির বলল, যেতে পারলে তো ভালোই হতো, কিন্তু মনে হয় এখন না গেলেই ভালো।

ভটকাই বলল, আমি সোজা গিয়ে শাওয়ারের নীচে দাঁড়াব। তাছাড়া, পেটে ছুঁচোয় ডন মারছে।

প্রদীপ আর সঞ্জীব গাঙ্গুলি বললেন, তাহলে তাই চলো।

—যেবারে আন্ধারি তাড়োবাতে যাই সেবারে তো মহারাষ্ট্র ইলেকট্রিসিটি বোর্ড-এর গেস্ট হাউসে উঠেছিলাম, সেমিনারি হিল্‌স-এ। তাই না?

হ্যাঁ। তবে এবারে নীরিতে থাকবে তোমরা।

—ভটকাই বলল, আর ঋজুদা?

—ঋজুদাও সেখানেই থাকবেন। তিনটি স্যুইট নেওয়া হয়েছে।

—নীরিটা কী ব্যাপার!

তিতির বলল।

নীরি মানে National Institute of Environmental Engineering। তারই গেস্ট হাউস। চমৎকার নিরিবিলি পরিবেশ। ওয়ার্ধা রোড-এর ওপরে। মনেই হবে না যে শহরে আছ।

ভটকাই বলল, এসি আছে তো? বেশ গরম পড়ে গেছে।

আমি ভাবলাম, বড্ড বেড়েছে। এমনই ভাব যেন কলকাতাতে সবসময়ে এসি-তেই থাকে। বড় চালিয়াৎ হয়েছে ভটকাইটা। ঋজুদাকে বলতে হবে। অবশ্য বলে কী হবে? ঋজুদাই তো লাই দিয়ে দিয়ে মাথায় চড়িয়েছে ওকে।

সঞ্জীবকাকু বললেন, ড্রয়িংরুম বেডরুম সবই এয়ারকন্ডিশন্‌ড। তোমরা আমাদের অতিথি, তোমাদের কি কষ্ট দিতে পারি? তপনদা, মানে তপন চক্রবর্তী ওখানকার ডিরেক্টর। ওঁর অতিথি হয়ে থাকবে তোমরা। কোনও কষ্টই হবে না।

www.boiRboi.blogspot.com

ভটকাই-এর যেন তাতেও শান্তি হল না। স্টেশনের বাইরে বেরিয়ে প্রদীপকাকুর আনা এয়ারকন্ডিশনড্ টাটা স্যুমোতে চড়তে চড়তে বলল, আমরা তো কালই যাব নাগজিরা।

—হ্যাঁ।

—এসি গাড়িতে যাব তো?

তিতির বলল, এনাফ ইজ এনাফ। স্টপ ইট ভটকাই। আমি কিন্তু ঋজুকাকাকে বলে দেব তোমার এই অসভ্যতার কথা।

প্রদীপকাকু বললেন, আরে তাতে কী হয়েছে। নাগপুরে গরমটা তো বেশিই কলকাতার থেকে। তবে শুকনো গরম—কলকাতার মতো প্যাচপ্যাচেঘাম হয় না।

ভটকাই চুপ করে গেল। আমার রাগের চোখও সম্ভবত ওর নজর এড়ায়নি।

নীরির গেস্টহাউসে পৌঁছে সত্যিই মন ভরে গেল। কোনও বাহুল্য নেই কিন্তু সবকিছুই আছে।

সঞ্জীবকাকু মোবাইল ফোনে কার সঙ্গে যেন কথা বললেন। তারপর বললেন, ঋজুদার কাজ শেষ হয়ে গেছে। গতকালের সেশনটাই হেভি ছিল। আজকে তো শুধু সামিং-আপ। আধঘণ্টার মধ্যেই চলে আসছেন। তোমাদের চানটান করে রেডি থাকতে বললেন। আমরা সবাই বাইরে খেতে যাব।

—ফা-স-কে-লা-স।

ভটকাই বলল।

তারপর আমার আর ভটকাই-এর স্যুইট আর তিতিরের স্যুইট দেখিয়ে দিয়ে ওঁরা বললেন, আমরা যাচ্ছি। আটটা নাগাদ আবার আসব। যদি কিছু খেতে চাও তাহলে ইন্টারকম্-এ বলে দেবে। কিচেনের সঙ্গে কানেকশন আছে।

www.boiRboi.blogspot.com

ওঁরা চলে গেলে আমি বললাম, আটটা মানে ন'টা। নাগপুরের এই কাকুদের কোনও তুলনা হয় না কিন্তু একটাই দোষ—সময়জ্ঞানটা কম।

তিতির বলল, ছোট ছোট শহরে এরকমই হয়।

নাগপুর ছোট শহর? বিদর্ভের রাজধানী ছিল। গুজু ভাইদের ব্যবসার রমরমা না থাকলে মহারাষ্ট্রের রাজধানী নাগপুরই থাকত চিরদিন।

ভটকাই বলল, কলকাতাতেই বা কে সময় মানে? সময়ই যদি মানত, নিয়মানুবর্তী যদি হত তবে কি আজ আমাদের বাঙালিদের এই অবস্থা হয়! মন্ত্রী, আমলা, অধ্যক্ষ, অধ্যাপক, বড়বাবু, করণিক—সময়জ্ঞান প্রায় কারওরই নেই। ঋজুদার সঙ্গে মাসখানেক এঁদের রাখলে ঋজুদা টিট করে দিত।

—ঋজুদার কি দায় পড়েছে? যার যার কর্মফল তার নিজেরই ভুগতে হবে।

তিতির বলল, জ্যাঠামশাই-এর মতো।

৪

গাছগাছালিতে ঢাকা চমৎকার নিরিবিলি রাস্তা নীরির ক্যামপাসের ভিতরে। গাড়িও আধঘণ্টাতে একটা যায় কী যায় না। একেবারে নিরুপদ্রব। ঘুম থেকে উঠে সকলেই ঋজুদার সঙ্গে পাখির ডাকের মধ্যে আলোছায়ায় মোড়া পথে হেঁটে এলাম প্রায় পঁয়তাল্লিশ মিনিট। বেরিয়েছিলাম বেড-টি খেয়ে। ফিরে চান করে সবাই আমাদের ঘরেই ব্রেকফাস্ট আনিয়ে ব্রেকফাস্ট করলাম। সবাই কলা, দোসা আর কফি খেলাম কিন্তু সাহেব মিস্টার ভটকাই কর্ণফ্লেক্স, দুধ আর স্ক্র্যাম্বল্‌ড এগস্ খেল কফির আগে।

নাগজিরাতে কিছুই পাওয়া যায় না, মানে খাদ্যসামগ্রী। সবকিছুর জন্যেই বেশ কয়েক মাইল জঙ্গল পেরিয়ে ফরেস্ট গেট পেরিয়ে বড় পিচ রাস্তাতে এসে কেনাকাটা করতে হয়। ক্যান্টিনে অবশ্য সাদামাঠা খাবার পাওয়া যায়। বিশেষ কিছু খেতে হলে রসদ নিজেদেরই দিতে হয় এনে। তাই বাজার দোকান সেরে প্রদীপকাকুরা যখন একটা

www.boiRboi.blogspot.com

ছাই-রঙা এসি কালিস করে ফিরে এলেন নীরিতে তখন সাড়ে দশটা বাজে। তার পরপরই ঋজুদার বন্ধুস্থানীয় কলকাতার তপন মিত্রদের কোম্পানি মিত্র এস কে কোল ইন্সপেকশন থেকে একটা কালো এসি স্করপিও গাড়ি এসে পৌঁছল এবং সঙ্গে সঙ্গে প্রদীপকাকুর মোবাইলে একটা দুঃসংবাদও। কয়েকজন জার্মান লেপিডপটারিস্ট নাগজিরা এবং নভেগাঁওতে নাকি এ সময়েই যাচ্ছেন। দিল্লির জার্মান অ্যাম্বাসাডরের অনুরোধে অন্য সব রিজার্ভেশন ক্যানসেল করে দেওয়া হয়েছে। তবে প্রদীপ মৈত্রকাকু চিফ মিনিস্টারের সেক্রেটারিয়েটের সঙ্গে কথা বলে জেনেছেন যে চারজন নয় দু'জন আসছেন সঙ্গে একজন ফরাসি লেপিডপটারিস্ট। তাই ঋজুদা এবং আমাদের থাকার জায়গা কষ্টেসৃষ্টে হলেও বাকি দলের মধ্যে মাত্র একজন যেতে পারবেন। আমি আর ভটকাই না হয় ডর্মিটারিতেই থাকব। সকলে গেলে, অন্য তিনটে ঘর তো কম করে লাগবেই। ওঁরা সবসুদ্ধ মহিলারা সুদ্ধ পাঁচজন যাবেন বলে ঠিক হয়েছিল সেই জায়গাতে মাত্র প্রদীপকাকু একাই যেতে পারবেন এখন। ওঁদের মন তো খারাপ হলই, আমাদের মনও খারাপ হয়ে গেল। সঞ্জীবকাকু বললেন, উনিও যাবেন, না হয় রাতে গাড়িতেই শুয়ে থাকবেন, নইলে প্রদীপকাকুর পক্ষে আমাদের সকলের দেখাশোনা করতে অসুবিধে হবে, বিশেষ করে একাধিকবার যখন বড় রাস্তায় সাকোলিতে আসতে হবে। কী আর করা যাবে! ওঁরা সব সেজেগুজে ছিলেন। সুচিত্রা ও মুনমুন কাকিমা মানে, সঞ্জীবকাকু ও তাপসকাকুর স্ত্রীরাও। 'সেজেগুজে রইলা রাই এই লগনে বিয়া নাই।'

ভারাক্রান্ত মন নিয়ে আমরা এগারোটা নাগাদ বেরিয়ে পড়লাম নীরি থেকে নাগজিরার দিকে। আজ রাতটা আমরা নভেগাঁও-এ থাকব কারণ চারজন জার্মান মহিলাই আজ থাকবেন নাগজিরা। আগামীকাল

সকালে দু'জন ফিরে যাবেন নাগপুরে—সেখান থেকে প্লেন ধরে দিল্লি এবং তারপর ফ্রাঙ্কফুর্ট। তাই আজ আমাদের পাখ-পাখালিহীন নভেগাঁওতেই থাকতে হবে। তাও দেখা তো হবে জায়গাটা। পরে কখনও শীতকালে আসা যাবে।

নভেগাঁও-এ পৌঁছে দেখা গেল ক্যান্টিনেও মেরামতির কাজ হচ্ছে। সুচিত্রা কাকিমা সঙ্গে তিনরকম পদ রান্না করে দিয়েছিলেন, শুখা শুখা এঁচড়ের তরকারি, মেটের চচ্চরি আর কষা মাংস। প্রদীপকাকু ক্যান্টিনের লোকেদের বলে শুধু ভাতটা রান্না করে দিতে বললেন। ভালো বাসমতি চালও ছিল আমাদের সঙ্গে। আর ছিল মিক্সড পিক্‌ল-এর শিশি। বেলা তিনটে নাগাদ আমাদের দুপুরের খাওয়া সমাধা হল একটা মস্ত বিজা গাছের ছায়াতে বসে। হ্রদের দিক থেকে ক্বচিৎ পাখির ডাক আর হাওয়া আসছিল মাঝে মাঝে। ঘরের মধ্যে আর ঘরের বাইরেতে তফাৎ অনেক। সে ঘর বাতানুকুলই হোক আর সেই বাইরে রোদে পড়া প্রায় ন্যাড়া জায়গাই হোক। বাইরের মতো মজা ঘরে নেই।

খাওয়া-দাওয়ার পরে ঠিক হল নভেগাঁও-এর সবচেয়ে ভালো কাঠের তিনতলা বাংলো, যাতে তিনতলাতে মাত্র দুটি শোবার ঘর এবং দোতলাতে ড্রয়িং-ডাইনিং, একতলাতে কিছু নেই, সেখানে আমরা তিনজন থাকব। মানে, তিতির, আমি আর ভটকাই। আর ঋজুদা, প্রদীপকাকু আর সঞ্জীবকাকুর সঙ্গে কটেজ-এ থাকবেন। কটেজ হল ক্যান্টিন পেরিয়ে। ক্যান্টিনও তো কাঠের বাংলো থেকে আধ কিমি মতো দূরে।

আমরা তিনজনেই আপত্তি জানালাম। আমি বললাম, তুমি আর তিতির থাক। এখানে আমি আর ভটকাই প্রদীপকাকুদের সঙ্গে কটেজে থাকব।

www.boiRboi.blogspot.com

ঋজুদা বলল, আমি যা বলব তাই হবে। আমি এখানে অনেকবার এসেছি। তোরা এই প্রথমবার আসছিস, পরে আসা আর নাও হতে পারে। তোরা ভালো জায়গাতে থাক।

তারপর ওঁরা সকলে আমাদের মালপত্রসমেত ওই কাঠের বাংলোতে নামিয়ে দিলেন। কালো-কোলো গাঁট্টা-গোঁট্টা একজন মানুষকে দেখিয়ে প্রদীপকাকু বললেন, এর নাম কোলে। এই তোমাদের দেখাশুনো করবে। এখন তোমরা বিশ্রাম করো। ঘরে এয়ারকুলার আছে, অ্যাটাচ্‌ড বাথরুম। এখানে ইলেকট্রিসিটি আছে। রাতে আমরা ডিনার নিয়ে আসব এখানে, তারপর দোতলার ডাইনিং রুমে একসঙ্গে খাব। খাওয়ার গরম করার বন্দোবস্তও আছে এখানে। ক্রকারি-কাটলারিও আছে। বনবিভাগের বড় বড় আমলারা আসেন এখানে—তাই বন্দোবস্তের কোনও ত্রুটি নেই।

আমাদের মালপত্র কোলে বয়ে নিয়ে তেতালাতে দিয়ে গেল। দেখলাম শোবার ঘরে খাওয়ার জলও রাখা আছে। রুমকুলারও চলছে গোঁ গোঁ শব্দ করে। গরমটা বেশ পড়েছে। লু-র মতো হাওয়া বইছে এখনই। কে জানে মে মাসের শেষে কী হবে। এখন তো এপ্রিলের প্রথম।

ওঁরা চলে গেলে তিতির বলল, তোমরা কি বারান্দাতেই বসে থাকবে? বারান্দাতে সোফা-টোফা ছিল। একটা ছোট পাখাও ছিল বারান্দার থাম-এর সঙ্গে লাগানো। সিলিং ফ্যান নেই।

ভটকাই বলল, হ্যাঁ। ছিন-ছিনারি দেখি একটু। এত কাণ্ড করে আসা হল। দ্যাখ, হ্রদটা কী সুন্দর দেখাচ্ছে এখান থেকে। গরম হাওয়াতে নীল হ্রদের ওপরে এক ধূসর আস্তরণের মতো তৈরি হয়েছে—যেন কোনও আর্টিস্টের আঁকা ছবি।

আমি আর তিতির দুজনেই ভটকাই-এর বাংলা এবং কবিত্বতে

যুগপৎ চমকৃত হলাম।

তিতির বলল, তোমরা বোসো। আমি একটু গড়িয়ে নিই। বিকেলের চা-টা নিশ্চয়ই এখানেই বানাবে কোলে চৌকিদার। চা তো ক্যান্টিন থেকে আনতে গেলে সরবৎ হয়ে যাবে।

—যে যাই হোক। আমি বন্দোবস্ত করব। তুমি গিয়ে শুয়ে পড়ো।

চা-টা খেয়ে এই বারান্দাতে চাঁদের আলোতে বসে নভেগাঁও হ্রদ-এর সৌন্দর্য উপভোগ করব।

ভটকাই বলল, এইবারে ক্যালকেসিয়ান কট-বিহাইন্ড হয়েছে। এখন চাঁদ কোথায় পাবে ম্যাডাম। আজ যে কৃষ্ণা অষ্টমি। আর সাতদিন পরে অমাবস্যা।

—তাই? হয়তো সে জন্যেই আমার পায়ের ব্যথাটা বেড়েছে।

আমার ঠাকুমার মতো বলল তিতির, পাকুনি হয়ে।

আমরা হেসে ফেলে বললাম, যাও এবারে।

যেতে যেতে দাঁড়িয়ে পড়ে তিতির বলল, অন্ধকারের রূপও কি খারাপ? অন্ধকার রাত পুরুষ আর চাঁদনি রাত মেয়ে।

আমি বললাম, এই দুই কবির মধ্যে পড়ে এই অকবি দেখছি খাবি খাবে।

তিতির হেসে চলে গেল।

আমরা দুজনে বারান্দাতে বসে থাকলাম। এত বন বাংলোতে থেকেছি কিন্তু নভেগাঁও-এর এই ছোট্ট তেতলা বাংলোর মতো বাংলোতে থাকিনি কখনও। চারদিকে ঘন বন আর সেই বনের মধ্যে একটি টিলার ওপরে বানানো হয়েছে বাংলোটি। বনের মাথা ছাড়িয়ে দেখা যাচ্ছে নভেগাঁও হ্রদ। তবে ভালো দেখা যায় ডানদিক থেকে। একটি মস্ত বোগোনভোলিয়া বাংলোর তিনতলা অবধি উঠেছে

www.boiRboi.blogspot.com

পাথরের বুক ভেদ করে—খুব ঝাঁকরা গাছটা—ম্যাজেন্টা রঙা ফুলে ছেয়ে রয়েছে। তার ঠিক পেছনে একটি মস্ত চাঁপা গাছ। ফুলে ফুলে ভরে রয়েছে। সন্ধের পর হাওয়া ঠাণ্ডা হলে গন্ধ ছাড়বে—ততক্ষণ প্রতীক্ষাতে থাকতে হবে। দূর থেকে অস্ফুট স্বরে কথা বলছে পাখিরা। বক ও সারসজাতীয় পাখিই বেশি, যেসব পাখি এখন আছে। আর আছে CORMORANT বা পানকৌড়ি।

ভটকাই বলল, 'মধ্যদিনে যবে গান বন্ধ করে পাখি, হে রাখাল বেণু তব বাজাও একাকী।'

বললাম, করেছিস কী রে। রবিঠাকুরকে তো গুলে খেয়েছিস।

—সবে তো কামড় বসিয়েছি। আমার জীবনে সবকিছুই লেট-এ এল, জানিসই তো। তোদের হাত ধরে রবীন্দ্রনাথকে পেলাম, তাও বড় দেরি করে। এখন তিনি আজীবনের সঙ্গী হবেন।

ওখানে কিছুক্ষণ বসে থাকার পরে গরমে গা জ্বালা করতে লাগল।

ভটকাই বলল, চল রুদ্র—আমারও একটু গড়িয়ে নিই।

—চল। বললাম।

তারপর বললাম, তোর নাম দেব শ্রীমান ভটকাই গড়াই।

শ্রীমতী তিতিরকেও এই উপাধি দিস তবে।

৫

রুমকুলারটা কাঠের ঘরের মধ্যে গুলি খাওয়া শুয়োরের মতো গোঁ গোঁ করে আওয়াজ করছিল। তবে ঘরটা বাইরে থেকে অনেক ঠাণ্ডা—পর্দাও টানা—সিলিং ফ্যানও আছে। কিছুক্ষণ শুয়ে থাকার পরই যে কখন চোখের পাতা জুড়ে এসেছিল টেরও পাইনি।

ঘুম যখন ভাঙল তখন ঘরের মধ্যে ঘুটঘুটে অন্ধকার। এখন কিন্তু কুলারটা বন্ধ। বোধহয় ভোল্টেজ কমে গেছে। পাশের খাটে ভটকাই আরেকটা গুলি খাওয়া শুয়োরের মতো ধড়ফড় করে নাক ডাকছে। যেমন হয় সকলেরই, আমারও হল, চোখ খুলেই চেষ্টা করতে লাগলাম বোঝার, আমি কোথায় শুয়ে আছি, এখন রাত কত হল? এমন সময়ে বারান্দা থেকে তিতিরের গান ভেসে এল, নিচুগলার গান, জোরে গাইলে যদি আমাদের ঘুম ভেঙে যায় সেই ভয়েই কি উঁচুগলাতে গাইছে না? নাকি কিছু গান সবসময়েই থাকে, সব গায়ক-গায়িকারই, যা কেবল নিজেকেই শোনাবার জন্যে। সে

www.boiRboi.blogspot.com

গান সবসময়েই নিচু গলাতেই গাওয়া হয়। তিতির গাইছে একটি গান যা কখনও কারও গলাতেই শুনিনি আগে।

"অন্ধকারের মাঝে আমায় ধরেছ দুই হাতে।
কখন তুমি এলে হে নাথ মৃদু চরণপাতে?"
ভেবেছিলাম জীবনস্বামী, তোমায় বুঝি হারাই আমি—
আমায় তুমি হারাবে না বুঝেছি আজ রাতে॥"

পাছে তখুনি বাইরে গেলে ও গান থামিয়ে দেয় তাই চুপ করে শুয়ে রইলাম। কিন্তু গান ও আস্তাইতে পৌঁছেই থামিয়ে দিল তিতির। ভটকাই-এর নাক ডাকাও আগেই থেমে গেছে। বুঝলাম, সেও চুপ করে শুয়ে আছে। হয়তো গান শোনারই জন্যে।

সব রবীন্দ্রসঙ্গীতই যে আমরা বুঝি তেমন নয়। তবে ঋজুদা এবং তিতিরেরও সঙ্গে থেকে থেকে এক গভীর ভালোলাগা, আবেশ ও শ্রদ্ধা জন্মে গেছে। রবীন্দ্রনাথের গানের সঙ্গে যে অন্য গানের তফাৎ আছে এ কথাটা ভালোভাবেই বুঝতে শিখেছি। রবীন্দ্রনাথের গানের ক্যাসেট বা সিডি নিজের পয়সা বা প্রভাব খাটিয়ে প্রকাশ করলেই যে তা যথার্থ রবীন্দ্রসঙ্গীত হয়ে ওঠে এমনও নয়। রবীন্দ্রসঙ্গীত একদিকে যেমন সকলেরই গান, অন্যদিকে আবার তেমন সকলের গান আদৌ নয়। দেশ এখন লজ্জাহীন মানুষে ছেয়ে গেছে। সকলেই কবি, সকলেই গায়ক। দেখে-শুনে আমার মতো অর্বাচীনেরও লজ্জা হয়, আর কী বলব! লজ্জাবোধ এখন বড় দুর্লভ গুণ হয়ে গেছে। তাই এই গুণ যে আমার আছে সে জন্যে গর্বিত বোধ করি। রবীন্দ্রসঙ্গীতের জগতে পদ্মবনে মত্ত হাতির মতো তাণ্ডব করছে একদল নির্লজ্জ মানুষ। অসুরেরা সুরের জগৎ লণ্ডভণ্ড করছে। অথচ করার কিছুই নেই। একমাত্র সময়ই এই সব ছিন্নমতি মানুষদের সুমতি দিতে পারে।

আমরা বাইরে বেরুতেই তিতির বলল, চা'টা খুব ভালো খেলাম

রুদ্র ও ভটকাইবাবু।

—খেলে চা? কই আমাদের ডাকলে না তো!

—চা তো আমাকে তোমাদেরই খাওয়াবার কথা। ঋজুকাকা দু-দুজন পুরুষসিংহকে আমার দেখাশোনা করার জন্যে রেখে গেল, তারা যে সন্ধে অবধি এমন কুম্ভকর্ণের মতো ঘুমুবে তা কি করে জানব!

—নিকষ অন্ধকারে ভূতের মতো বসে আছ কেন? আলোটাও তো জ্বালাবে। নাকি সুইচ টিপতেও পারোনা। আঙুলে বাত?

ভটকাই বলল।

—সুইচ তো সব টেপাই আছে। আলো এবং পাখারও। ভোল্টেজ একেবারেই পড়ে গেছে মনে হয়।

—তা তো হল। কিন্তু চা-এর কী হল?

আমি বললাম।

তারপর অন্ধকারেই বারান্দার প্রান্তে গিয়ে গলা তুলে ডাকলাম—কোলে। কোলে!

কোনও সাড়া নেই।

অনেকবার ডাকাডাকির পর দূর থেকে একটি ক্ষীণ কণ্ঠ বলল, আয়া সাহাব। কিন্তু সে গলা কোলের নয়। তারপর দু'হাতে দুটি লণ্ঠন নিয়ে একটি শীর্ণকায় লোক, এ কোলে নয়, সে বেশ মোটাসোটা ছিল, আস্তে আস্তে সরু সিঁড়ি বেয়ে তিনতলাতে উঠে একটি লণ্ঠন বারান্দাতে রাখল। বুঝলাম অন্যটি নিয়ে সে নেবে যাবে।

—কোলে কাঁহা?

—কোলে বাড়ি চলে গেছে।

—মানে?

—মানে, তাঁর গাঁয়ে। এখান থেকে তিনমাইল দূরে। পাঁচটার

www.boiRboi.blogspot.com

সময়ে তার ডিউটি শেষ।

—কই? আমাদের তখন তো কিছু বলল না।

লোকটি বলল, সন্ধে থেকে আমার ডিউটি।

সে হিন্দি বলছিল বটে, কিন্তু তাতে মারাঠি টান এতই বেশি যে তার কথার মর্মোদ্ধার করা খুবই কঠিন।

ভটকাই বলল, চলে গেছে তো গেছে, তুমি একটু চা করে খাওয়াও আমাদের।

—চা, চিনি, দুধ এসব কি আছে আপনাদের কাছে?

—একটু চা, চিনি, দুধও রাখো না চায়ের জন্যে? পয়সা দিচ্ছি। নিয়ে এসো।

—পয়সা দিয়েও এ জঙ্গলে ওসব কোথায় পাওয়া যাবে! পাওয়া যেত ক্যান্টিনে গেলে।

—তবে তাই যাও।

—ও বাবা।

—কেন?

তার নিজের কোমরের কাছে ডানহাত এবং লণ্ঠন ধরা বাঁ-হাতটি তুলে বলল, নভেগাঁও-এর জঙ্গলে এই—এত্ত বড় বড় শুয়োর আছে। মাটিতে ঢুঁ মেরে ফেলে একেবারে উরু অবধি চিরে দেবে। চাঁদনী রাতেও যেতাম না আর এখন তো অন্ধকার রাত।

—তাহলে?

আমি বললাম।

—আপনাদের সঙ্গে গাড়ি থাকলে হত। হেঁটে এখানে দশ-পাও যাওয়া যাবে না। শুয়োর ছাড়াও সাপ বিছে আছে বিস্তর। বিষাক্ত মাকড়সা। ট্যারান্টুলা।

তিতির সোজা হয়ে বসে বলল, এখানে ট্যারান্টুলা আছে না কি?

—নেই? এই ক'দিন আগেই তো আমাদের এক স্টাফকে কামড়ে দিল। প্রাণে বেঁচেছে বটে নাগপুরের হাসপাতালে গিয়ে, কিন্তু কী ভোগান্তি। একমাসেও সে সুস্থ হয়ে ওঠেনি।

তারপর আমাদের ধমকে বলল, এই গরমে কেউ মহারাষ্ট্রের জঙ্গলে মরতে আসে? সাপও কম রকমের আছে না কি?

আমরা চুপ করে রইলাম।

ভটকাই বলল, তোমার নাম কী চৌকিদার?

—চিঞ্চিকেডে।

—কী বললে?

—মনিরাম চিঞ্চিকেডে।

তারপর চিঞ্চিকেডে বলল, এখান থেকে আপনারা যাবেন কোথায়? আসা হচ্ছে কোথা থেকে?

আমি বললাম, নাগজিরাতে যাব, এসেছি নাগপুর থেকে, মানে নাগপুর হয়ে কলকাতা থেকে।

—অ।

চিঞ্চিকেডে বলল, আর যাওয়ার জায়গা পেলেন না? নাগজিরা?

—কেন? নাগজিরা খারাপ জায়গা?

—খারাপ মানে কী? সাংঘাতিক সব জানোয়ার তো গিসগিস করছেই, বাঘ ভালুক লেপার্ড জংলি কুকুরের দল, তার ওপরে নানা ভূতপ্রেতও আছে।

ভটকাই বলল, তোমার নামে আমরা নাগপুরে কমপ্লেইন করে দেব। বনবিভাগের স্টাফ হয়ে তুমি ট্যুরিস্টদের ভয় দেখাচ্ছ?

—তা করলে করবেন। আমি আপনাদের ভালোর জন্যেই বললাম। ছেলেমানুষ সব বেঘোরে প্রাণ যাবে। আমি নাগজিরাতে পোস্টেড ছিলাম ছ'বছর। ওখানে না গেলেই পারতেন, বিশেষ করে

www.boiRboi.blogspot.com

এই সময়ে। আর যদি যান-ই তবে অন্ধারবনে সন্ধের পরে একদম যাবেন না। দিনমানেও না গেলেই ভালো। জঙ্গলে ভদ্রলোকেরা আসে শীতকালে। শীত উপভোগ করে, খায়-দায় জানোয়ার দেখে, ফোটো তোলে। তাছাড়া সেখানে তো বিজলি বাতি পর্যন্ত নেই।

—এখানেই বা কি ছাতার আছে?

ভটকাই বলল, রাগের গলাতে।

চিঞ্চিকেডে বলল, দেখবেন, যতই রাত বাড়বে ততই ভোল্টেজও বাড়বে। বারান্দার আলো জ্বলবে, পাখা ঘুরবে, শোওয়ার সময়ে রুমকুলারও কাজ করবে তবে তার দরকার হয়তো হবে না। আর মিনিট পনেরো পর থেকেই নভেগাঁও হ্রদের ওপর দিয়ে একটা হাওয়া বইবে। শরীর জুড়িয়ে যাবে। আমি বলব, ভোল্টেজ একটু বাড়লেই আপনারা চানটা সেরে নিয়ে বারান্দাতে বসুন, দেখবেন ভালো লাগবে, গরম আর লাগবে না। তারপর হাওয়াতে এই চাঁপা গাছ যা খুশবু ছড়াবে তা বলার নয়। মনে হবে আতরের গন্ধ!

বলেই বলল, আমি তবে যাই সাহেব মেমসাহেবেরা? ওই যে আমার কোয়ার্টার। চিঞ্চিকেডে বলে হাঁক দিলেই আমি চলে আসব।

বলে, লণ্ঠনটা নিয়ে আস্তে আস্তে সরু সিঁড়ি বেয়ে ধুপ ধুপ শব্দ করতে করতে নেমে গেল চিঞ্চিকেডে গোয়েন্দা গল্পের ভিলেন-এর মতো।

সে নেমে গেলে, ভটকাই বলল, কী নাম রে বাবা। চিঞ্চিকেডে।

তিতির বলল, আমাদের দেশ কত বড়—কত রকমের মানুষ, কত ভাষা, কত জাতপাত, কতরকমের নাম ও পদবী। এতো স্বাভাবিক।

আমি বললাম, অন্ধারী তড়োবাতে যাওয়ার সময়ে নাগপুরে যখন মহারাষ্ট্র স্টেট ইলেকট্রিসিটি বোর্ড-এর গেস্ট হাউসে ছিলাম

তখন গেস্ট হাউসের বাগানের মালির সঙ্গে আলাপ হয়েছিল, তার পদবীও ছিল চিঞ্চিকেডে।

তিতির বলল, গুড অ্যাডভাইস দিয়েছে চৌকিদার। এবারে চানটা আধো-অন্ধকারে সেরে নিই। তারপর চাঁপার গন্ধে ম ম করা বারান্দাতে বসা যাবে। আটটা তো দেখতে দেখতে বেজে যাবে আর ঋজুকাকারা তো তখন এসেই যাবেন। আমি কি লণ্ঠনটা নিয়ে যেতে পারি?

—স্বচ্ছন্দে। এমনিতেই এটাকে আমি ঘরে রেখে আসতাম। জঙ্গলের অন্ধকার রাতের সৌন্দর্য উপভোগ করা যায় না চোখের সামনে লণ্ঠন থাকলে।

—তোর যা খুশি।

তিতির চলে গেল ওর ঘরে। দরজাটা বন্ধ করে দিল ভিতর থেকে।

ভটকাই বলল, তুই আগে যাবি না আমি যাব?

—মনটা কু ডাকছে, বুঝলি রুদ্র।

—কেন বল তো?

—নাগজিরা সম্বন্ধে চিঞ্চিকেডে যা বলল তার কিছু তো সত্যি বটে।

—তুই কি ভূতে-পেত্নীতে বিশ্বাস করিস না আজকাল?

—না, তা করি না। তবে আমার মন বলছে এবারও আমরা নির্ভেজাল ছুটি কাটাতে পারব না।

—কেন?

—জানি না। আমার মন বলছে।

—কী বলছে তোর মন?

—ওই নাগজিরাতে এমন কোনও ঘটনা ঘটবে যার জেরে ঋজুদা

www.boiRboi.blogspot.com

ফেঁসে যাবে। এবং বুঝতেই পারছিস, ঋজুদা ফাঁসলে আমরাও ফাঁসব।

—কলকাতাতে ফিরে তুই কোনও ভাল সাইকিয়াট্রিস্ট-এর কাছে যা। তোর মাথার গণ্ডগোল হয়েছে। তুই-ই যা আগে।

ভটকাই চলে গেলে, আমি অন্ধকারে বারান্দার ডানদিক ঘেঁষে দাঁড়ালাম। যে টিলাটার ওপরে বাংলোটা, তার পেছন দিকটা অনেকখানি খাড়া নেমে গেছে গভীর জঙ্গলের মধ্যে। এখান থেকেই হ্রদটাকে দেখা যায়। তবে অন্ধকারে হ্রদ তো আর দেখা যাচ্ছে না, হ্রদের ওপরে অন্ধকারটাকে একটু ফিকে দেখাচ্ছে। চিঞ্চিকেডে ঠিকই বলেছে। সারাদিনের অসহ্য গুমোটের পর এখন হাওয়া দিয়েছে একটা। টিলার পাদদেশের গাছপালা খুব আস্তে আস্তে আন্দোলিত হচ্ছে। তাদের মৃদু খসখসানি শব্দও উঠছে। চাঁপার গন্ধও উড়তে লেগেছে ধীরে ধীরে। চান করতে করতে তিতির গান গাইছে "কার চোখের চাওয়ায় হাওয়ায় দোলায় মন, তাই কেমন হয়ে আছিস সারাক্ষণ, ও কার চোখের চাওয়ায়..."

৬

পরদিন সকালে নভেগাঁও থেকে বেরোতে বেরোতেই প্রায় বারোটা হয়ে গেল। সকলে চান-টান করে তৈরি হয়ে আমাদের মালপত্র সব গাড়িতে তুলে ক্যান্টিনে পরোটা আলুর তরকারি আর আচার দিয়ে ব্রেকফাস্ট করে নভেগাঁও হ্রদ দেখতে গেলাম। একেবারে শেষ প্রান্ত পর্যন্ত। হ্রদের একপ্রান্তে মালগুজারের বাংলো যেখানে ছিল সেখানে একেবারে জলের ওপরে একটি বাংলো করেছে বনবিভাগ। তার একতলাতে খাওয়া-দাওয়ার জায়গা আছে, শীতে অনেকে পিকনিকে আসে। দোতলাতে থাকার ঘর আছে। সেখান থেকে গেলাম নদীর ওপরে যে বাঁধ বাঁধা হয়েছে তা দেখতে। এই সব করতেই বেলা গেল। ঠিক হল দুপুরের খাওয়া আজ বাদ দিয়ে সোজা নাগজিরাতে যাওয়া হবে। রাতে আর্লি ডিনার করে শুয়ে পড়া। নাগজিরাতে সন্ধের পর গাড়ি নিয়ে পার্ক-এর কোথাও যাওয়া মানা।

www.boiRboi.blogspot.com

হেঁটে যাওয়া তো মানা দিনমানেও।

ফরেস্ট গেট পেরিয়ে জঙ্গলে ঢুকে এলে বেশ কয়েক কিমি এসে প্রথমে ক্যান্টিন পড়ে। সেখানেই অফিস। ক্যান্টিনের চত্বরে দেখলাম একটি পুরুষ নীলগাই ঘুরে বেড়াচ্ছে। সে এখনও পূর্ণবয়স্ক হয়নি। কবে নাকি জংলি কুকুরের তাড়া খেয়ে সে ক্যান্টিনে ঢুকে এসেছিল। ক্যান্টিনের সকলের সম্মিলিত প্রতিরোধে জংলি কুকুরের দল তাকে ছেড়ে দেয়। সে তখন বছরখানেকের মাত্র। তখন থেকেই ক্যান্টিনের স্টাফরাই তাকে পোষ্য নিয়েছে। তার নাম রাজা। প্রদীপকাকু তাকে আপেল আর আঙুর খাইয়ে তার অভ্যেস খারাপ করে দিয়েছিলেন। আমাদের ব্রেকফাস্টের জন্যে যা কিছু ফল আসত তার অর্ধেক বরাদ্দ ছিল রাজার জন্যে। প্রদীপকাকু বললেন, তাপস তো আসেনি। তাপসকাকু মানে তাপস সাহা এলে দেখতে কী আদর করে সে রাজাকে আর কী পরিমাণ খাওয়ায়। তাপসের মনটা বড় নরম।

আমরা যখন ক্যান্টিনে পৌঁছলাম তখন সন্ধে হয় হয়। সন্ধ্যাতারাটা জ্বলজ্বল করছে পশ্চিমাকাশে। এসি গাড়ি থেকে বেরোলেই বাইরে গরম যতটা তার চেয়ে অনেক বেশি লাগে। গা চিটপিট করছিল। ভাবছিলাম, কখন গিয়ে চান করব। চিঞ্চিকেডে ঠিকই বলেছিল, এখানে রীতিমতো গরম। তার ওপরে ইলেকট্রিসিটি নেই। রাতে ঘুমোব কী করে তাই ভাবছিলাম। তখন তো জঙ্গলে যাওয়াও যাবে না।

ভটকাই পড়েছে মহা বে-কায়দাতে। কী নভেগাঁওতে কী নাগজিরাতে খাওয়া-দাওয়ার ব্যাপারটা এক্কেবারে আউট-অফ কন্ট্রোল। ঋজুদা বলল, আমাদের চাল ডাল আলু পটল বের করে দাও। মুসুরির ডালের খিচুড়ির মধ্যে সব সেদ্ধ দিয়ে দিতে বল। তোমরা তো ভালো গাওয়া ঘি'ও এনেছ সঙ্গে। শুকনো লঙ্কা ভাজাও

করে দিতে বোলো কটা। তবে আমরা কিন্তু বাংলোর ডাইনিং রুমে খাব। বড় বড় ক্যাসারোলও আনা হয়েছে। রান্না করা খাবার তাতে করে নিয়ে গিয়ে বাংলোতে খাব। চৌকিদার আছে একজন একতলা-দোতলার সব ঘরের বাসিন্দাদের দেখভাল করার জন্যে। ড্রয়িং-ডাইনিং রুমের সামনেই একটা খোলা বারান্দা রেলিং-ঘেরা আর তার সামনে একটা মস্ত জলাশয়। স্বাভাবিক নয়—কেটে করা হয়েছে। নাগজিরা খুব ঊষর শুনেছিলাম কিন্তু কতখানি যে ঊষর তা বোঝা গেল রাতে এবং পরদিন সকালে।

ক্যান্টিনে চা খেয়ে এসে যার যার মালপত্র রেখে আমরা সামনের বারান্দাটাতে বসলাম চেয়ার নিয়ে। ততক্ষণে অন্ধকার নেমে এসেছে আর এসেছে অগণ্য হরিণ। শুধু চিতল হরিণই নয়, সম্বর, নীলগাই, কোটরা—সেই যে তাদের ডাক আরম্ভ হল তো চলল। সারা রাত তারা ডাকবে আর বাংলোর চারদিকে ঘুরে বেড়াবে। তাদের পেছনে পেছনে শ্বাপদেরাও আসে তাদের ধরতে তবে তারা বাংলোর কাছে শিকার ধরে না—জঙ্গলের ভিতরেই ধরে।

ঋজুদা বলল, পালামৌ-এর বেতলা, নীলগিরি পাহাড়ের পাদদেশে মুদুমালাই এবং অন্যান্য অনেক জঙ্গলেই সারা রাত হরিণ চারধারে খচরমচর করে কিন্তু নাগজিরার মতো এরকম কোথাওই দেখা যায় না।

প্রদীপকাকু এবং সঞ্জীবকাকু থাকবেন কটেজ-এ। এই বাংলো থেকে সামান্য দূরে জলের অন্যপ্রান্তে একটি কটেজ আছে, সেখানে। ঋজুদা থাকবে দোতলাতে। দোতলাতে আরও দুটি ঘর আছে। সেখানে আছেন জার্মান মহিলারা। আর নীচের দুটি ঘরে আমরা আর অন্য ঘরে মিস্টার পোপোটলাল। ঋজুদা বলল, পোপোটলাল নামকরা লেপিডপটারিস্ট। পৃথিবীর নানা জার্নালে ওঁর লেখা বের হয় অথচ

বয়স কিছুই নয়, পঁয়ত্রিশ মতো। উনিই নাগপুর থেকে জার্মান মহিলাদের সঙ্গে করে নিয়ে এসেছেন। ইউরোপিয়ানরা তো সন্ধে বেলাতেই ডিনার খেয়ে নেন। তাই ওঁরা এখন ক্যান্টিনে ডিনার খাচ্ছেন। বেচারি পোপোটলাল সাহেবকেও তাই খেতে হচ্ছে। এক যাত্রাতে পৃথক ফল তো হয় না।

প্রদীপকাকু বললেন।

তারপর প্রদীপকাকু বললেন, আলাপ করবেন নাকি ঋজুদা ওঁদের সঙ্গে?

—কী দরকার? ঋজুদা বলল। বেশ তো আছি নিজেরা-নিজেরা। গাদাগুচ্ছের ইংরেজি বলতে হবে। তিতির বরং কাল মহিলাদের সঙ্গে আলাপ করে নিস। তুই তো জার্মানও জানিস।

—তাই নাকি? তুমি জার্মানও জানো?

অবাক হয়ে বললেন, প্রদীপকাকু আর সঞ্জীবকাকু।

ভটকাই বলল, শুধু জার্মান কেন, ফ্রেঞ্চও জানে।

—বলো কি? ঋজুদার সাগরেদদের কথাই আলাদা।

সঞ্জীবকাকু বললেন, তুমি কোন কোন ভাষা জানো?

ভটকাই হেসে বলল, বাংলা আর হিন্দি আর ইংরেজি, একটু একটু।

ওর কথা বলার ধরনে আমরা সবাই হেসে উঠলাম।

ঘণ্টাখানেক পরে ক্যাসারোল দিয়ে গাড়ি পাঠিয়ে দেব। কী বলেন ঋজুদা?

—যা ভালো মনে করো।

তারপর বলল, খাওয়ার আগে চানটা সেরে নিলে হত না?

—খুব ভালো কথা। আমরা সমস্বরে বললাম। তারপর যার যার ঘরে গেলাম চান করতে। একটা গাড়ি নিয়ে প্রদীপকাকুরাও চলে গেলেন ওঁদের কটেজে। ওঁরা স্করপিও গাড়িটা ব্যবহার করছেন।

www.boiRboi.blogspot.com

ওঁদের ড্রাইভারের নাম মোটাভাই। আর আমাদের কালিস গাড়ির ড্রাইভারের নাম শিবাজীরাও। ঋজুদা বলে টোয়েটা কালিস-এর মতো গাড়ি নেই। এর সাসপেনসানটাও এমন যে যতই খারাপ পথে চলুক না কেন গাড়ি, একটুও ঝাঁকি লাগে না।

ভটকাই ঘরে পৌঁছে বলল, আমি আগে যাচ্ছি।

—লণ্ঠনটা নিয়ে যাব?

—বাথরুমে আলাদা লণ্ঠন দিয়েছে একটা।

—তাই? ভালো।

তারপর বাথরুম ঢুকেই বলল, এ কী রে! মগ নেই কোনও। পোড়ামাটির ঘটির মতো আছে দুটো। ঘটির মতোও নয়। ঘটির চেয়ে অনেক সরু ব্যাপারটা। গলার কাছে ধরার মতো বন্দোবস্তও আছে।

আমি বললাম, হ্যাঁ। মারাঠিরা এইরকম ঘটিই ব্যবহার করেন। সারা পৃথিবীর মুসলমানেরা যেমন বদনা ব্যবহার করেন।

কী কেলো রে বাবা!

বলে, ভটকাই অবশেষে দরজা বন্ধ করল। চান করে পরার জন্যে কোনও জামাকাপড় নিল না। একটা পাজামা নিয়ে এসেছে। টি-শার্ট বোধহয় আছে আরেকটা। সেটা যত্ন করে রেখে দিয়েছে। ওই পাজামা পরেই কাটিয়ে দেবে এ'কটা দিন। তোয়ালে অবশ্য চৌকিদারই দিয়েছে, দুজনের দুটো। ভটকাই ভিতর থেকে চেঁচিয়ে বলল, তোর সাবানটা ব্যবহার করছি। আমি আনতে ভুলে গেছি।

—জানতাম। ব্যবহার করে আলাদা জায়গাতে রাখবি। আমি অন্য একটা সাবান বের করে নিচ্ছি।

যা খুশি কর। তোরটা আমি নিচ্ছি এই বলে দিলাম।

বলল, ভটকাই।

ভটকাই চলে গেলে আমি জানালার সামনে এসে দাঁড়ালাম।

www.boiRboi.blogspot.com

ঘরটা বেশ বড়ই। সোফাসেট আছে একটা—মস্ত বড় ডাবল বেড খাট—শক্তপোক্ত— কোনও কায়দা নেই। খাটটা জানালার পাশে।

বাইরে ঘন অন্ধকার। আকাশ ভরা গ্রহ নক্ষত্র। সামনের মস্ত পুকুরটার জলে তারাদের নরম আলো এসে পড়েছে। তারাদের রঙ নীল বা সবুজ বলেই জানতাম। ঋজুদাই নভেগাঁওতে আমাদের শিখিয়েছে যে তারারা নীলচে-হলুদ হয়, সাদাটে নীল, কমলা রঙা। মঙ্গল গ্রহ'র রঙ বেশ উজ্জ্বল কমলা—তবে বছরের সবসময়ে নাকি দেখা যায় না। ভাবছিলাম সত্যি, পৃথিবীতে এত কিছু জানার আছে যে এক জীবনে সব জেনে ওঠা বোধ হয় অসম্ভব! আমার অত কিছু জানার ইচ্ছেও নেই। প্রয়োজনের চেয়ে অনেক বেশি জানলে মানুষ হয়তো কনফিউজ্‌ড হয়ে যায়। এরকম অনেক মানুষকে আমি দেখেছি। তবে ঋজুদার ব্যাপার আলাদা। কিছু মানুষ থাকেন অসাধারণ। অথচ তাদের জ্ঞানের ভার তাদের স্বাভাবিকতাকে নষ্ট করতে পারে না।

নানা প্রাণী এসেছে সামনের দিঘিতে। দিঘি বলছি বটে কিন্তু দিঘির মতো গভীর নয় এ জলাশয়। এর রঙও সাদাটে, নীলচে বা কালচে নয়। টাঁউ টাঁউ টাঁউ করে ডাকছে চিতল হরিণীরা। এরাই কি জীবনানন্দ দাশের ঘাইহরিণী? কোটরা ডাকছে অ্যালসেশিয়ান কুকুরের মতো। জংলি কুকুরেরা দলে থাকে—ওরা কিন্তু কুকুরের মতো ডাকে না। ওদের ডাকটা কুঁই-কুঁই গোছের একটা শব্দ। ওরাও তো শিকারি তাই বোধহয় জোরে ডেকে ওদের অস্তিত্ব জানান দিতে চায় না। তবে শিকারি হলেও ওরা বাঘের মতো stalk করে শিকার করে না। একটি বাঘ তার নির্বাচিত শিকারকে ধরতে অনন্তকাল অপেক্ষা করে—আলোছায়ার মধ্যে নিজেও আলোছায়া হয়ে গিয়ে চোর-পুলিশ খেলে। আর শিকারি কুকুরেরা আফ্রিকান সিংহ, বা

চিতার মতো দৌড়ে গিয়ে শিকার ধরে। তাদের নির্বাচিত শিকারও প্রাণভয়ে দৌড়য়, তারাও তার পেছনে পেছনে দৌড়ে লাফিয়ে লাফিয়ে তার শরীরের নানা অংশ দৌড়তে দৌড়তেই আক্রমণ করে। ইংরেজিতে যাকে বলে hamstringing। তেমনই।

ভাবছিলাম, রাজার কী হবে? রাজা যখন পূর্ণবয়স্ক হবে, যখন তার সঙ্গিনীর প্রয়োজন হবে তখনও তো সে বনে ফিরতে পারবে না। ডাল-ভাত, রুটি-তড়কা খেয়ে মানুষের স্নেহে আর প্রশ্রয়ে সে বড় হয়েছে তাকে তো অরণ্য গ্রহণ করবে না। নিজেকে সে বাঁচাতেও শেখেনি। তাকে তো অচিরে বাঘ বা বড় চিতার খাদ্য হতে হবে। নীলগাইয়েরা দলবদ্ধ প্রাণী—কোনও দলের প্রাপ্তবয়স্ক পুরুষেরাই বহিরাগত প্রাপ্তবয়স্ক পুরুষকে দলে ঠাঁই দেবে না। ভীষণ যুদ্ধ করবে তারা রাজার সঙ্গে এবং তাকে রক্তাক্ত ক্ষতবিক্ষত করে বিতাড়িত করবে। যদি পথ চিনে সে ক্যান্টিনে ফিরে আসতে পারে তবে মানুষের সেবা-শুশ্রূষা ও চিকিৎসাতে সে বেঁচে উঠলেও বেঁচে উঠতে পারে, নইলে বনের মধ্যে কোথাও সে অশক্ত হয়ে বসে পড়বে যদি না তার আগেই সে বুনো কুকুরদের খাদ্য হয়। জল পাবে না, খাবার পাবে না, বড় নিষ্ঠুর করুণ মৃত্যু ঘটবে তার। হায়নাতে আর শেয়ালে আর শকুনে তার মৃতদেহ ছিঁড়ে খাবে।

প্রকৃতিকে বাইরে থেকে দেখতে ভারী সুন্দর দেখায়। কিন্তু প্রকৃতির মধ্যে যে নিষ্ঠুরতা আছে তার খোঁজ রাখলে বড় আশ্চর্য হতে হয়। তবে প্রাকৃতিক নিয়মই এই। এখানে কেউ খাদ্য কেউ খাদক। "Survival of the Fittest"-ই হচ্ছে এখানকার নিয়ম। সেই নিয়ম সকলেরই মান্য। কোনও মায়াদয়া নেই কারোরই এ ব্যাপারে।

একজোড়া ল্যাপউইঙ্গ ডিড উ্য ড্যু ইট, ডিড উ্য ড্যু ইট করে চমকে চমকে ডেকে ফিরছে। আমি দেখেছি বনে তো বটেই শহরেও এমনকি

www.boiRboi.blogspot.com

কলকাতা এবং শান্তিনিকেতনেও দু'একটা পাগলা কোকিল থাকে। তারা শীত গ্রীষ্ম বর্ষা পাগলের মতো ডেকে ফেরে, অথচ তাদের ডাকবার কথা শুধুমাত্র বসন্তেই। শীতে অবশ্য তেমন ডাক শোনা যায় না, কিন্তু অন্য সময়ে প্রায়ই শোনা যায়। এখানেও একটা পাগলা কোকিল আছে। সে ডাকছে তারস্বরে। আর ডাকছে ব্রেইনফিভার পাখি—সত্যি সত্যিই মস্তিষ্কের মধ্যে তার জ্বর সংক্রামিত করে।

কাল কী কী জন্তু জানোয়ার দেখব, কেমন বন দেখব সেই ঔৎসুক্যে আজ রাতে হয়তো ঘুমই হবে না, ভাবছিলাম।

এমন সময় দরজায় কে যেন টোকা দিল।

কে হতে পারে?

তিতির বলল, আমার চান হয়ে গেছে। আমি সামনের বারান্দাতে গিয়ে বসছি। তোমরা এসো।

বললাম ঠিক আছে।

তিতির চলে যেতেই ভটকাই বেরুল। বলল, পাগলা কোকিলের কাণ্ডটা দেখলি।

বললাম, হুঁ। তিতিরের চান হয়ে গেছে। ও সামনের বারান্দাতে গিয়ে বসেছে। তুই যা। আমি আসছি দশ মিনিটের মধ্যে।

—সন্ধে নামার পর থেকে বেশ একটা ঠাণ্ডা ঠাণ্ডা ভাব হয়েছে না রে? অসহ্য গরম আর নেই।

বললাম, হ্যাঁ। দেখছিস না পায়ের কাছে কম্বল রাখা আছে। নভেগাঁওতেও তো শেষ রাতে আমাদের কম্বল চড়াতে হয়েছিল। হয়তো এখানেও হবে।

—হলে হোক বাবা। রাতটা তো ভালো ঘুমোই। কাল দুপুরে যে কী কেলো হবে কে জানে।

—আসলে ব্যাপারটা কী জানিস, অভ্যেস। ঋজুদার কাছে শুনেছি

জেঠুমনির সঙ্গে যখন জঙ্গলে যেত তখন তো কোনও বাংলোতেই ইলেকট্রিসিটি ছিল না। শীত বসন্ত গ্রীষ্ম সবই সহ্য করত মানুষে। তবে শুনেছি কোনও কোনও বাংলোতে টানা পাখা ছিল। পাংখা-পুলারেরা সেই পাখা ঘরের বাইরে টুলে বসে সারা রাত টানত আর ঘরের মধ্যে সাহেব-মেমরা নিদ্রা যেতেন। কী দিনকালই ছিল, বল! শহরেও এসি ছিল না ঘরে ঘরে, এসি গাড়ি ছিল না। মানুষ আদরে গোবর আরামে নিজেদেরই নষ্ট করছে প্রতিনিয়ত। পশ্চিমি দেশের সঙ্গে যুদ্ধ হলে তাদের ইলেকট্রিক ইনস্টলেশনগুলোকে যদি নষ্ট করে দেওয়া যায়, তবে তারা এমনিতেই মরে যাবে—তারা এতখানিই নির্ভরশীল হয়ে পড়েছে বিজলীর ওপরে।

—সে কথা ঠিক। বলে ভটকাই দরজাটা খুলে দরজায় দাঁড়িয়ে বলল, দরজাটা দিয়ে দে। যার যার যন্ত্রগুলো তো আছে, নাকি তুই আনিসনি সঙ্গে।

অবশ্যই এনেছি। তুইও এনে ভালো করেছিস। তিতিরও নিশ্চয়ই এনেছে। "হঠাৎ কোথা হইতে কি হইয়া যাইবে" বুঝলি না? ফাগুয়ারা ভিলাতে যেমন অপ্রস্তুতে পড়েছিলাম তা বলার নয়। তাই এবারে আর রিস্ক নিইনি।

ভটকাই বলল।

তারপর বলল, ঋজুদা এত তাড়াতাড়ি রহস্যটা নিষ্পত্তি করে দিল, ওই ঠাণ্ডাতে আরও কদিন যে দিলখুশ ছাতুর লিট্টি খাব তা আর হল না।

আমি বললাম, সবই কপাল, বুঝলি না। কপালে গোপাল করে। এই যাত্রায় নির্বিঘ্নে নাগজিরা দর্শন করে কলকাতা ফিরতে পারলেই ভাগ্যবান মনে করব। শুধু বেড়ানো কতদিন হয়নি বল তো!

—যা বলেছিস।

www.boiRboi.blogspot.com

৭

ঋজুদাও চান সেরে এসে বসল বারান্দাতে। এমন সময় ভিতর থেকে দুই মেমসাহেব আর একজন লম্বা-চওড়া মারাঠি ভদ্রলোক এলেন। বললেন, মে উই জয়েন উ্য?

বাই ওল মিন্‌স।

ঋজুদা বলল।

ভদ্রলোক বললেন, আমার নাম পোপোটলাল।

ঋজুদা বলল, আপনার নাম শুনেছি আমি। আপনি ডাণ্ডেকর সাহেবকে চেনেন তো? উনি আমার খুবই পরিচিত।

—চিনব না! যদিও সে আমার সহপাঠী কিন্তু জুওলজিক্যাল সার্ভেতে সেই তো আমার বস এখন।

তারপরেই বললেন, "আপনাদের সঙ্গে আলাপ করিয়ে দিই, ইনি হচ্ছেন Steffi Wolfessohn আর ওঁর নাম Elda Unger, ওঁদের

তিনজনের হাতেই বিয়ারের বোতল ছিল।

ঋজুদা ওঁরা আসতেই উঠে দাঁড়িয়েছিল। সঙ্গে আমরাও। ঋজুদা বলল, ভেরি নাইস টু মিট উ্য লেডিজ।

তারপর পোপোটলাল সাহেবকে বলল, ওঁদের চারজনের আসার কথা ছিল না?

হ্যাঁ। কিন্তু অন্য দু'জন অন্ধারী তড়োবাতে চলে গেছেন। Karu Gum Tress দেখতে।

এলডা উনগার বললেন, আমরা আপনার কথা শুনেছি মিস্টার পোপোটলাল-এর কাছে। আপনি একজন ন্যাচারলিস্ট এবং অ্যাডভেঞ্চারার।

তিতির বলল, উনি একজন প্রাইভেট ডিটেকটিভও।

একথা শুনেই এলডা উনগার বললেন, তাই? আপনি দেখছি ভার্সেটাইল জিনিয়াস মিস্টার বোস।

তিতির এবার জার্মানে কী যেন বলল স্টেফি ওলফেসনকে। ওঁরা দুজনেই তিতিরের মুখে জার্মান শুনে খুশি হলেন। নিজের ভাষা, পৃথিবীর অন্য প্রান্তে বসে শুনতে কার না ভালো লাগে!

পোপোটলাল সাহেব বললেন, ওঁরা দুজনেই নামকরা লেপিডপটারিস্ট। একজন ফ্রাঙ্কফুর্ট বিশ্ববিদ্যালয়ে আছেন আর একজন মিউনিকের বিশ্ববিদ্যালয়ে। এখানে যে সব প্রজাতি আছে প্রজাপতির তার অনেকগুলিই, মানে যেগুলি দুষ্প্রাপ্য আমাদের চোখে পড়েছে এবং ওঁরা নিয়েওছেন। এত অল্প সময়ের মধ্যে যে এই অঘটন ঘটবে তা আমরা নিজেরাই ভাবতে পারেনি। তবে সাপ বিছে মাকড়সার কামড়ে যে মরিনি, বড় জানোয়ারদের কথা বাদই দিলাম, এই আমাদের সৌভাগ্য। কিন্তু ওঁরা খুঁজছেন একটি বিশেষ প্রজাপতি যার নাম সিলভার মিসচিফ্। ডার-এস-সালাম-এর একজন

www.boiRboi.blogspot.com

লেপিডপটারিস্ট-এর মুখে নাকি শুনেছেন ওঁরা যে মহারাষ্ট্রের এই নাগজিরা টাইগার প্রিসার্ভেই সিলভার মিসচিফ পাওয়া যেতে পারে। একে অনেকে আবার বলেন মুনলাইট মিসচিফ। এই প্রজাপতি যদিও দু'একজন দেখেছেন ধরতে পারেননি কেউই। তাই এ এখনও আনচার্টেড। কেউ ধরতে পারলে তাঁর নাম এই জগতে অমর হয়ে যাবে। হয়তো তাঁর নামেই নতুন নামকরণ হবে প্রজাপতিটির।

—তাই?

ঋজুদা বলল।

ততক্ষণে তিতির ওঁদের দুজনের সঙ্গে জার্মানে নানা গল্প শুরু করে দিল। জার্মান ভাষাটা বড় খটমট। সংস্কৃতের সঙ্গে মিল আছে। প্রতিটি শব্দই গালভরা। হুস-হাস করে উচ্চারণ করতে হয়।

পোপোটলাল সাহেবকে ঋজুদা জিজ্ঞেস করল কী কী প্রজাপতি দেখলেন এখানে? কতদিন এসেছেন এখানে আপনারা?

—আগামীকাল নিয়ে সাতদিন হবে। পরশু ভোরে চলে যাব। দেখেছি তো অনেকই প্রজাতি আর প্রজাপতি। ধরেওছি। নিয়ে যাচ্ছি সঙ্গে করে।

—যেমন?

—সে কি বলে শেষ করা যাবে?

পোপোটলাল সাহেব বললেন, নাগজিরাতে তো উনপঞ্চাশ রকম প্রজাতির প্রজাপতি এ পর্যন্ত চিহ্নিত করা গেছে—ন'টি পরিবারের। তার মধ্যে DANDID EGGFLY-ও আছে। তবে তা এতই দুষ্প্রাপ্য হয়ে গেছে যে ওয়াইল্ড লাইফ প্রোটেকশন অ্যাক্ট-এর শিডিউল ওয়ান-এ ঢুকে গেছে। অর্থাৎ একটি DANDID EGGFLY মারলে বা ধরলে এখন বাঘ মারার যা শাস্তি তাই হবে। অর্থাৎ এক বছর থেকে ছ'বছরের জেল এবং তার সঙ্গে পাঁচ হাজার টাকা

জরিমানা।

—DANDID EGGFLY দেখলেন একটিও আপনারা? কেমন দেখতে?

—দেখতে বাদামি কালো। ডানায় বড় ও ছোট তিনটি সাদা স্পট আছে।

পোপোটলাল সাহেব বললেন, দূর থেকে দেখেছিলাম অন্ধারপানিতে, স্যাঁতসেঁতে জায়গাতে—উড়ে চলে গেল।

অন্ধারপানি নামটা চেনা চেনা লাগল। পরক্ষণেই মনে পড়ল, নভেগাঁও-তে চৌকিদার চিঞ্চিকেডেই বলেছিল অন্ধারপানির কথা।

আমার গা ছমছম করে উঠল। জানি না, ভটকাই আর তিতিরের চিঞ্চিকেডের কথা মনে পড়ল কি না।

পোপোটলাল সাহেব বললেন, প্রজাপতিদের মধ্যে মথ'রাও পড়ে। যখন ওড়ে না, বিশ্রাম করে, তখন প্রজাপতিরা তাদের ডানাগুলোকে ভাঁজ করে সোজা উপরে তুলে রাখে আর মথ'রা ডানাগুলো শুইয়ে রাখে। প্রজাপতিদের শরীর তিনভাগে বিভক্ত। হেড, থোরাক্স আর অ্যাবডোমেন। দু জোড়া করে ডানা থাকে ওদের আর তিনজোড়া পা।

—বাঃ। আরও বলুন প্রজাপতিদের সম্বন্ধে।

ভটকাই বলল পোপোটলাল সাহেবকে।

শিকারিরা যেমন অজন্তা, ইলোরা, নৈতিতাল হ্রদ এবং ইন্দোরের কাছের ভিমবৈঠকা—যেখানে রক পেইন্টিংস আছে—আদিমতম মানুষদের বাস ছিল যেখানে—যে সব জায়গা শিকার করতে গিয়ে আবিষ্কার করেছিলেন, সেরকম লেপিডপটারিস্টরাও প্রজাপতির খোঁজে বন-পাহাড়ে গিয়ে নানা জায়গা আবিষ্কার করেছেন—নানা বিস্ময়ের বস্তু।

www.boiRboi.blogspot.com

—কোন জায়গা?

—যেমন পূর্ব আফ্রিকার রিফ্ট ভ্যালি—জার্মান প্রফেসর লিকি প্রজাপতির খোঁজ করতে করতেই রিফ্ট ভ্যালি আবিষ্কার করেন। এখন যা পৃথিবীর সব ট্যুরিস্টদেরই দ্রষ্টব্য। ওলডুভাই গর্জও তিনিই আবিষ্কার করেছিলেন।

বলেই বললেন, আমি জানি যে মিস্টার বোস আফ্রিকাতে গেছেন, তোমাদের মধ্যে কেউ কি গেছ?

ঋজুদা বলল, হ্যাঁ। ওরা তিনজনেই গেছে আমার সঙ্গে পূর্ব আফ্রিকাতে।

তারপর পোপোটলাল সাহেব বললেন, এই দ্যাখো, তোমাদের নামই জিজ্ঞেস করা হয়নি।

ঋজুদা বলল, ও হল মিস্টার ভটকাই।

—হোয়াট আ নেম! ভটকাই! এরকম পদবি তো জীবনে শুনিনি।

কী করে শুনবেন। ওর নাম যা পদবিও তাই। ঈশ্বর মাত্র এ এক পিসই বানিয়েছিলেন। সারা পৃথিবীতে ওর ডুপ্লিকেট পাবেন না। টেন্থ ওয়ান্ডার অব দ্য ওয়ার্ল্ড।

পোপোটলাল বুঝতে পারলেন যে ঋজুদা রসিকতা করছেন কিন্তু মুখে কিছু বললেন না।

ঋজুদা বলল, আর ওরা হচ্ছে রুদ্র রায় এবং তিতির সেন। এরা সবাই অ্যাকম্প্লিসড্, ওয়েল-ট্রাভেল্ড, আমার সাগরেদ।

—বাঃ। কনগ্র্যাচুলেশন্স।

ভটকাই বলল, প্রজাপতি আর মথদের সম্বন্ধে আরও বলুন না। আমরা যে কিছুই জানি না।

—তোমাদের সব বড় বড় জন্তু-জানোয়ার নিয়ে কারবার। তোমরা এই সব মথ-প্রজাপতির কথা জানবে কী করে। নাগজিরাতে

উনপঞ্চাশ রকম প্রজাপতি দেখতে পাওয়া যায়। যদিও ভারতবর্ষে প্রায় ১৫০০ প্রজাতির প্রজাপতি আছে। আমি অবশ্য এত জানি না যতখানি জানেন এই মেমসাহেবরা। নাগপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের জুওলজিক্যাল ডিপার্টমেন্টের এ এস খুরাদ সাহেব অনেক সাহায্য করেন আমাদের। তবে নাগজিরার অ্যাসিস্ট্যান্ট কনজারভেটর অফ ফরেস্টসও এখানের প্রজাপতিদের নাম ও রাহান সাহান নিয়ে অনেক কাজ করেছেন।

—কী নাম?

—এম এস কালাসকর এবং মিসেস কে এম কালাসকর।

—গায়ক উলহ্াস কাশালকারের কেউ হন না কি?

ভটকাই বলল।

ধ্যাৎ। উনি কাশালকর আর ওঁরা কালাসকার।

তিতির বলল। তুমি বড় যা-তা বল!

—তারপরে? আরও বলুন।

অদম্য ভটকাই বলল।

—পরে বললে হবে না? এখন একটু গল্প গুজব করি।

—পরে আর কখন বলবেন? কাল তো সারাদিন আপনারা জঙ্গলেই থাকবেন। তারপর দিন ভোরে তো চলেই যাবেন।

—তা অবশ্য ঠিক।

বলুন, বলুন, ঋজুদাও বলল।

—আপনি তো সব জানেনই।

—সব জানি না। আর জানতেও চাই না। ঈশ্বর যেন কখনওই আমাকে সর্বজ্ঞ হওয়ার অভিশাপ না দেন।

প্রজাপতিদের ডানার মধ্যে অনেক ভাগ আছে। সামনের ডানার ডানদিকে ছ'টি ভাগের ছ'টি নাম আছে। যেমন Coasta, Apex,

www.boiRboi.blogspot.com

Termen, Tornus, Dorsum, Base এবং Cell। সামনের বাঁ-দিকের ডানাতে আছে চারটি ভাগ। তাদের নাম Submarginal area, Post discal area, Discal area এবং Basal area। সবসুদ্ধু এগারোটি ভাগ। পেছনের ডানারও তাই।

—বাবা। আমরা তো জানতাম "প্রজাপতি প্রজাপতি কোথা যাও নাচি নাচি।" তাদের ফিনফিনে ডানার মধ্যে এতরকম কম্পলিকেশান্স!

ভটকাই বাংলাতেই বলল।

আমরা ওর কথাতে হেসে উঠলাম। পোপোটলাল সাহেব বুঝতে না পেরে বোকার মতো চুপ করে চেয়ে থাকলেন।

জার্মান মেমসাহেবরাও কথা না বুঝতে পেরে চুপ করেই ছিলেন। তবে তিতিরের সঙ্গে দুজনেই পুটুর পুটুর করে কথা বলেছিলেন।

ঋজুদা ওঁকে অপ্রতিভ অবস্থা থেকে মুক্ত করে বললেন, এবারে স্পেসিগুলোর নাম আর একেকটা স্পেসির কয়েকটা প্রজাপতির নাম বলুন তাহলেই হবে।

আমি বললাম, এতেই ভটকাই-এর পাড়ার রক-এর বন্ধুরা ভিরমি খাবে।

তিতির আর ঋজুদা হেসে উঠল এবারে।

ভটকাই বলল, একটা সিরিয়াস আলোচনা হচ্ছে তার মধ্যে তোমরা কেন উল্টোপাল্টা প্রসঙ্গ এনে ফেলছ?

পোপোটলাল সাহেব বললেন, PAPILIONIDAE। বানান করেই বললেন।

আমার সন্দেহ হল ওইসব খটমট নামের সঠিক উচ্চারণ হয়তো উনি নিজেই জানেন না।

PAPILIONIDAE-এর মধ্যে আছে অ্যাগোলোজ, সোয়ালোটেইল্‌স আর বার্ড উইংগ্‌স। তারপরে COMMON ROSE, COMMON NORMON আর LIME BUTTERFLY। তারপরের প্রজাতি হচ্ছে PERIDAE, এদের মধ্যে আছে সাদা আর হলুদ, মেজেবেলস, অরেঞ্জচিপ্‌স আর ব্রিমস্টোন্‌স।

স্টেফি উলফসন ইংরেজিতে বললেন, একটা ছেড়ে গেলেন।

পোপোটলাল সাহেব বললেন, কী?

—সালফারস্‌—

—ঠিক ঠিক।

তারপর বললেন, এদেরই মধ্যে আছে LEMON EMIGRANT, SPOTLESS আর GRASS YELLOW। আরেকটা প্রজাতি হচ্ছে DANAIDE। এর মধ্যেই STRIPED TIGER।

ওটা চিনি।

ভটকাই জানাল।

—আর আছে COMMON INDIAN CROW, NYMPHALIDAE-র মধ্যে আছে BLACK RAJAH, BARONET, BLUE PANSY, LEMON PANSY, CHOCKOLATE PANSY আর তার পরেই DANDID EGGFLY—যাদের কথা বলেছি আগেই ওয়াইল্ড লাইফ প্রোটেকশন অ্যাক্ট-এর শিডিউল ওয়ান-এ যার নাম আছে।

ঋজুদা বলল, ভটকাই এবারে ক্ষেমা দে। এত নাম আর বানান কি তোর মুখস্থ থাকবে? কেন মিছিমিছি ঝামেলা করছিস?

তারপর পোপোটলাল সাহেবকে বলল, আপনি নাগজিরার প্রজাপতিদের ওপরে আপনাদের যে Brochure আছে তারই একটা আমাকে ডাকে পাঠিয়ে দেবেন তো দয়া করে। এরা মুখস্থ করুক।

www.boiRboi.blogspot.com

রঙিন ছবিও তো আছে কিছু সেই ব্রশিওর-এ। তা থেকে প্রজাপতি চিনবে এরা। তারপর শীতে যখন আমরা আবার আসব তখন ইচ্ছে করলে বাঘ-ভাল্লুক না দেখে ওরা প্রজাপতিই দেখবে তখন।

তারপর আমাদের বলল, ওঁরা দীর্ঘদিনের অধ্যবসায়ে যা জেনেছেন তা যদি এক সন্ধ্যাতেই জেনে যেতে চাস তবে উদোর পিণ্ডি বুধোর ঘাড়ে হবে।

উদোর পিণ্ডি বুধোর ঘাড়ের ইংরেজি ঋজুদা বা পণ্ডিত তিতিরেও জানা নেই। ঋজুদা ইংরেজিতে বলল, দে উইল বি টোটালি কনফিউজ্‌ড।

এমন সময়ে মোটাভাই এসে প্রদীপকাকুকে জিজ্ঞেস করল, খানা লায়গা সাব?

মোটাভাইকে খাবার আনতে বলব তো?

মোটাভাই-এর গাড়িতেই প্রদীপকাকু ও সঞ্জীবকাকু কটেজ থেকে একটু আগে এলেন।

ঋজুদা বলল, হ্যাঁ, হ্যাঁ বলো। কাল একেবারে ভোর ভোরে বেরতে হবে। সকালে আর সন্ধেতেই তো জানোয়ার দেখার সময়। বেলা বাড়লে ওরা সব গভীরে চলে যাবে।

প্রদীপকাকু বললেন, আরেকটু পরে বলি। এখন তো মোটে আটটা।

যা ভালো মনে করো। ক্যাসারোলগুলো নিয়ে মোটাভাই চলে গেল। প্রদীপকাকু বলে দিলেন নটাতে আনতে এক্কেবারে গরম গরম। ডাইনিং রুমে দুটো লণ্ঠন আর একটা হ্যাজাকও আছে। প্রয়োজনে চৌকিদার জ্বেলে দেবে। তবে না জ্বালালেই ভালো। লণ্ঠনের আলোতে যে রহস্যময়তা তা হ্যাজাকের আলোতে থাকে না। তাছাড়া মাছের কাঁটা তো আর বাছব না আমরা। খাব তো খিচুড়িই।

জার্মান দুই মহিলা বিয়ার খাচ্ছিলেন। পোপোটলাল সাহেবও সঙ্গে খাচ্ছিলেন। ঋজুদা আর প্রদীপকাকুদেরও অফার করেছিলেন ওঁরা। কিন্তু ঋজুদা বলল, না, ধন্যবাদ। প্রদীপকাকু আর সঞ্জীবকাকু বোধহয় কটেজ থেকে কিছু খেয়ে এসেছিলেন। মুখ দিয়ে গন্ধ বেরুচ্ছিল। মেমসাহেবরা বললেন, আমরা এবার গিয়ে শোব। টুমরো ইজ দ্যা লাস্ট ডে অ্যান্ড উই উইল স্পেন্ড দ্যা হোল ডে ইন দ্যা জাঙ্গল।

—খাওয়া দাওয়া?

—স্যান্ডউইচ নিয়ে যাব আর বিয়ার। দুষ্প্রাপ্য প্রজাপতির সন্ধান করা, মানুষখেকো বাঘের সন্ধান করার চেয়েও ধৈর্যসাপেক্ষ।

তারপর আমাদের গুডনাইট জানিয়ে ওঁরা উঠলেন।

ভটকাই বলল, গুটেন ন্যাক্ট।

ওঁরাও হেসে বললেন, গুটেন ন্যাক্ট।

আমরা সবাই হেসে দাঁড়ালাম।

এলডা উঙ্গার দেখতে ভারী মিষ্টি। একটা ফেডেড জিনস আর ওপরে গোলাপি টপ পরেছেন। আর উলফেসন মেমসাহেবকে দেখতে দাঁড়কাকের মতো। তবে ALBINO কাক। তার চেহারাও লম্বা চওড়া কেঠো পুরুষের মতো। মেয়েরা মেয়েদের মতো না হলে ভালো লাগে না। কথাবার্তাও রুখুসুখু এই মেমসাহেবের।

ওঁরা চলে গেলে সে কথা ভটকাই অকপটে বলেও ফেলল।

ঋজুদা বলল, তুই তো আর স্টেফি উলফেসনকে বিয়ে করছিস না। তার চেহারা আর কথাবার্তা নিয়ে তোর এত মাথাব্যথা কিসের?

তিতির বলল, তুমি যে ওদের গুটেন ন্যাক্ট বললে, তুমি কি জার্মান শিখছ নাকি?

ভটকাই বলল, তিনটে শব্দ জানি। মওকা মতো একটা ঝেড়ে

দিলাম। কে কত জানে সেটা বড় কথা নয়। জায়গা মতো সেই জ্ঞান প্রয়োগ করাটাই আসল।

—কা-র-রে-ক্ট।

ঋজুদা বলল।

আমি বললাম, গুটেন ন্যাক্ট মানে কি?

—গুড নাইট।

—আর অন্য দুটো শব্দ?

—একটা গুটেন মর্গেন, মানে গুড মর্নিং।

—আর তৃতীয়টা?

—ডাঙ্কেশান। মানে, থ্যাঙ্ক উ্য।

ঋজুদা হেসে বলল, এই তিনটে মোক্ষম শব্দ দিয়েই তো জার্মানি জয় করতে পারিস। বেশি জানার দরকার কি?

আমরা হেসে উঠলাম।

প্রদীপকাকুর পায়ের কাছে একটা থলে ছিল। প্রদীপকাকু বললেন, রুদ্র তিনটে গ্লাস আর এক বোতল মিনারেল ওয়াটার নিয়ে এসো তো।

ঋজুদা বলল, কী ব্যাপার?

—বেণুদা আপনার জন্য দিয়ে দিয়েছে। গ্লেনফেডিস স্কচ হুইস্কি। সিঙ্গল মল্ট।

—কোন বেণুদা?

—কমলেশ গাঙ্গুলি। বেণুদাকে ভুলে গেলেন?

—ও। আরে বেণুদা ভুলব কী করে। গতবার সে আমার অনারে বড় হোটেলের ব্যাঙ্কোয়েট ভাড়া করে পার্টি দিল যে।

—তবে?

—আমরা আপনার জিনিস থেকে দুটো করে মেরে এসেছি।

www.boiRboi.blogspot.com

এখন আপনি একটু প্রসাদ করে দিলে আপনার সঙ্গে আমরাও আর একটা করে পেতে পারি খিচুড়ি খাওয়ার আগে।

আমি গ্লাস নিয়ে এলে প্রদীপকাকু তৈরি করে দিল। ঋজুদা হাতে নিয়ে বলল, চিয়ার্স। খেলে একটা কেন খাবে, একাধিক খাও। একটা খেলে গৃহস্থর অকল্যাণ হয়, জানো না? কী রসগোল্লা আর কী হুইস্কি!

ভটকাই চকচকে চোখে ঋজুদার গ্লাসের দিকে তাকিয়েছিল।

ঋজুদা বলল, ভটকাই, উ্য মাস্ট আর্ন ইওর স্কচ। আমি বাবার পয়সাতে সিগারেটও খাইনি। প্রদীপকাকুরাও নয়। জীবনে পায়ে দাঁড়াও, যথেষ্ট রোজগার করো নিজের কঠোর পরিশ্রম দিয়ে, তারপর চকচকে চোখে তাকাবে এসব জিনিসের দিকে।

ভটকাই লজ্জা পেয়ে চোখ নামিয়ে দিল।

তারপরই বিড়বিড় করে বলল, তুমি যে জঙ্গলের নেশা ধরিয়েছ। সারা জীবন জঙ্গলে জঙ্গলে জংলি হয়েই ঘুরে বেড়াতে হবে। রোজগার করা আর হবে না। "যে পাখি ওড়ে তার ছাও ফরফর করে", আমার দ্বারা সেসব বোধহয় আর হবে না। এক নেশাতেই ধরাশায়ী আর অন্য নেশা করব কী?

আমরা কেউই হাসলাম না। কারণ, কথাগুলো একশোভাগ সত্যি। ভটকাই যে কথাগুলো ফট্ করে বলে ফেলতে পারে আমাদের সে কথা বলতে অনেকেই পাঁয়তারা করতে হয়। করার পরও বলা বোধহয় হয়ে ওঠে না। সত্যিই! আমাদের জাগতিক ভবিষ্যৎ এই নাগজিরার অন্ধারবনেরই মতো অন্ধকার হয়তো। জানি, বুঝি সব, তবু ঋজুদার ডাক এলেই মালিকের ন্যাওটা গোল্ডেন রিট্রিভার কুকুরের মতো লাফিয়ে উঠে কুঁই কুঁই করতে করতে পাছু ধরি।

www.boiRboi.blogspot.com

৮

খিচুড়িটা ভালোই করেছিল কিন্তু কুলিনারি বিশারদ ভটকাইচন্দ্র বলল, এটা তো খিচুড়ি হয়নি, খিচ্‌ড়ি হয়েছে। আমাকে যদি একটু ফ্রি-হ্যান্ড দিতেন প্রদীপকাকু তবে এরই মধ্যে একদিন খিচুড়ি রেঁধে খাওয়াতাম আমি।

ঋজুদা বলল, এই গরমে আর খিচুড়ি খাওয়াস না, সাকোলি থেকে গাড়ি পাঠিয়ে বেশি করে কলাই ডাল, পোস্ত আর কাঁচা আম আনাও প্রদীপ। আলু পোস্ত, কাঁচা কলাই-এর ডাল, পোস্ত বাটা, ডিমসেদ্ধ দিয়ে খেয়ে প্রাণটা বাঁচবে।

—তাই করব। ক্যান্টিনের রুটিগুলো খুব মোটা মোটা। এই আমজনতার খাবার তোমাদের চলবে না। বাসমতি চাল তো সঙ্গেই আছে।

—ঘিও তো আছে। বাসমতি চালের ভাতে গাওয়া ঘি দিয়ে আলুসেদ্ধ কাঁচা পেঁয়াজ আর কাঁচা লঙ্কা দিয়ে খেয়ে যা সুখ তেমন

আর কিছুতে নয়। এখানে খাওয়া-দাওয়ার আড়ম্বর বেশি কোরো না প্রদীপ, ভটকাইচন্দ্র যাই বলুক।

—আপনি যা বলবেন।

প্রদীপকাকু বললেন।

খাওয়ার পরে কিছুক্ষণ বাইরে বসে যে যার ঘরে গেলাম। গরম এখন কমে গেছে। রাতে সম্ভবত গরমে কষ্ট পেতে হবে না। শেষ রাতে হয়তো চাদর বা কম্বলও লাগতে পারে।

আমি আর ভটকাই জানালার সামনে খাটে বসলাম। সোফা ভিতর দিক। সেখানে বসে বাইরেটা দেখা যায় না। এখন বাইরেটা নানা হরিণের ডাকে একেবারে সরগরম। ডাকের মধ্যে কোনও বিরাম নেই, সূর্যাস্তের আগে পাখিরা যেমন করে ডাকে, তখন মনে হয় তাদের বাড়িতে বুঝি ডাকাত পড়েছে, এখানের হরিণ, সম্বর, কোটরা, নীলগাইয়েরাও তেমনই করে ডাকছে। তবে গাউরদের দেখলাম না। তারা গভীর জঙ্গলের আড়াল ছেড়ে মানুষের এত কাছে আসে না। অন্ধকারে দেখা তো কিছু যায় না। শুয়োরেরা হয়তো এসেছে। জানার উপায় নেই। পেঁচা ডাকছে—মানে পেঁচা আর পেঁচানি ঝগড়া করছে। ল্যাপউইঙ্গদের ডিড-ড্যি-ড্যু-ইট? ডিড-ড্যি-ড্যু-ইট ডাক এই বনমধ্যের অন্ধকার রাতকে এক অন্য মাত্রা দিয়েছে। গা ছমছম করে ওঠে ওদের ডাকে। রাতে তো করেই, দিনমানেও করে। আশ্চর্য এক রহস্যময়তা আছে ওদের ডাকে। ভারতের সব বনেই কার কাছে ওরা জবাবদিহি করে বেড়ায় রাত্রিদিন তা ওরাই জানে।

বাইরে কিছুই দেখার নেই। নিকষকালো অন্ধকার। তারাদের আলো জলে পড়ায় জলের ওপরে অন্ধকারটা একটু ফিকে দেখাচ্ছে এই যা। কিছু-ই দেখার নেই অথচ এই জঙ্গলের রাত এক ঘোর এনেছে—আমরা দুজন বসে আছি তো বসেই আছি। জানি না

দোতলাতে ঋজুদা, পাশের ঘরে তিতির আর জলের ধারের কটেজের বারান্দাতে বসে প্রদীপকাকু আর সঞ্জীবকাকু কী করছে বা করছেন।

জানালা দুটো পুরোই খুলে শুয়েছিলাম। শেষ রাতে একবার বাথরুমে গেছিলাম। উঠে দেখি ভটকাই জানালার সামনে দাঁড়িয়ে আছে।

—কী রে! ঘুমোসনি?

—ঘুমিয়েছিলাম। কিন্তু...

—কিন্তু কী?

—কে যেন আমার নাম ধরে ডাকল।

—তোকে কি নিশিতে পেল?

—নিশিতে পেলে তো এমন জায়গাতেই পাবে। কলকাতাতে কি কারোকে নিশিতে পায়?

—তা ঠিক। তবে ডাকল কে? ছেলে? না মেয়ে?

—ইয়ার্কি করিস না।

বাথরুম থেকে ফিরে বললাম, শুয়ে পড়। রাত বেশি বাকি নেই।

ও বলল, হুঁ।

যখন ঘুম ভাঙল আমরা দেখি ভটকাই একদম তৈরি হয়ে গেছে। ঋজুদার কাছে বাহাদুরি নেবে। আমাকে বলবে লেট-লতিফ। ওর সব ভালো শুধু এই সব ছোটখাট Meanness ছাড়া।

আমিও তৈরি হয়ে নিলাম। নীচে নেমে দেখি ঋজুদা আর তিতির দুজনেই তৈরি হয়ে বাইরের বারান্দাতে বসে আছে। ঋজুদা বলল, প্রদীপরা ফ্লাস্ক নিয়ে ক্যান্টিনে গেছে কফি আনতে। এক কাপ করে কফি খেয়ে আর বাকিটা সঙ্গে নিয়ে আমরা বেরিয়ে পড়ব।

—মেমসাহেবদের আওয়াজ পাচ্ছি না? পোপোটলাল সাহেব কোথায়?

www.boiRboi.blogspot.com

চৌকিদার বলল, ওরা অন্ধকার থাকতেই বেরিয়ে পড়েছে। প্রজাপতি নিয়ে যাবার জন্যে বড় বড় সাদা কার্ডবোর্ড-এর বাক্স এনেছে সঙ্গে। তার উপরে ফুটো ফুটো করা আছে মানে, পারফোরেটেড, সেই বাক্সে করে স্যান্ডউইচ আর বিয়ার নিয়ে গেছে। তবে লম্বা মেমসাহেবের রাতে জ্বর এসে গেছে—উনি ওষুধ খেয়ে ঘুমোচ্ছেন চৌকিদার বলল। অন্যজন আর পোপোটলাল সাহেবই গেছেন।

তিতির বলল, চৌকিদার কি নাম জানে মেমসাহেবদের। কার জ্বর হয়েছে ও জানল কী করে?

ঋজুদা হেসে বলল, নাম জানে না, তবে চেহারার যা বর্ণনা দিল তা শুনেই বুঝতে পারলাম।

ভটকাই তো একজনের নাম দিয়েছে ALBINO—দাঁড়কাক।

আমি বললাম।

তাই?

বলেই, ঋজুদা হেসে ফেলল।

প্রদীপকাকুরা আসতেই আমরা কফি খেয়ে বেরিয়ে পড়লাম। দুটি গাড়িই নিলাম। আমি গেলাম ওঁদের স্করপিওতে। এ গাড়িতে জলের বোতলও আছে গোটা চারেক।

এই নাগজিরার জঙ্গলে কোনও ট্যুরিস্টকেই একা একা ঢুকতে দেওয়া হয় না। প্রত্যেক গাড়িতে একজন করে গাইড নিতেই হবে। র‍্যাফ-এর মতো পোশাক তাদের। এরা বনবিভাগের কর্মচারী নয় কিন্তু, আশপাশের গ্রামের বাসিন্দা। মহারাষ্ট্রের এই টাইগার প্রিসার্ভ করার জন্যে অনেক গ্রামই তো উচ্ছেদ করতে হয়েছে, যেমন হয়েছে মধ্যপ্রদেশের কান্‌হাতেও।

এদের রোজগারের একটা পথ হয়েছে। ট্যুরিস্টরা কত দূর দূর থেকে এত খরচ করে নাগজিরাতে আসেন তাদের কাছে একশো দুশো টাকা কোনও টাকাই নয়। তার ওপরে বাঘ-টাঘ দেখিয়ে দিতে

www.boiRboi.blogspot.com

পারলে তো কথাই নেই। তবে এই গাইডরা সকলেই মারাঠি। হিন্দি বলে বটে, তবে তেমন সড়গড় নয়। তাই কথা বুঝতে একটু অসুবিধা হয়। তবে প্রদীপকাকু ও সঞ্জীবকাকু মারাঠিদেরই মতো মারাঠি বলেন তাই ওঁরা সঙ্গে থাকাতে খুবই সুবিধা হচ্ছে।

এই কারণেই পথে গাড়ি থামিয়ে প্রদীপকাকু ভটকাইকে এ গাড়িতে ডেকে নিয়ে সঞ্জীবকাকুকে ঋজুদাদের সঙ্গে দিয়ে দিলেন। এখন তো সিজন শেষ। আমাদের মতো উন্মাদেরা ছাড়া কারা এই গরমে নাগজিরাতে আসেন। সিজন আরম্ভ হয় পুজোর সময় থেকে আর চলে মার্চ-এর প্রথম অবধি। ভিড়ে ভিড়াক্কার। তখন এই গাইডরা দিনে পাঁচশো পর্যন্ত কামিয়ে নেয়।

এখন গরমের দিন বলেই জঙ্গলে আগুন লাগার সময়। পথের পাশে পাশে ফায়ার লাইন খোঁড়া হয়েছে। ফায়ার লাইন মানে, জঙ্গলের একদিকে আগুন লাগলে আগুন যাতে বনপথ পেরিয়ে অন্যদিকে না যেতে পারে তাই নালার মতো খোঁড়া হয়। আগুন সেই নালাতে পড়ে নিভে যায়—অন্যদিকের জঙ্গল পোড়াতে পারে না। আগুন লাগলে অনেক সময় বন্যপ্রাণীরাও ঝলসে পুড়ে মরে যদি আগুন তাদের ঘিরে ফেলে। তেমন অবশ্য কমই হয়। তারা তার আগেই অন্যদিকে পালিয়ে যায়। আগুন লেগেছে কিনা দেখবার জন্যে মাঝে মাঝেই অস্থায়ী ডেরা বানানো আছে বনপথের মোড়ে মোড়ে। সেখানে বনবিভাগের কর্মীরা আছেন। আগুন এবং চোরা শিকারের খবর তাঁরা পাঠিয়ে দেন ওয়্যারলেস-এ বনদপ্তরে। মহারাষ্ট্র এবং মধ্যপ্রদেশে হাতি নেই। এটা মস্ত সুবিধা বনবিভাগের। হাতি থাকলে এই বনকর্মীদের বড় গাছের উপরে মাচা বেঁধে থাকতে হত। যেমন উত্তরবঙ্গ, ঝাড়খণ্ড, বিহার এবং আসামের সর্বত্রই হয়।

যা কিছু দেখেছি আমি আর ভটকাই প্রদীপকাকুকে জিগগেস করেছি। আর ইনি গাইডকে মারাঠিতে জিগগেস করে তার মারাঠি জবাবকে তর্জমা করে আমাদের বলে দিচ্ছেন।

৯

নাগজিরার জঙ্গল খুব শুকনো। উষর। জলের বড় অভাব। নাগজিরা বাংলোর সামনে যে দিঘি কাটা আছে তা থেকে প্রতি সকালেই ট্যাঙ্কারে জল পাম্প করে নিয়ে জঙ্গলের গভীরে গভীরে পথের পাশে পাশে বনবিভাগ যে সব চৌবাচ্চা ইট-সিমেন্ট দিয়ে বাঁধিয়ে রেখেছেন তাতে জল ভর্তি করে দেয়। সব জানোয়ারই সেই জল খায়। নাগজিরার এলাকা দেড়শো বর্গ কিমি মতো।

অধিকাংশই শুকনো পর্ণমোচী গাছ। বাঁশও আছে প্রচুর। অইন, তেন্দু, ধাওদা, বহেরা, সেগুন আর বাঁশ ছাড়াও নানা ঝোপঝাড় গুল্ম ইত্যাদি আছে। স্বাভাবিক গহন জঙ্গল যেমন আছে তেমন আবার ক্লিয়ার ফেলিং করে বনবিভাগের তৈরি তৃণভূমিও আছে জানোয়ারদের বিচরণ-এর জন্যে। তাদের দৌড়াদৌড়ি করবার জন্যে। মেডিসিনাল প্লান্টস আছে অনেক। বনৌষধি। তার জন্যে বনের বিশেষ বিশেষ অঞ্চল আলাদা করা আছে।

www.boiRboi.blogspot.com

কোনও কোনও জায়গাতে এই উষর বনের মধ্যেও সামান্য জলাভূমি আছে যদিও তা অত্যন্ত ছোট ছোট।

ভটকাই বলল, নাগজিরা ওয়াইল্ড লাইফ স্যাংচুয়ারি কোন ফরেস্ট ডিভিসনের মধ্যে পড়ে প্রদীপকাকু?

ভাণ্ডারা ফরেস্ট ডিভিসনের মধ্যে পড়ে। ওই ফরেস্ট রেঞ্জ-এর নাম টিরোরা রেঞ্জ। মাইকাল-সাতপুরা পর্বতমালারই একটি সাব-রেঞ্জ এই অভয়ারণ্যের মধ্যে মধ্যে হাত-পা ছড়িয়ে আছে। তাই এই বন এত উঁচু-নিচু পাহাড়-উপত্যকাতে ভরা। ঢেউ খেলানো।

—ওই সাব-রেঞ্জ-এর নাম কী প্রদীপকাকু?

—এর নাম গোখুরি রেঞ্জ।

তারপরেই বললেন, বিকেলে যখন বেরোনো হবে তখন তোমাদের গাড়িতে সঞ্জীবকে নিয়ে নিও। নাগপুর পাবলিক স্কুলের ভাইস-প্রিন্সিপাল সুদীপ্ত ভট্টাচার্যর সঙ্গে ও এতবার নাগজিরাতে এসেছে যে সবকিছু ওর নখদর্পণে। ওরা একটা ডকুমেন্টারি ছবি করার জন্যেই আসছে বারবার। ডিরেকশন সুদীপ্তর আর ফোটোগ্রাফি সঞ্জীবের। সঞ্জীবতো টাইমস গ্রুপ-এর-চিফ-ফটোগ্রাফার, ছবিও তোলে দারুণ।

—তা তো আমরা জানিই। আন্ধারী তাড়োবার সব ছবি আমাদের পাঠিয়ে ছিলেন না? দুর্দান্ত সব ছবি।

—তাই? পাঠিয়েছিল বুঝি?

—হ্যাঁ। আমরা সমস্বরে বললাম।

Triger Trail নামের একটা রাস্তা আছে, চোরখামারা রোড থেকে বেরিয়েছে—চোরখামারার পশ্চিমে—মেডিসিন্যাল প্লান্ট কনজার্ভেশন এরিয়া আছে—বনবিভাগ আলাদা করে চিহ্নিত করে রেখেছে।

—এই নাগজিরার মধ্যে কী কী রাস্তা আছে? রাস্তার নাম জানিয়ে কোন রোড সাইন্‌স তো নেই।

প্রদীপকাকু হেসে বললেন, সে তো নাগপুর শহরের মধ্যেও নেই। নাগপুর ইমপ্রুভমেন্ট ট্রাস্ট-এর ইঞ্জিনিয়ার হিসেবে যে সব নতুন পথ আমরা বানাচ্ছি তাদের মোড়ে মোড়ে আস্তে আস্তে পথের নাম লেখা সাইন্‌স বসাবার বন্দোবস্ত করছি।

—যে পথ দিয়ে আমরা এখন যাচ্ছি তার নাম কী?

—তার নামই চোরখামারা রোড। এই পথ বেরিয়েছে নিলয় থেকে।

—নিলয় মানে?

—'নিলয়' হচ্ছে ভি আই পি রেস্ট হাউসের নাম। যেখানে আছ তোমরা।

—আর আপনারা যেখানে আছেন?

—সেটার নাম লগ-হাট রেস্ট হাউস।

হঠাৎ ভটকাই চেঁচিয়ে উঠে বলল, গাড়ি রোক্কো, গাড়ি রোক্কো।

—কী ব্যাপার?

আমি বললাম, গাড়ি থামা মাত্রই।

ভটকাই বলল, ওই দ্যাখ বাঁদিকের ঝোপের উপরে যে প্রজাপতি দুটো ফুরফুর করে উড়ছে তাদের নাম কমান্ডার। কী সুন্দর লাল কালো আর সাদার কাজ দেখছিস পিঠে। আর একটু দূরে তাকিয়ে দ্যাখ কালো সাদা আর চিলতে লাল ডানার—ওদের নাম স্টাফ সারজেন্ট।

—বাবা! এরা কি মিলিটারি নাকি? এমন মিলিটারি-মিলিটারি নাম।

তারপর বললাম, তুই এমন প্রজাপতি বিশারদ হলি কবে থেকে?

ভটকাই হাসল। বলল শেখার ইচ্ছা থাকলেই শেখা যায়।

সুশান্তকাকুর কাছে আমি প্রতি রবিবারে যাই। আমাদের চিড়িয়াখানাতে যতরকম প্রজাপতি আছে সব চিনে নিয়েছি তার ওপরে প্রজাপতির বইও দিয়েছেন সুশান্তকাকু। কত রকমের প্রজাপতি আছে! যদিও সব দেখিনি। আর তাদের কত রকমারি নাম, কত রকমের PANCY, SAILOR, কতরকমের TIGER, LEOPARD, RAJA, NAWAB। একরকমের প্রজাপতি আছে তাদের নাম Common Indian Crow।

আমি বললাম বলিস কী?

—হ্যাঁ রে। ভটকাই বলল।

—সুশান্তকাকু কে?

প্রদীপকাকু প্রশ্ন করলেন।

—সুশান্ত ভট্টাচার্য।

কলকাতার চিড়িয়াখানার ডেপুটি ডিরেক্টর। উনি যে শুধুই বাঘ ভাল্লুকের খোঁজ রাখেন তাই নয়, গাছ, ঝোপঝাড়, প্রজাপতি এ সবের খোঁজও রাখেন। বিয়ে-থা করেননি, কাজই তাঁর জীবন। সরকারি দপ্তরে এমন ভালোবেসে কাজ করার মতো মানুষ বেশি দেখা যায় না আজকাল।

—বাবা, তুই সরকারি দপ্তরের ব্যাপার কী জানিস?

—আমি জানি না। বাবা বলেন, তাই শুনি। বাবা সুশান্তকাকুকে খুব পছন্দ করেন। তারপর বলল, সুশান্তকাকুই তো চিড়িয়াখানাতে আমাকে স্লো-লরিস চিনিয়েছিল।

—সেটা কী বস্তু? খায় না মাথায় দেয়?

প্রদীপকাকু বললেন।

www.boiRboi.blogspot.com

—স্লো-লরিস এক রকমের ছোট্ট ছোট্ট বাঁদর। তারা অত্যন্ত আস্তে আস্তে হাঁটাচলা করে এবং গাছে চড়ে বলেই ওদের নাম স্লো-লরিস। এই তাড়াহুড়োর পৃথিবীতে ওদের জায়গা নেই বলেই তো ওরা প্রায় বিলুপ্ত হতে চলেছে। স্লেন্ডার-লরিসও আছে। দুবলা-পাতলা স্লো-লরিস পাওয়া যায় উত্তর-পূর্ব ভারতবর্ষের জঙ্গলে আর স্লেন্ডার-লরিস পাওয়া যায় নীলগিরি হিল্‌স এবং তার পাদদেশে।

—ফিরে একবার যাব চিড়িয়াখানাতে স্লো-লরিস দেখতে।

আমি বললাম।

প্রদীপকাকু বললেন, পোপোটলাল সঙ্গে থাকলে আরও বিস্তারিত বলতে পারত।

আমি বললাম, নাগজিরার রাস্তাগুলোর নাম বলুন প্রদীপকাকু। ভটকাই-এর প্রজাপতি সব গোলমাল করে দিল।

রাস্তার নাম জানার আগে থাকার জায়গাগুলোর নাম জেনে নাও। নিলয় আর লগ-হাট রেস্ট-হাউস-এর কথা তো বলেইছি। আরও আছে, মধুকুঞ্জ রেস্ট হাউসে, চারজন থাকতে পারে, লতাকুঞ্জ গেস্ট হাউসে ছ'জন থাকতে পারে। হলিডে হোম রেস্ট হাউসে আটটা কটেজ আছে, নাম হেমন্ত, শিশির, বসন্ত এই সব। ষোলোজন থাকতে পারে। ইউথ হস্টেল, বত্রিশ জন থাকতে পারে। এছাড়াও তাঁবু আছে, যুবতী রেস্ট হাউস আছে— শুধুই মেয়েদের জন্যে।

—নিলয় এবং এইসব বাংলোর রিজার্ভেশন কোত্থেকে হয়?

ডেপুটি কনজার্ভেটর অফ ফরেস্টস (ওয়াইল্ড লাইফ), ভাণ্ডারা, গোন্দিয়া, মুচকুল রোড, অশ্বিনী নগর, আশীর্বাদ ভবন, গণ্ডিয়া, মহারাষ্ট্র-৪৪১৬০১, তোমাদের পরিচিতি বা বন্ধুবান্ধবেরা কেউ এলে এর সঙ্গে যোগাযোগ করতে বোলো।

—এখন যিনি আছেন ডেপুটি বনসার্ভেটর, তাঁর নাম কী?

—এখন যিনি আছেন তাঁর নাম ইয়াটবোনে, মেঘালয়ের মানুষ। খুব কাজের মানুষ আর কাজকে ভালোও বাসেন, তোমাদের কলকাতার চিড়িয়াখানার সুশান্ত ভট্টাচার্যর মতো। ইয়াটবোনের সঙ্গে সঞ্জীব আর সুদীপ্তর খুব ভাব। ওরা বারবার আসে বলেই। ভারী নলেজেবল ভদ্রলোক। তবে ঋজুদার সঙ্গে তো এঁদের বস অ্যাডিশনাল প্রিন্সিপাল চিফ কনজার্ভেটর বিশ্বজিৎ মজুমদারের ভালোই আলাপ আছে। মহারাষ্ট্র ক্যাডারের ফরেস্ট সার্ভিসের অফিসার। পুরো বনবিভাগে খুব সম্মান ওঁর।

ভটকাই বলল, ঋজুদা একজন মানুষ বটে। কার সঙ্গে যে আলাপ নেই আর কে যে ওঁকে খাতির না করে তা তো আমরাই জানি না।

—তা ঠিক।

প্রদীপকাকু বললেন।

ভটকাই আবার বলল, রাস্তার নামগুলো? অবশ্য এ সব আমার চেয়ে রুদ্ররই বেশি দরকার—ফিরে গিয়ে ঋজুদা কাহিনী তো আমি লিখব না। রুদ্রই লিখবে।

—তোকে লিখতে বারণ করেছে কে? এবারে ফিরে গিয়ে তুই কলম ধর না।

—তুই আমার বন্ধু বলে কথা। তোর সর্বনাশ কি আমি করতে পারি? তবে লিখতে পারি না তা নয়।

—লিখলে কী নাম দিবি?

"চিঞ্চিকেডে'জ টেল অফ নাগাজিরা"। আমি লিখলে ইংরেজিতেই লিখব। ইংরেজিতে না লিখলে জাতে ওঠা যায় না। তোরা সারা জীবন বাংলায় লিখে নাম-যশ-অর্থ যা না পেলি আমি একটা ইংরেজি বই লিখে তোদের টেক্কা দেব। আজকালকার ওয়েল-অফফ বাঙালিরা তো বাংলা পড়ে না, ইংরেজিই পড়ে।

www.boiRboi.blogspot.com

প্রদীপকাকু বললেন, কথাটা মিথ্যা বলোনি। এক গভীর হীনম্মন্যতা আর শুধুমাত্র টাকা রোজগারের সংস্কৃতিই বাঙালিদের সর্বনাশ করে দিল। এই সুদূর নাগপুরে বসে বাংলা সাহিত্য, বাংলা গান সম্বন্ধে আমাদের যা আগ্রহ, যা ভালোবাসা, তা তোমাদের দক্ষিণ কলকাতার বাঙালিদের আছে?

আমরা দুজনেই একসঙ্গে বললাম, সত্যিই নেই। এটা আমাদের পক্ষে গভীর লজ্জার।

প্রদীপকাকু বললেন, চোরখামারা রোড ছাড়াও আছে বোদালকাসা রোড—এখান থেকে একটা পথ বেরিয়ে গেছে নাগজিরার সবচেয়ে উঁচু ওয়াচ-টাওয়ার-এ। অন্যদিকে আর একটা পথ বেরিয়ে গেছে গাউর গাট্টিতে। সেটাও অনেক উঁচুতে। বাঘেদের ডেরা। টাইগার ট্রেইল-এর কথা তো আগেই বলেছি। চোরখামারা নামে একটা গ্রামও আছে। এবং একটা ফরেস্ট গেটও। যাঁরা গণ্ডিয়া আর রায়পুরের দিকে থেকে নাগজিরাতে ঢোকেন তাঁরা এই চোরখামারা গেট দিয়েই ঢোকেন। আর আমরা নাগপুর থেকে এসে ঢুকেছি সাকোলিতে ন্যাশানাল হাইওয়ে ছেড়ে পিটেঝারি গেট হয়ে। এছাড়াও আছে হাত্তিগোদরা—খুব খাড়া পাহাড়ি এলাকার মধ্যে দিয়ে গেছে সে পথ—ভাল্লুক আর লেপার্ডের আড্ডা সেখানে। কাঠেথুবা উপত্যকা আছে—Typical fault basin—এখানে একটা স্বাভাবিক নুনি আছে যেখানে UNGULATES-রা নিয়মিত আসে। এখানে বড় বড় পাহাড়ি অজগর আর স্যান্ড বোয়া সাপও আছে।

—UNGULATES' শব্দর মানে কী?

আমি জিগগেস করলাম প্রদীপকাকুকে।

প্রদীপকাকু বললেন, জানো না? ক্ষুরওয়ালা জানোয়ারদের বলে UNGULATES, যেমন নানা জাতের হরিণ, শুয়োর, নীলগাই, গাউর

www.boiRboi.blogspot.com

ইত্যাদি।

—নীলগাই তো হরিণ নয়। অ্যান্টেলোপ।

ভটকাই বলল।

—ঠিক বলেছ। তবে নীলগাই নাগজিরার মূল বনে কমই দেখা যায়। এই অভয়ারণ্যের প্রান্তিক অঞ্চলের ঝোপঝাড় ভরা এলাকাতেই এরা বেশি থাকে, ফাঁকায় ফাঁকায়। নীলগাই গভীর জঙ্গলের জানোয়ারও নয়।

এ পর্যন্ত বলে, গাইডের দিকে চেয়ে কী বললেন প্রদীপকাকু। সে হাসল। তার নাম মাধব উইকে।

—কী বললেন ওকে?

চির-অনুসন্ধিৎসু ভটকাই জিগগেস করল।

—ওকে বললাম যে, গাইডের সব কাজ তো আমিই করে দিলাম। ওর প্রাপ্য টাকাটা যেন ও আমাকেই দিয়ে দেয়।

—আর কোনও রাস্তা নেই?

আছে। চিতল রোড। ট্যুরিস্ট কমপ্লেক্স-এর চারদিকে যে পথটি ঘিরে রয়েছে—যেখানে চিতল আর সবরকমের UNGULATES-এর ভিড়, তারই নাম চিতল রোড। তবে গাউরেরা কম আসে। তারা গভীর বনের জানোয়ার।

—এখানে অন্ধারবন বলে কোনও জায়গা আছে কি?

আমি বললাম।

—আছে বইকি। নিবিড় জঙ্গল সেখানে। বাঘ ও বাইসনের রাজত্ব। পথের দু'পাশে এত উইঢিপি দেখা যায় যে বলার নয়। উইঢিপি অবশ্য নাগজিরার সব জায়গাতেই আছে। ভালুকেরা উই খায় তাই বোধহয় এত উইয়ের ঢিপির ছড়াছড়ি এখানে। অন্ধারবনে বছর তিরিশেক আগে দিনমানেও অন্ধকার ছিল। বাঁশবনও আছে

এখানে অনেক। প্রজাপতির জন্যেও অন্ধারবন বিখ্যাত।

মাধব উইকে বলল, মেমসাহেব তো অন্ধারবনের দিকেই গেছেন আজ সকালে পোপোটলাল সাহেবের সঙ্গে। পথ যেখানে জলের কাছে শেষ হয়েছে সেখানে গাড়ি রেখে পায়ে হেঁটে প্রজাপতি ধরার বড় ছাঁকনির মতো জিনিস নিয়ে প্রজাপতি খুঁজে বেড়াবেন।

—এখানে না পায়ে হাঁটা বারণ।

ভটকাই বলল।

প্রদীপকাকু বললেন, ওঁরা প্রিন্সিপাল চিফ কনজারভেটর সুব্রহ্মনিয়ম সাহেবের স্পেশ্যাল পারমিশান নিয়ে এসেছেন। প্রজাপতি ধরাও তো বারণ। এঁরা বিদেশের পৃথিবীখ্যাত লেপিডপটারিস্টস, এঁদের অনুমতি দেওয়া হয়েছে।

আমরা পূর্ব আফ্রিকার ওলুডভাই গর্জ আর রিফ্ট ভ্যালিতে গেছিলাম সেরেঙ্গেটি তৃণভূমিতে যাবার আগে। ওসব জায়গা তো জার্মান লেপিডপটারিস্ট ডঃ লিকি প্রজাপতি ধরতে গিয়েই আবিষ্কার করেছিলেন।

ভটকাই বলল, প্রদীপকাকুকে ইমপ্রেস করার জন্য।

গাড়ির কাচ সব নামানো।

—ঋজুদা বলে, জঙ্গলের ভিতরে ঢোকার পরে শীতগ্রীষ্মবর্ষা কখনও এয়ারকন্ডিশন্ড গাড়িতে ঘোরার কোনও মানে হয় না। মেশিন বন্ধ করে কাচ নামিয়ে চললে তবেই জঙ্গলের শব্দ গন্ধ রোদ বৃষ্টি ধুলো উপভোগ করা যায়। তাই যদি না করা গেল তবে জঙ্গলে গিয়ে লাভ কী। অত মাখমবাবু হলে তার কলকাতাতেই থাকা উচিত। জঙ্গলে আসা উচিত নয়।

ভটকাই বলল।

—ঋজুদা ঠিকই বলেন।

www.boiRboi.blogspot.com

প্রদীপকাকু বললেন।

ভটকাই বলল, এই জঙ্গলে নাকি বিছে, মাকড়সা, সাপ আছে নানারকম?

—সে তো সব জঙ্গলেই থাকে। তোমাদের বললাম যে কাঠেথুবা উপত্যকার কথা। সেখানে SAND BOA আর ROCK PYTHON আছে।

—আর ট্যারান্টুলা? ট্যারান্টুলার কামড়ে নাকি মারা গেছে এখানে ট্যুরিস্ট?

—কবে?

—কিছুদিন আগে।

—আমি তো জানি না, বলেই গাইড মাধব উইকেকে জিগগেস করলেন।

মাধব বলল, আমি তো দশ বছরের উপরে নিয়মিত ট্যুরিস্টদের নিয়ে আসছি। আমি তো শুনিনি তেমন।

—তোমাদের কে বলেছে?

—নভেগাঁও বাংলোর চৌকিদার চিঞ্চিকেডে।

প্রদীপকাকু মাধব উইকেকে বললেন চিঞ্চিকেডের কথা।

মাধব হেসে উঠল ওর নাম শুনে। বলল, ও ডিউটি করত বটে 'নিলয়'-এ। সবসময়ে গাঁজা খেয়ে থাকত। সাহেবদের আধখালি বোতল থেকেও মেরে দিত। এখানে তো মদ খাওয়া আমিষ খাওয়া সব বারণ। আর সে নিজে ফরেস্ট গার্ড হয়ে ওসব করত। একবার পি সি সি এফ-এর এক গেস্ট-এর বোতল থেকে চুরি করে মদ খাওয়ার জন্য ওর চাকরিই চলে যেত। বড়সাহেব দয়ালু বলে ওকে নভেগাঁওতে বদলি করে দিয়েছিলেন শুধু—চাকরি আর খাননি।

—অন্ধারবনে নাকি অনেক বিপদ আছে। ভূত-প্রেতও।

ভটকাই বলল।

—তোমরা বিশ্বাস করলে সে কথা?

প্রদীপকাকু বললেন।

ভটকাই বলল, অন্ধকার রাত, অচেনা পরিবেশ, তার ওপরে অচেনা চিঞ্চিকেডে যখন ওসব বলল, বিশ্বাস না করলেও গা-টা একটু ছম ছম করে উঠেছিল বটে।

প্রদীপকাকু হাসলেন। বললেন, সারা পৃথিবীভ্রমী ঋজুদার সাগরেদদেরই যদি এই অবস্থা হয় তাহলে সাধারণ ট্যুরিস্টরা কী করবে?

ভটকাই বলল, কালকে শেষ রাতে আমাকে কে যেন ডাকছিল।

—কী বলে ডাকছিল?

—আমার নাম ধরে।

—ভালো নাম? না ডাক নাম।

—আমার ভালো নাম আমি নিজেই ভুলে গেছি। থ্যাঙ্কস্ টু মিস্টার রুদ্র রায় এবং ঋজুদা।

...ভটকাই। ভটকাই, ভটকাই করে ফিসফিস করে ডাকছিল।

প্রদীপকাকু বললেন, ব্যাপারটা ইনভেস্টিগেট করে জানাব। কোনও পাখি বা ব্যাঙ-ট্যাঙ হবে। জঙ্গলে কত রকম শব্দ হয়। আর হয় বলেই তো জঙ্গল তোমাদের নেশা। রহস্যও জঙ্গলে কম থাকে না। কিন্তু সে সবকে ভয় করলে চলবে কেন? জিম করবেট-এর 'জাঙ্গল লোর' পড়নি? সেই যে BANSHEE-র কথা আছে না তাতে? বইটা না পরে থাকলে অবশ্যই পড়বে। ভয়ের জন্ম IGNORANCE থেকে। জানা হয়ে গেলে কোনও রহস্যই আর রহস্য থাকে না। তোমার নিশির ডাক ব্যাপারটার মূলে যেতে হবে।

হঠাৎ ভটকাই চেঁচিয়ে উঠল। সিয়াজীরাও রোক্কো, রোক্কো।

www.boiRboi.blogspot.com

গাড়িটা দাঁড়াতেই ডানদিকে তাকিয়ে দেখলাম একটি বিরাট গাউরের দল। প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড গাউর। দু-একটি এত বড় যে গায়ের কালো রঙ পেকে লালচে হয়ে গেছে। বড় ছোট মিলিয়ে প্রায় বারো-চোদ্দোটা ছিল। আর আস্তে আস্তে চলাফেরা করছে। বনের মধ্যে clear felling করে বেশ কিছুটা জায়গার বন কেটে সেখানে তৃণভূমি করা হয়েছে। তৃণভূমির বিভিন্ন প্রান্তে সেগুন, কুসুম, বিজা, হলুদ ইত্যাদি গাছ। অন্যদিকে বাঁশ বন। বাঁশবনে ফুল এসেছে। ভারী সুন্দর হালকা খয়েরি রঙা লম্বাটে গোল গোল সেই ফুল। মাটিতে এবং পথের উপরেও পড়ে আছে কিছু। ভটকাই দরজা খুলে নেমে ফুল কুড়োতে যাচ্ছিল গাইড উইকে ওকে মানা করল।

ভটকাই অপ্রতিভ হয়ে উঠে পড়ে বিড় বিড় করে বলল—বাড়াবাড়ি। গাউরদের তো কাজ নেই যে আমাকে গুঁতোতে আসবে। আফ্রিকাতেও ওখানকার গাইড ভয় দেখিয়ে গাড়ি থেকে নামতে দিত না, কিন্তু আমি কি শুনেছিলাম? সিংহ আছে, মারাত্মক সাপ গাব্বুন ভাইপার আছে, আরও কত কী জানোয়ারের ভয় দেখাত, সেৎসী মাছির—তা আমি কি শুনেছিলাম?

—শুনিসনি ঠিকই কিন্তু সেৎসী মাছির কামড়ে তো কুপোকাত হয়ে গেছিলি, মনে নেই কি?

—তা অবশ্য হয়েছিলাম। সেরেঙ্গেটিতে তো গাড়ির কাচ মুহূর্তের জন্যেও নামাতে দেয় না ওরা। জুন-জুলাই তো শীতকাল পূর্ব আফ্রিকাতে—গরম লাগত না বটে। তবে সেৎসী মাছির কামড় সত্যিই বড় যন্ত্রণাদায়ক। কথায় বলে না সেৎসী মাছিদের নটা জীবন। মরেও মরে না তারা। ধড় থেকে মুণ্ডু আলাদা করে দিলেও মরতে চায় না।

—সেৎসী মাছি কামড়ালে তো মানুষ মরে যায় জানি, ইয়ালো ফিভার হয়ে ঘুমোতে ঘুমোতে মরে।

—মরেই তো। কিন্তু আমরা সকলে খিদিরপুর থেকে ইয়ালো-ফিভারের প্রতিষেধক ইনজেকশন নিয়ে গেছিলাম।

Sleeping sickness তো জানতাম, ইয়ালো-ফিভারটা কী জিনিস?

ওই একই হল। কৃষ্ণর শতনাম, আর ওদের ওই দুটি নাম। সেরেঙ্গেটির যে সব জায়গা আর্দ্র বা জল আছে সেখানে যে সব অ্যাকাসিয়া গাছ হয় তাদের কাণ্ডের রঙ হয় হলুদ। তাদের বলে ইয়ালো ফিভার অ্যাকাসিয়া। সেই অ্যাকাসিয়াগুলো অবশ্য উষর অঞ্চলের অ্যাকাসিয়ার মতো প্রকাণ্ড মহীরূহ হয় না। তবে Sleeping Sickness আর ইয়ালো ফিভার এক রোগ নয়, তফাৎ আছে। যদিও ওই দু'রোগেই মানুষ মারা যায়।

প্রদীপবাবু বললেন, এখানে সেৎসী মাছি নেই কিন্তু ভিমরুল আছে। বোদালাসা রোড-এর পাশের অইন গাছে পেল্লায় পেল্লায় মৌচাক আছে। তার কিছু পরিত্যক্ত আর কিছুতে ভিমরুল আছে। দেখি, কাল নিয়ে যাব তোমাদের। তবে তিতিরকে বলবে কোনওরকম পারফিউম যেন না মেখে যায়।

—কেন পারফিউম মাখলে কী হবে?

—কী হবে? তার ওপরে হাজার হাজার প্যারাট্রুপারের মতো ভিমরুল উড়ে এসে পড়ে তাকে একেবারে ধরাশায়ী করে দেবে। দু-তিনটে কেস ফ্যাটালও হয়েছিল। একজনকে গন্ডিয়ার হাসপাতালে এবং অন্যজনকে নাগপুরে নিয়ে গিয়েও বাঁচানো যায়নি।

আমি বললাম, ভোপালের কাছের ভীমবৈঠকাতেও আছে প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড মৌচাক। আমার এক মামা চারদিন হাসপাতালে থেকে প্রাণে বাঁচেন।

—ঋজুদাকেও বলতে হবে আতর না মাখতে।

www.boiRboi.blogspot.com

ভটকাই বলল।

—ঋজুদা আতর মাখেন বুঝি?

—সে কি গন্ধ পাননি এতদিনেও?

ভটকাই বলল।

—সকলেই কি তোর মতো গন্ধবিশারদ?

—ঋজুদা গ্রীষ্মে মাখে খস্‌স আর ফিরদৌস, বর্ষাতে বেলি আর চামেলি, শীতে গুলাব আর অম্বর।

—ঋজুদা রহিস মানুষ, ব্যাপারই আলাদা।

প্রদীপকাকু বললেন।

—তা বটে কিন্তু যেদিন বোদালকাসা রোড-এ নিয়ে যাবেন সেদিন আগে থেকে বলে দেবেন। সারা পৃথিবীতে এত প্রাণী আর খারাপ মানুষের হাত থেকে প্রাণে বেঁচে এসে শেষে ভিমরুলের কামড়ে প্রাণ যাওয়াটা ভারী লজ্জাকর হবে।

সারা পথেই আমরা অগুন্তি চিতল হরিণ, চৌশিঙ্গা, কোটরা এবং সম্বর দেখেছি—যখন কথা বলতে বলতে আসছিলাম। তবে থামা হল বাইসনের দল দেখার পরই। জংলি কুকুর, চিতা, বাঘ, ভাল্লুক, বড় শুয়োর এসব দেখলে থেমে সময় নিয়ে দেখব। নইলে UNGULATES এত বনে এত দেখেছি যে আমাদের আর উৎসাহ নেই। তবে একেক বনের বন্যপ্রাণীর চেহারা একেক রকম। চিতল হরিণ সুন্দরবনে একরকম, বিহার কি ঝাড়খণ্ডে একরকম, এখানে আরেকরকম আর রাজস্থানের আলোয়ারের সারিসকাতে আবার অন্যরকম। বাঘের বেলাও তাই। সুন্দরবনের বাঘ, আর আসামের বাঘ আর বিহার, মধ্যপ্রদেশ বা রাজস্থানের বাঘ সকলেরই আলাদা আলাদা চেহারা—মানুষদের চেহারারই মতন।

গাউরের দল আস্তে আস্তে বাঁশবনে ঢুকে গেল। তিন-চারটে

ছোট বাচ্চা ছিল। নধর। বাঘ, বাইসনের বাচ্চা খেতে খুব ভালোবাসে। তাই পুরো দল বাচ্চাদের চোখে চোখে রাখে।

ওরা চলে গেলে সিয়াজীরাও গাড়ি চালু করল।

ভটকাই বলল, বাঁশগাছে ফুল আসা মানেই তো বাঁশগাছের মৃত্যু।

প্রদীপকাকু বললেন, হ্যাঁ। প্রকৃতির আশ্চর্য লীলাখেলা। ফুল ফল অন্য সব গাছের বেলাই সার্থকতার লক্ষণ, বাঁশের বেলাতে ঠিক উল্টোটা। রিক্ততার লক্ষণ।

তারপরই বললেন এই বাঁশদের নাম হচ্ছে SURYA Bamboos.

—বাঁশের বটানিক্যাল নাম আমি জানি।

ভটকাই বলল।

—কী?

প্রদীপকাকু জিগগেস করলেন।

—DENDROCALAMUS STRICTUS ।

—বাঃ।

আমি বললাম, তোর কত্ত জ্ঞান।

তারপর প্রদীপকাকুকে জিগগেস করলাম, এই গোখুরি পাহাড়ের ভাঁজে ভাঁজে নিশ্চয়ই বসতি ছিলই বা আছে।

—আগে অনেক ছিলই। সেই সব বসতি এই টাইগার প্রজেক্টের জন্যে যথাসাধ্য সরিয়ে নেওয়া হলেও এখনও আছে কিছু কিছু। এই সব গ্রামে গোন্দ অধিবাসীদের একটি প্রজাতি রাজগোন্দদের বাস। গোখুরি পাহাড় শ্রেণির চুড়োতে রাজগোন্দদের দেবতা কাপালাদেও-এর মন্দির আছে। কাপালাদেও মহাদেবেরই এক নাম। খুবই দুর্গম এবং বিপজ্জনক সেই পথ। তবে রাজগোন্দরা পুজো দেয়

এখনও। তোমরা যদি কষ্ট করতে পারো এবং যেতে চাও তাহলে রেঞ্জ ফরেস্ট অফিসার মিশিরিকোটকর সাহেবের সঙ্গে গোন্দিয়াতে কথা বলতে হয় মোবাইল-এ। তোমাদের যেতে দিলে অন্যরাও যেতে চাইতে পারে। পরে আর তাহলে তো নিত্য পুণ্যার্থীদের ভিড় লেগে যাবে সেখানে। জানোয়ারেরা খুবই বিরক্ত হবে। তাই গেলে খুব গোপনে যেতে হবে। তারপর বললেন, আগে দেখো ঋজুদাই পারমিশান দেন কিনা। তারপরে না মিশিরিকোটকর সাহেবের পারমিশানের কথা। সঞ্জীব আর সুদীপ্তর কাছে শুনেছি, ভদ্রলোক নাকি খুবই কাজের লোক এবং নাগজিরাই তাঁর প্রাণ। বনের মধ্যে অনেকেই মোড়ে মোড়ে ওইসব ঘর বানিয়ে আগুন আর চোরাদের পাহারা দেবার বন্দোবস্ত উনিই নাকি করেছেন। চোরারা দু'রকমের হয়। এক কাঠ-চোরা আর দুই প্রাণী-চোরা। প্রাণীর মধ্যে বাঘ ও চিতার ওপরেই লোভ বেশি—চড়া দামে চর্বি ও চামড়া বিক্রি হয় তো! হরিণ-টরিণও মারে—মাংস খাবার জন্যে, চামড়াও বিক্রি হয়। এইসব পাহারাদারদের রাখার বন্দোবস্ত করার পর থেকে কাঠ-চুরি ও চোরা-শিকার অনেক কমে গেছে। সবসময়ই পাহারাদার থাকে। তিনজন করে ফরেস্ট গার্ড আটঘণ্টার শিফ্‌ট-এ এক এক জায়গাতে পাহারা দেয়।

—সবদিকেই তো ফরেস্ট গেট আছে। তাহলে চোরারা ঢোকে কোথা দিয়ে?

—যারা আসে তারা তো গাড়িতে আসে না। হেঁটেই ঢোকে। বনের সবজায়গাতে তো আর দেওয়াল তুলে দেওয়া যায় না। দুই দেশ-এর সীমান্তেও যেমন যায় না। তাছাড়া বনজঙ্গল তাদের নখদর্পণে। বনের মধ্যের গ্রামের মানুষও থাকে অনেক সময়েই তাদের সঙ্গে। গরিব আদিবাসীরা টাকা ও venison-এর লোভে

www.boiRboi.blogspot.com

ভোলে।

—Venison শব্দর মানে কি? ভটকাই শুধোল।

—Venison মানে হল হরিণের মাংস।

—তাই?

—হ্যাঁ।

হঠাৎই প্রদীপকাকু বললেন, গাড়ি রোক্কো।

এখন আমরা চোরখামারা রোড ছেড়ে কোথায় কোন রাস্তা দিয়ে চলেছি তা আমাদের গাইড মাধব উইকেই বলতে পারবে। আমাদের সামনে সামনে যাওয়া ঋজুদাদের কালিস গাড়িটাও দাঁড়িয়ে পড়েছে দেখলাম। সবিস্ময়ে চেয়ে দেখি, একদল ঢোল বা জংলি কুকুরের একটা বিরাট শিঙ্গাল শম্বরকে তাড়া করে নিয়ে আসছে। শম্বরটার পিঠে ও পিছনে এবং পেটের নিচেও চার-পাঁচটা কুকুর কামড়ে আছে তাকে। সবসুদ্ধু পনেরো-কুড়িটা কুকুর হবে। শম্বরটা এসে পথের উপরেই পড়ে গেল। আর কুকুরগুলো, শকুনের দল যেমন মৃত পশুর গায়ে পড়ে তেমনই হামলে পড়ে কামড়া-কামড়ি করে মাংস খেতে লাগল। শম্বরটা শেষবারের মতো একবার কেঁপে উঠে থেমে গেল।

আমাদের গাড়ির বেশ সামনে ছিল ঋজুদাদের গাড়ি। ওরা আস্তে আস্তে ব্যাক করে অকুস্থলের দিকে আসতে লাগল। পথের সামনে একটা গাড়ির পিছনে আর একটা গাড়ি অথচ কুকুরগুলোর কোনও ভ্রূক্ষেপই নেই। আমাদের ডোন্ট-কেয়ার করে মুখে কুঁই-কুঁই শব্দ করতে করতে পাঁচ-সাত মিনিটের মধ্যে পুরো শম্বরটাকে খেয়ে কঙ্কালটা আর বিরাট শিংটাকে পথের উপরেই আমাদের হতভম্ব করে ফেলে রেখে তারা যেমন লাফাতে লাফাতে এসেছিল তেমনই লাফাতে লাফাতে চলে গেল উধাও হয়ে। আমরা সকলেই নির্বাক হয়ে সেই দৃশ্য দেখলাম। প্রকৃতির মধ্যে প্রকৃতির অনুমতিতে এরকম

একটা বীভৎস হত্যালীলা ঘটে গেল। ঘড়িতে চেয়ে দেখলাম তখন সকাল ন'টা বাজে।

আমরা সকলেই গাড়ি থেকে নেমে জল খেলাম এবং ওই নিয়েই আলোচনা করলাম। সেবারে অন্ধারী তড়োবাতে খুব সকালে একটা মস্ত বড় দাঁতাল শুয়োরকে ঢোলেরা আক্রমণ করেছিল আমাদের সামনেই পথের ওপরে কিন্তু সেই বীরপুরুষ শুয়োর একাই তার বড় বড় দাঁত দিয়ে দু-তিনটি কুকুরকে আহত করে ঘোড়ার মতো দুড়দাড় করে জঙ্গল ভেঙে পালিয়ে গেছিল। বনো কুকুরের আক্রমণ থেকে প্রাণ নিয়ে ফিরতে বেশি জানোয়ারকে দেখা যায় না। বাঘ-এর মতো মহাবল জানোয়ারও বুনো কুকুরদের এড়িয়ে চলে। কারণ, যুদ্ধের কোনও নিয়মকানুনের তো ওরা ধার ধারে না। যাকে বলে, হিটিং বিলো দ্য বেল্ট, ওরা তাই করে। কাপুরুষের মতো দলবদ্ধভাবে সামনের পিছনে দু'পাশে এসে লজ্জাহীনের মতো একসঙ্গে আক্রমণ করে তাদের শিকারকে। গায়ে মাথায় লাফিয়ে পড়ে মাংস খায় ছিঁড়ে ছিঁড়ে, জ্যান্ত প্রাণীর গা থেকে।

ঋজুদা বলল, একদিনের মতো অনেক কিছু দেখা হল। এবারে চলো অন্য রাস্তা ধরে ফিরি।

অন্য রাস্তা তো আমরা অনেকক্ষণ আগেই ধরেছি।

সঞ্জীবকাকু বললেন।

—ও তাই! তা বাংলোতে ফিরতে কতক্ষণ লাগবে?

—ঘণ্টা দেড়েক।

—তাহলে ফেরা যাক। খিদেও পেয়েছে। ব্রেকফাস্ট করে ভালো করে চান করতে হবে। ধুলোতে গা-মাথা লাল হয়ে গেছে। বিকেলে চারটে নাগাদ আবার বেরনো যাবে। কী বলো সোনানে?

ভটকাই বলল, সোনানে কী?

www.boiRboi.blogspot.com

প্রদীপকাকু হেসে বললেন, ঋজুদার গাড়ির গাইডের নাম জয়রাম সোনানে। এরা দুজনেই রাজগোন্দ।

সোনানে ও উইকে নিজেদের মধ্যে গোন্দিভাষাতে কী সব কথা বলল। আমরা কেউই বুঝলাম না। গাড়ি ঘোরানো হল না। ওই শম্বরের কঙ্কালের পাশ দিয়েই সামনে এগিয়ে চললাম আমরা। সামনে পথটা ঢালু হয়ে নেমে গেছে। দু'পাশের গাছে গাছে নানা ফুল। গ্রীষ্মবনের গন্ধ উড়ছে। উড়ছে মৌমাছি, প্রজাপতি, পাখি। গোখুরি পাহাড়ের ছত্রচ্ছায়াতে বলেই উঁচুনিচু ঢেউ-খেলানো পথ। লাল মাটির। নেশা ধরে যায় এই পথে চলতে।

তিন-চার কিমি গিয়ে অন্য একটা পথে পড়ে আমরা চোরাখামারা রোড-এর দিকে চললাম।

১০

নিলয়ে ফিরতে দেড়ঘণ্টার বেশিই লাগল। বেশ দিয়েছে নামটা, 'নিলয়'।

পথে আর একটি বাইসনের দল দেখলাম। চৌশিঙ্গা হরিণ। যার ইংরেজি নাম FOUR HORNED ANTELOPE। একটি মাউস ডিয়ারও দেখলাম। ঋজুদার কাছে শুনেছি, ওড়িশার মহানদীর উপত্যকার জঙ্গলে একসময়ে বহু মাউস ডিয়ার ছিল। এখন যে বনের নাম হয়ে গেছে 'সাতকোশিয়া গন্ড স্যাংচুয়ারি'। হরিণগুলো ছোট ছোট হয়। গায়ের রং চিতল হরিণের মতো তার ওপরে সাদা সাদা ছিট থাকে। মুখগুলো অনেকটা ইঁদুরের হয় বলেই কি এদের নাম মাউস ডিয়ার? কে জানে? ওই অঞ্চলে তো আমিও গেছি ঋজুদার সঙ্গে—পুরুণাকোটে মানুষখেকো বাঘও মেরেছি, যে বাঘ ঋজুদাকে আহতও করেছিল। কিন্তু সেবারে বেড়াতে গিয়ে মানুষখেকো বাঘের মোকাবিলার ঝামেলাতে জড়িয়ে পড়েই তড়িঘড়ি ফিরে আসতে

www.boiRboi.blogspot.com

হয়েছিল আহত ঋজুদাকে সঙ্গে নিয়ে—স্যাংচুয়ারি আর তেমন করে দেখা হয়নি।

কোটরা হরিণও দেখলাম আর এক জোড়া, পাথরের ওপরে ঝরে-পড়া শিমূলের ফুল খাচ্ছিল। ওরা শিমূলের ফুল খেতে খুব ভালোবাসে।

ঋজুদাদের গাড়ি থামিয়ে তিতির বাঁশফুল সংগ্রহ করল কলকাতায় নিয়ে যাবে বলে। চুলে গুঁজে নেমন্তন্নবাড়ি যাবে বোধহয়। অন্যদের দিতেও পারে।

কোটরা হরিণগুলোর গায়ের রং লাল। অত ছোট ছোট হরিণ, দিশি কুকুরের চেয়ে একটু বড়, যখন ডাকে তখন সারা বন কেঁপে যায়। অ্যালসেশিয়ান কুকুরদের ডাকও ওরকম নয়। পাহাড়-বনে ওদের ডাকের প্রতিধ্বনি ওঠে। বাঘ দেখলেই বা বাঘের অস্তিত্ব টের পেলেই ওরা অমন করে ডেকে সমস্ত বন্যপ্রাণীদের সাবধান করে দেয়। ওদের নাম তাই BARKING DEER। বাঁদর এবং হনুমানেরাও দেয়। আশ্চর্য এই নাগজিরার জঙ্গলে হনুমান বা বাঁদর দেখলাম না এখন পর্যন্ত একটিও। দেখলে অবশ্যই দলেই দেখতাম। ওরা তো একা থাকে না। নেই, না আমাদের চোখেই পড়ল না তা সঞ্জীবকাকুকে জিগগেস করতে হবে।

বেশ গরম লাগছে এখন, তবুও অসহ্য নয়। তাই গাড়ির এয়াকন্ডিশনার চালানো হল না। ঋজুদার বারণ। প্রদীপকাকু বললেন গরমে কষ্ট হলেও বনবিভাগের মতে জানোয়ার যদি দেখতে চাও তাহলে নাগজিরাতে এপ্রিল-মে'তেই আসা ভালো। অনেক গাছেরই পাতা তখন ঝরে যায়। আন্ডারগ্রোথও থাকে না। তবে গরম এখানে ভালোই পড়ে। ৪৪ থেকে ৪৬ ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড গরমে এসি, এমনকি পাখা ছাড়াও থাকাটা এসি-তে অভ্যস্ত শহুরে বাবুদের পক্ষে সত্যিই

কষ্টের। কিন্তু কষ্ট না করলে কি কেষ্ট মেলে!

'নিলয়'-তে যখন পৌঁছলাম তখন সামনের জলাশয়ে কোনও বন্যপ্রাণীই ছিল না। বিকেলে রোদ পড়লেই তারা আসতে শুরু করবে।

ঋজুদা গাড়ি থেকে নেমে বলল, সঞ্জীব—গাড়ি নিয়ে ক্যান্টিনে যাও। দ্যাখো ব্রেকফাস্টে কী পাওয়া যাবে আর চা বা কফির বন্দোবস্ত করো। ব্রেকফাস্ট করে চানে যাব।

আমরা গাড়ি থেকে নেমে 'নিলয়'-এর ভিতরে ঢুকতেই একটা গোঙানির আওয়াজ শুনতে পেলাম। আমরা একতলার বসার ঘরের সোফায় বসেও দোতলা থেকে আসা সেই আওয়াজ শুনতে পাচ্ছিলাম। চৌকিদার বলল, মেমসাহেবের খুব জ্বর আর খুব যন্ত্রণা। আমি তো ওঁর শুশ্রূষা করতে পারি না। যুবতী গেস্ট হাউসে বা অন্য কোথাওই এখন কোনও মহিলাই নেই। আমি একটা ক্রোসিন দিয়ে দিয়েছি, আমার কাছে ছিল, কিন্তু তাতে কিছুই কাজ হয়নি।

—অন্য মেমসাহেব ভোরে বেরিয়ে যাওয়ার আগেই কি জ্বর এসেছিল!

—হ্যাঁ। তবে উনি কী ওষুধ দিয়েছেন বা আদৌ দিয়েছেন কি না তা আমি জানি না।

ঋজুদা বলল, তিতির গিয়ে দ্যাখ তো কী ব্যাপার? খুবই কষ্ট হচ্ছে মনে হচ্ছে নইলে অত জোরে কেউ গোঙায়? পোপোটলাল সাহেব আর অন্য মেমসাহেব যদি সন্ধে করে ফেরেন তাহলে তো মুশকিল। এঁকে হাসপাতালে নিয়ে যেতে হলে, তা সে গণ্ডিয়াতেই হোক কী নাগপুরে তাড়াতাড়ি রিমুভ করতে হবে।

—সাকোলি থেকে কোনও ডাক্তার নিয়ে আসব? ছোট জায়গার ডাক্তার ছোটই হবেন, কিন্তু ডাক্তার তো বটেই।

www.boiRboi.blogspot.com

প্রদীপকাকু বললেন।

ঋজুদা বলল, তিতির ফিরুক। ওর কাছে শুনে যা করার করো তোমরা। বিদেশিনী, আমাদের দেশের জঙ্গলে এসে বেঘোরে মারা গেলে তো আমাদেরই বদনাম।

—তা তো ঠিকই।

প্রদীপকাকু বললেন।

মিনিট পনেরো পরে তিতির নেমে এল। ততক্ষণে আমাদের ব্রেকফাস্টও এসে গেছে।

আলুর তরকারি আর হাতে গড়া রুটি। ফল তো আমাদের সঙ্গেই ছিল। আর চা।

ভটকাই-এর মুখটা দেখে মনে হল যেন চিরতার জল খেয়েছে। এযাবৎ আমরা যেখানেই যাচ্ছি ভটকাই উপস্থিত থাকতেই "খাদ্য খাদকের" এমন করুণ অবস্থা কখনও হয়নি যে সেটা ঠিক। কিন্তু কী করা যাবে? "যস্মিন দশে যদাচার।"

তিতির নেমে এসে বলল, ঠাণ্ডা লেগে এ জ্বর হয়নি। কমপ্লিকেটেড কেস। তলপেটে ব্যথা, শরীর অসাড়, বুকেও ব্যথা, মাঝে মাঝে বমি হচ্ছে। বেচারি একা। নিঃশ্বাস নিতে কষ্ট হচ্ছে। শরীরে জ্বালাপোড়া হচ্ছে, ঘাম হচ্ছে, ডানহাতটা ফুলে উঠেছে। মাঝে মাঝে কনভালশনও হচ্ছে।

প্রদীপকাকু স্বগতোক্তি করলেন, কিছুতে কামড়াল কি?

ভটকাই সঙ্গে সঙ্গে বলল, ট্যারান্টুলা।

ঋজুদা বলল, তুই তো সবজান্তা!

তারপর বলল, তুই খেয়ে নিয়ে ওঁর কাছে গিয়ে বোস তিতির। সাহায্যর দরকার হলে ভটকাইকেও নিয়ে যা সঙ্গে। চৌকিদারকে বল যে তার আমাদের কোনও কাজ করতে হবে না, তোর সঙ্গে থাকতে।

প্রদীপকাকু বললেন, কী করব? চলে যাব সাকোলি? ধরে আনব কোনও ডাক্তারকে?

ওরা আসার আগেই যাবে?

ওরা আসতে আসতে যদি রোগিণী টেঁসে যায়!

প্রদীপকাকুর "টেঁসে যাওয়া" শুনে ওই টেনশনের মধ্যেও হাসি পেল আমার।

ঋজুদা বলল, সঞ্জীব, তোমার মোবাইলে মিশিরকোটকার সাহেবকে ইনফর্ম করে রাখো। পরে প্রয়োজন হলে আমি নাগপুরে মজুমদার সাহেবের সঙ্গেও কথা বলব।

আমি তাহলে এগোই।

প্রদীপকাকু বললেন।

—আরেক কাপ চা খেয়ে যাও। তিতিরেরও তো খাওয়া হয়নি এখনও।

আরেক কাপ চা খেয়ে মোটাভাইকে নিয়ে প্রদীপকাকু বেরিয়ে গেলেন সাকোলির দিকে। নাগজিরা সাকোলি থেকে বাইশ কিমি। কিন্তু গেলেই সঙ্গে সঙ্গে যে ডাক্তার তার পসার নষ্ট করে এতদূরে আসবেন তার গ্যারান্টি কি? দণ্ডও ভালোই হবে আমাদের। কিন্তু উপায় তো নেই।

তিতির কোনওরকমে খেয়ে চলে গেল ওপরে। চৌকিদারকে বলল, একটা ঝাঁটা, ন্যাতা আর বালতি নিয়ে ওর সঙ্গে যেতে। মেঝে নাকি বমিতে একাক্কার। চৌকিদারেরও দোষ নেই। তিতির বলল, মেমসাহেব নাইটি পরে আছেন—। যন্ত্রণার মধ্যে কাপড়-চোপড়েরও ঠিক নেই। চৌকিদার পুরুষ মানুষ, সংকোচ তো হতেই পারে।

আমি ঋজুদা ভটকাই আর সঞ্জীবকাকু বসার ঘরে বসে আছি। মাঝে-মাঝেই হাড়-হিম-করা চিৎকার আসছে ওপর থেকে।

www.boiRboi.blogspot.com

সাংঘাতিক কিছু একটা হয়েছে মেমসাহেবের যে তাতে কোনও সন্দেহ নেই। মনে হচ্ছে এখুনি হয়তো টেঁসে যাবেন। অথচ কী আমরা করতে পারি এই জঙ্গলে বসে। আমরা নিরুপায়।

ঋজুদা হঠাৎ বলল ভটকাইকে, হঠাৎ তোর ট্যারান্টুলার কথা মনে হল কেন? কলকাতার কাগজে পড়েছিস, তাই?

—তাও বটে, তাছাড়া চিঞ্চিকেডে....

—সে কে?

আমি বললাম, উইকে তো বলল, যে চিঞ্চিকেডে বাজে কথা বলেছে।

—কে বাজে কথা বলেছে তা জানা যাবে কেমন করে? যা সিমটম্‌স শুনছি তাতে ট্যারান্টুলা হতেও পারে।

নিলয়ের চারদিক পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন—কোথাও একটা ঝোপ পর্যন্ত নেই। ঘন ঘন গাড়ি ঢুকছে, গাড়ি বেরচ্ছে। তোরাও তো একতলাতে ছিলি। ট্যারান্টুলার খেয়েদেয়ে কাজ নেই, সে দোতলাতে উঠে মেমসাহেবকে কামড়াতে যাবে কেন? এ তো আর ভাইরাস নয় যে বাতাসে উড়ে যাবে। মাকড়সা, সে যত বড়ই হোক তাকে তো হাতে-পায়ে হামাগুড়ি দিয়ে পৌঁছতে হবে যেখানে পৌঁছবার।

—তা অবশ্য ঠিক।

—তোমাদের এই নাগজিরা তো প্রজাপতির জন্য বিখ্যাত। মাকড়সার জন্যেও বিখ্যাত না কি? সঞ্জীব?

—কী বলেছেন দাদা। ট্যারান্টুলার নাম তো জীবনে শুনিনি। জিনিসটা কী? কলকাতা থেকে আসা বাংলা খবরের কাগজেই প্রথম পড়লাম। বাংলা কাগজে কত কিছু বেরয়, গণেশ দুধ খায়, জ্যোতিবাবু না খেয়ে থাকেন, ট্যারান্টুলা কামড়ায়। বাংলা কাগজের কথা আমরা ধরি না।

www.boiRboi.blogspot.com

—না চিঞ্চিকেডে আরও অনেক কথা বলছিল তো, সবকথাই উড়িয়ে দেওয়া কি ঠিক?

গম্ভীর মুখে বলল ভটকাই।

—চিঞ্চিকেডেটা কে? ঋজুদা আবার বলল।

—সে নভেগাঁও-এর তে-তলা বাংলোর চৌকিদার। সে নাগজিরাতেও আগে পোস্টেড ছিল। অন্ধারবনের কথা সে-ই বলেছিল বিশেষ করে। আর পোপোটলাল সাহেব আর মেমসাহেব তো আজও সে-ই অন্ধারবনেই গেছেন শুনলাম।

—তোর কথার কোনও মানে বুঝলাম না। তাঁরা তো সেখানে গেছেন আজ ভোরে আর এখানে মেমসাহেবের এই মারাত্মক অসুখ হল কেন?

একটু পরে তিতির নেমে এল। বলল, লেবু, নুন আর চিনির একটু সরবত করে নিয়ে যাই। হিট স্ট্রোক হল না তো? ঠাণ্ডা দেশের মানুষ।

—করে নিয়ে যা। ডাক্তার আনতে সাকোলিতে প্রদীপ গেছে গাড়ি নিয়ে। ডাক্তার কী বলে দ্যাখ। সাপ-টাপ কামড়ায়নি তো?

—সাপে কামড়ালে ব্যথা লাগত না?

—যাই কামড়াক, কামড়ালে পিন ফোটাবার মতো ব্যথা তো লাগবে, না কি? উনি বলছেন কোনও ব্যথা পাননি।

—তা অবশ্য ঠিক।

—আমি ভালো বুঝছি না। তোমার সঙ্গে কোথাও-ই এসে কি শান্তি পাওয়া যাবে ঋজুকাকা? উনি তো বলেছেন ওকে কিছু কামড়ায়নি। মানে, উনি টের পাননি। কিন্তু ডানহাতের তালুতে ছোট ছোট দুটো লাল দাগ দেখলাম আমি। ফুলেওছে তো ডানহাতটাই।

—সবই আমার রাশিচক্রের দোষ। নইলে বারবার এমন হয়

কেন? তোরা বেড়াতে এসে একটু মজা করবি না প্রতিবারই একটা না একটা ঝামেলাতে জড়িয়ে পড়া।

ভটকাই বলল, অসুখ করল তো করল সুন্দরী এলডা উঙ্গার মেমসাহেবেরই করল। দাঁড়কাক দিব্যি ঘুরে বেড়াচ্ছে।

আমরা হাসলাম।

ঋজুদা বলল, এত ফল রয়েছে কিছু ফল নিয়ে যা না ভটকাই। যদি তিতির খাওয়াতে পারে।

ফল নিয়ে ভটকাই ওপরে গিয়ে দরজায় টোকা দেওয়াতে তিতির দরজা খুলল। বিরক্তির সঙ্গে বলল, 'নো ওয়ে'। দেখছ না সরবতটাই খাওয়াতে পারলাম না। তুমি বরং ঋজুদাকে একবার পাঠিয়ে দাও। দেখে যাক।

ভটকাই এসে সে কথা বলতে ঋজুদা গেল ওপরে। মিনিট দশেক পরে ফিরে এল চৌকিদারকে সঙ্গে করে। সে দরজার পাশে টুল-এ বসেছিল তিতিরের অর্ডার মতো কাজ করবে বলে। ঋজুদা চৌকিদারকে জেরা করতে লাগল। বলল, যখন পোপোটলাল সাহেবরা গেলেন তখনও কি মেমসাহেব এরকম যন্ত্রণাতে ভুগছিলেন?

—না সাহেব। তখন তো জ্বর ছিল। আমিই আটটার সময় কফি নিয়ে এলাম ক্যান্টিন থেকে। মেমসাহেব সোফাতে উঠে বসলেন কফি খাওয়ার জন্যে।

—শুধুই কফি? অন্য কিছু খাননি?

—কী খেয়েছেন জানি না তবে অন্য মেমসাহেব একটা সাদা বাক্স দিয়ে গেছিলেন। বলেছিলেন এতে খাবার আছে। নাস্তার সময়ে মেমসাহেবকে দেবে। বাক্সর মুখটা বন্ধ ছিল। বাক্সর মধ্যে সম্ভবত ফলটল ছিল, আর রাতে ক্যান্টিন থেকে বানিয়ে আনা স্যান্ডউইচ।

www.boiRboi.blogspot.com

আমি বাক্সটা মেমসাহেবকে দিয়ে ঘর থেকে চলে এসেছিলাম। নাস্তা খাবার কিছুক্ষণ পরেই মেমসাহেব আমাকে ডাকলেন। বললেন, মনে হচ্ছে জ্বর বেড়েছে আমার। শরীরটা খুব গরম লাগছে। জ্বরের কোনও ওষুধ আছে তোমার কাছে?

আমি বললাম আছে, প্যারাসিটমল। ক্রোসিন।

সঞ্জীবকাকু বললেন, শব্দটা প্যারাসিটামল।

—যাই হোক, মিনারেল ওয়াটারের বোতলটা মেমসাহেবকে এগিয়ে দিলাম ওষুধের সঙ্গে। তারপরে চলে এলাম। তারই কিছুক্ষণ পর থেকে মেমসাহেব যন্ত্রণায় চিৎকার করতে লাগলেন। আমার দেওয়া ওষুধ খেয়ে মেমসাহেবের এমন হল না তো সাহেব?

—না, না।

তারপর ঋজুদা বলল, মেমসাহেব নাস্তা করার পরে বাক্সটা তুমি দেখেছিলে?

সবকিছু কি উনি খেয়েছিলেন? নাকি....

—না, দেখিনি।

বাক্সটা নিয়ে আসতে পার একবার? আচ্ছা ঘরে আরও কটা ওইরকম সাদা কার্ডবোর্ডের বাক্স দেখলাম, উপরে ফুটো ফুটো, ওই বাক্সগুলো কি কাজে লাগছে মেমসাহেবদের?

ওতেই তো প্রজাপতি রাখছেন। বাক্সর ওপরে নাম লেখা আছে। প্রত্যেকদিন জঙ্গলে তো ওইরকম খালি বাক্স নিয়ে যান আর বাক্সে করে প্রজাপতি নিয়ে আসেন। ওপরে ফুটো ফুটো করা আছে—প্রজাপতি যাতে বাতাস পায়, মরে না যায়।

—নাস্তা করার জন্যে যে বাক্স দিয়েছিলেন লম্বা মেমসাহেব তা কি ওই বাক্সই?

—হ্যাঁ। ওই বাক্স করেই তো আজ সকালে খাবার নিয়ে গেলেন

জঙ্গলে। ছোট মেমসাহেবদের নাস্তাও ওই বাক্সতেই ভরে আমাকে দিয়েছিলেন। অনেক বাক্স নিয়ে এসেছিলেন তো সঙ্গে করে।

—তুমি যাও তো। ছোট মেমসাহেবের নাস্তার বাক্সটা নিয়ে এসো তো?

চৌকিদার বাক্সটা আনতে গেলে ঋজুদা বলল, রুদ্র আমার হ্যান্ডব্যাগ থেকে ম্যাগনিফাইং গ্লাসটা নিয়ে আয় তো। কোথায় থাকে জানিস তো?

—হ্যাঁ, হ্যাঁ, জানি।

দোতলাতে উঠে ঋজুদার ঘর থেকে ম্যাগনিফাইং গ্লাসটা নিয়ে গেলাম। ততক্ষণে চৌকিদারও সুন্দরী মেমসাহেবের নাস্তার বাক্সটা নিয়ে নেমে এল। তিতির আমাকে দেখে বলল, ওই বাক্স কী হবে?

—ঋজুদা চেয়েছে।

তিতির অবাক হল।

ঋজুদা বলল, কী আছে দ্যাখ তো বাক্সে রুদ্র। সাবধানে খুলিস।

সাবধানে কেন খুলতে বলল, বুঝলাম না।

আমি বললাম আধখানা ভেজিটেবল স্যান্ডউইচ, অর্ধেক খাওয়া আপেল একটা—। হয়তো অন্য স্যান্ডউইচও ছিল—উনি খেয়ে ফেলেছেন।

এবার ম্যাগনিফাইং গ্লাস দিয়ে ভিতরটা ভালো করে দেখ তো। কোনও রোঁয়া-টোঁয়া দেখতে পাস কি না?

আমি ভাল করে দেখলাম। বললাম না তো! তেমন কিছু তো নেই।

তারপরই ঋজুদা চৌকিদারকে বলল, তোমার কাছে কার্বলিক অ্যাসিড আছে?

আছে সাহেব। বছরের গোড়াতে এক বোতল দিয়েছিল স্টোর

www.boiRboi.blogspot.com

থেকে। বর্ষার সময়ে সাপ-খোপ চলে আসে তখন বাইরে চারধারে ছিটিয়ে দিই।

এখন মেমসাহেবের ঘরে, আমার ঘরে এবং নিচের ঘরগুলোতেও একটু ছিটিয়ে দাও তো বাবা।

বলেই আমাকে বলল, তিতির কি জুতো খুলেছে?

—না তো।

ওকে বল, পা-টা তুলে বসবে।

—কেন?

—আঃ যা বলছি কর না।

আমি ওপরে যেতে যেতে বললাম, ম্যাগনিফাইং গ্লাস দিয়েও তো অস্বাভাবিক কিছু দেখতে পেলাম না।

—তা তো আমি জানি।

—তবে?

—বড় কথা বলিস তুই।

সঞ্জীবকাকু আর ভটকাই আমার চেয়েও বেশি অবাক হয়ে ঋজুদার মুখে দিকে চেয়ে রইল।

ঋজুদার কাছ থেকে কথা বের করা অসম্ভব। যেটুকু নিজে থেকে বলবে সেটুকু নিয়েই সন্তুষ্ট থাকতে হবে। যখন বলার তখন নিজেই বলবে।

বাক্সটাকে আরেকবার ঢাকনা খুলে ভালো করে দেখে নাকের কাছে নিয়ে গন্ধ শুঁকল একবার। তারপর বলল, যা জায়গামতো রেখে আয়।

আমরা সকলে যে যার ঘরে চান করতে গেলাম।

ঋজুদা বলল, সকলেই বাথরুমে ঢোকার আগে ভালো করে দেখেশুনে ঢুকো। আর রাতের বেলা লণ্ঠনের ফিতে বাড়িয়ে ঢুকো।

—কেন ঋজুদা?

সঞ্জীবকাকু কৌতূহল আর চাপতে না পেরে প্রশ্ন করলেন।

—শুনলে না চৌকিদারের কাছে? কী রকম ইরেসপন্সিবল এরা দ্যাখো। স্টোর থেকে দেওয়া সত্ত্বেও ব্যবহার করবে না এরা। হাতে বাত আছে মনে হয়। আরে সাপ-খোপ কি বর্ষাতেই শুধু আসে, গ্রীষ্মে আসে না?

অন্য গাড়িটা নিয়ে সঞ্জীবকাকু আর ভটকাই চান করার পরে ক্যান্টিনে চলে গেল। কালকে যেমন প্ল্যান হয়েছিল তেমনই হবে। বাসমতি চালের সিদ্ধ ভাত আর তার মধ্যে নানা তরকারি সিদ্ধ। কাঁচা পেঁয়াজ, কাঁচা লঙ্কা আর গাওয়া ঘি। এখন বন্দোবস্ত করতে গেল। পরে ক্যাসারোল-এ ভরে গরম গরম খাবার নিয়ে আসবে। এখানে একটা ছোট কিচেনও আছে। ক্রকারি কাটলারিও সব আছে। রাতে ওখানেই ভটকাইকে খিচুড়ি রাঁধতে বলব। সঞ্জীবকাকুও ভালো খিচুড়ি রাঁধতে পারেন। সুচিত্রা কাকিমা সঙ্গে এলে তো কথাই ছিল না কোনও।

ঋজুদা পাইপটা ভালো করে ভরে নিয়ে সোফার সামনে সেন্টার টেবিলে পা দুটো তুলে দিয়ে পাইপটা ধরাল। গোল্ড রক পাইপ টোব্যাকোর গন্ধে ঘর ম ম করতে লাগল। পাইপ টানতে টানতে গভীর চিন্তাতে ডুবে গেল ঋজুদা। এখন তার সঙ্গে কোনও কথাবার্তা চলবে না। আমরা সকলেই জানি।

ওরা ক্যান্টিন থেকে ফিরে আসারও ঘন্টা খানেক পরে প্রদীপকাকু ডাক্তার নিয়ে ফিরে এলেন। বয়স্ক ডাক্তার। ঢোলা জিন্সের ট্রাউজার, ওপরে হালকা খাকি জিন্স-এর কোট। গলাতে স্টেথিস্কোপ। বুকের বোতাম খোলা। গায়ে ভাল্লুকের মতো লোম। প্রদীপকাকু আলাপ করিয়ে দিলেন ঋজুদার সঙ্গে। ঋজু বোস অফ ক্যালকাটা

www.boiRboi.blogspot.com

অ্যান্ড ডঃ ওয়াভালকর অফ সাকোলি।

ডাক্তার ওয়াভালকর মারাঠিতে যতখানি সড়গড় ইংরেজিতে ততটা নয়। তাতে কিছু যায় আসে না। দারুণ ইংরেজি ফুটোনো অসম্ভব খারাপ এবং অসৎ ডাক্তার-সার্জেন কলকাতাতে অনেক দেখা আছে আমাদের। নাম নাই বা করলাম।

ঋজুদা আর প্রদীপকাকু ডঃ ওয়াভালকরকে নিয়ে দোতলাতে সুন্দরী মেমসাহেবের ঘরে নিয়ে গেলেন। আমরা নীচেই বসে রইলাম।

ডাক্তারবাবু সঙ্গে করে কিছু ওষুধও নিয়ে এসেছিলেন। দুটো ইঞ্জেকশন দিলেন শুনলাম। বললেন, এতে ব্যথা কমবে, সাময়িক রিলিফ হবে, আরও একটা ওষুধ আমি ড্রাইভারের হাতে পাঠিয়ে দেব। রোগ আমি ঠিক ডায়াগনাইজ করতে পারলাম না, কিন্তু নিউরোটক্সিক ইনফেকশান হয়েছে। কেস ফ্যাটালও হয়ে যেতে পারে। এখুনি নাগপুরে নিয়ে গিয়ে হাসপাতাল বা নার্সিংহোমে ভর্তি করে দেওয়া দরকার। বেশি দেরি হয়ে গেলে গণ্ডিয়াতেই ভর্তি করতে হবে। কারণ, নাগপুর যেতে তো সময়ও লাগবে অনেক।

ঋজুদা বলল, হুম-ম-ম্।

সঞ্জীবকাকু বললেন, চলুন, আপনাকে সাকেলিতে পৌঁছে দিয়ে আসি।

উনি বললেন, এখন খাওয়া-দাওয়ার সময়। আপনারা খাওয়া-দাওয়া করুন। বছরে আমাকে পাঁচ-সাতবার নাগজিরাতে আসতে হয়ই। তবে এমন কেস এর আগে পাইনি। বড় ডাক্তারেরা কী বললেন আমাকে একটু জানাবেন মোবাইলে ফোন করে। আমার জানা দরকার।

ঋজুদা ওঁকে একটা হাজার টাকার নোট দিলেন।

উনি বললেন, আমি এত বড় ডাক্তার নই।

এত সময় নষ্ট করলেন আপনি।

শেখাও তো হল। এই কেস আমি বিনিপয়সাতেও চিকিৎসা করতাম। আমাকে পাঁচশো টাকা দিন।

প্রদীপকাকু ডাক্তার ওয়াভালকরকে পাঁচশো টাকা দিলেন। প্রায় মারামারি করে ঋজুদার টাকা ঋজুদাকে ফেরত দিলেন ডঃ ওয়াভালকর।

সঞ্জীবকাকু মারাঠিতে বললেন, ডাক্তারসাহেব একটা পেপসি খেয়ে যান।

মাপ করবেন আমি এসব মাল্টিন্যাশনাল বিষ খাই না।

ডাক্তার ওয়াভালকর চলে গেলেন। সুন্দরী মেমসাহেব এখন একটু ঘুমোচ্ছেন। হয়তো পেইনকিলার দিয়েছেন। প্রদীপকাকু ড্রাইভারের কাছে হাজার টাকা দিয়ে দিলেন ওষুধ-ইঞ্জেকশনের এবং আরও যে ওষুধ দেবেন উনি তার দাম হিসেবে। ডাক্তারবাবুকে বলে দিলেন।

আমরা যখন খেতে বসেছি, তখন বেলা দুটো হবে, দাঁড়কাক মেমসাহেব আর পোপোটলাল সাহেব ফিরে এলেন! কী ব্যাপার? ওঁদের তো সারা দিনই অন্ধারবনেই থাকার কথা ছিল। মুনলাইট মিসচিফ কি পেয়ে গেলেন? কিন্তু খেতে খেতেই আমরা পোপোটলাল সাহেবের চিৎকার শুনতে পেলাম। খাওয়া ছেড়ে সকলে দৌড়ে গিয়ে দেখি ওঁদের টাটা সুমোর পেছনের সিট-এ পোপোটলাল সাহেব কাটা পাঁঠার মতো ছটফট করছেন। একেবারে সুন্দরী মেমসাহেবেরই মতন।

ঋজুদা জিজ্ঞেস করলেন দাঁড়কাক মেমসাহেবকে, কী হয়েছে?

সে তো আমিও বুঝতে পারছি না। সকালে তো ব্রেকফাস্ট

খাইনি তাই বারোটা নাগাদ আমরা যার যার লাঞ্চ-এর প্যাকেট নিয়ে অন্ধারপানিতে একা মস্ত গাছতলাতে বসে লাঞ্চ করছি আর বিয়ার খাচ্ছি, এমন সময়ে মিস্টার পোপোটলাল হঠাৎ যন্ত্রণাতে চিৎকার করতে লাগলেন।

কী হল? কিছুতে কামড়াল কি? সাপ-টাপ?

বললেন, না কিছুতে কামড়ায়নি। অথচ পাগলের মতো করতে লাগলেন যন্ত্রণাতে। প্রজাপতির খোঁজ আর না করে তখুনি প্যাক আপ করে ফিরে আসছি।

ঋজুদা বললেন, এদিকে আপনার বান্ধবীরও তো একই অবস্থা। একেবারে আইডেনটিকাল সিমটম্‌স—ডাক্তার ডেকেছিলাম আমরা—উনি এই সবে গেলেন।

বলেই ঋজুদা দাঁড়কাকের দিকে চেয়ে বললেন, ইজ নট ইট ভেরি স্ট্রেঞ্জ?

—হোয়াট ড্যু উ্য মিন?

মহিলা বললেন ভুরু কুঁচকে।

—আই ডোন্ট মিন এনিথিং। আই অ্যাম জাস্ট বিয়িং ইনকুইজিটিভ। ন্যাচারালি।

বলেই বলল, এঁদের দুজনকেই এখুনি হাসপাতালে রিমুভ করা দরকার। ডাক্তার বলে গেলেন।

আমাদের টাটা সুমোতে দুজন রোগীকে নিয়ে কী করে যাব?

—আমাদের একটা গাড়ি নিয়ে যান। প্রদীপ তুমি খাওয়া সেরে নাও। ওঁদের সঙ্গে তোমাকে যেতে হবে।

—আমি গিয়ে ওকে দেখে আসি।

বলেই দাঁড়কাক দোতলার দিকে চললেন।

তিতির বলল জার্মানে, উনি এখন ঘুমোচ্ছেন। চলুন, আমি

www.boiRboi.blogspot.com

আপনার প্যাকিংয়ে সাহায্য করব।

—প্যাকিং-এর কিছু নেই।

ততক্ষণে সঞ্জীবকাকু আর ভটকাই টাটা সুমোতে চলে গেছেন। মুখ দিয়ে লালা গড়াচ্ছে পোপোটলাল সাহেবেরও। বমিও করেছেন। ভটকাই মিনারেল ওয়াটার-এর বোতল নিয়ে গিয়ে মুখ ধুইয়ে দিল। কথাও বলতে পারছেন না। অসংলগ্ন আওয়াজ করছেন।

ভটকাই পরে বলেছিল যে শুনেছে মুনলাইট মিসচিফ, মুনলাইট মিসচিফ বলে বিড়বিড় করেছিলেন একবার।

ঋজুদা বলল, প্রদীপ সাকোলি হয়েই তো যাবে। পোপোটলাল সাহেবকে একবার ডঃ ওয়াভালকরকে দেখিয়ে নিয়ে যেও। অসুখ তো একই। পেইনকিলার পড়লে হয়তো একটু স্বস্তি পাবেন। ইঞ্জেকশানও দেবেন নিশ্চয়ই উনি। তুমি নাগপুরে পৌঁছেই বা পৌঁছবার আগেই বিশ্বজিৎ মজুমদার সাহেবের সঙ্গে মোবাইলে যোগাযোগ করবে। তাঁকে আমি যা বলার সব বলব।

তারপর বলল, পোপোটলাল-এর বাড়ি কোথায় জানো?

—জানি না। তবে তাপস জানে। তাপস সাহা। ওকে বলে দিচ্ছি ও পোপোটলাল সাহেবের দাদাকে খবর দিয়ে দেবে। ওঁরা যৌথ পরিবার। একই সঙ্গে থাকেন এটা জানি, ছোটি ধানতলি বা কোথায় যেন।

—কোন হাসপাতালে বা নার্সিংহোমে নেবে? ওই জার্মানদের কনটাক্ট কে নাগপুরে?

হেরর রুডল্ফ উইধাস। তাঁরই অতিথি হয়ে এসেছেন ওঁরা। শুনেছি, উনি জঙ্গলের বুকিং-টুকিং করে দিয়েছেন। ভদ্রলোক একটি জার্মান সফ্‌টওয়্যার কোম্পানির বড়সাহেব।

তাঁকেও খবর দিতে হবে। তাঁরা যদি সুন্দরী মেমসাহেবকে অন্য

কোনও নার্সিংহোম-এ ভর্তি করাতে চান তো করাবেন।

তারপর সঞ্জীবকাকুকে বললেন, সঞ্জীব—পোপোটলাল সাহেবেরা যে গাইডকে নিয়ে সকালে গেছিলেন তাকে এখুনি বলে রাখো যে আমরা একটু পরেই তাকে নিয়ে বেরব। উইকেকে বা সোনানেকে বলে দাও ওদের যেতে হবে না। গাড়িও তো বিকেলে একটাই থাকবে। আমরা পাঁচজন চলে যাব। গাইড তো পিছনেই বসে।

তারপর প্রদীপকাকুকে বললেন, প্রদীপ তুমি রাতটা নাগপুরে থেকে ভোরে ভোরেই বেরিয়ে চলে এসো আবার। তুমি না থাকলে তোমার ভাইপো-ভাইঝিরা কান্নাকাটি করবে। বেড়াতে এসে কী গেরোর মধ্যে পড়া গেল বলো তো। এখন মানে মানে এরা দুজন সুস্থ হয়ে উঠুন। তবে ভটকাই-এর দাঁড়কাককে একটু টাইট করতে হবে। ন্যাকা সাজলে তো হবে না। তাঁরই ষড়যন্ত্রে ঘটনা ঘটেছিল যে তাতে সন্দেহ নেই। কিন্তু ষড়যন্ত্রটা কী সেটাও জানতে হবে।

—এমন করার পেছনে মোটিভ কী?

—সেটাই তো বের করতে হবে। আর বের করতে হবে এঁদের দুজনের হঠাৎ এরকম অসুস্থ হওয়ার রহস্যও।

ওপর থেকে চৌকিদার প্রায় দশটা সাদা কার্ডবোর্ড-এর বাক্স এনে আমাদের গাড়িতে তুলল পেছনে। একটা গাড়িতে পোপোটলাল সাহেব শুয়ে যাবেন, যেমন এসেছেন অন্ধারবন থেকে। আর আমাদের গাড়িতে সুন্দরী মেমসাহেব পেছনের সিটে শুয়ে যাবেন। দু'গাড়ির সামনের সিটে প্রদীপকাকু আর দাঁড়কাক বসে যাবেন। প্রদীপকাকুর গাড়ির পিছন পিছন যাবে অন্য গাড়ি।

তিতির আর দাঁড়কাক বেডকভারের দোলনার ওপরে সুন্দরী মেমসাহেবকে শুইয়ে দোতলা থেকে একতলায় নামিয়ে তারপর গাড়ির পেছনের সিটে শুইয়ে দিল। দু'গাড়িতেই বেশি করে মিনারেল

www.boiRboi.blogspot.com

ওয়াটারের বোতল দিয়ে দেওয়া হল। ঋজুদা কিছু আঙুর আর আপেল জোর করে দিয়ে দিল প্রদীপকাকুকে। তারপরে আমরা সবাই বেরিয়ে দু'গাড়িকেই টা টা করে দিলাম।

ঋজুদা বলল, কটা বাজল রে?

—সাড়ে তিনটে।

—আমরা ঠিক চারটের সময় বেরব অন্ধারবনের দিকে বুঝলে সঞ্জীব। গাইডকে বলে রেখেছ তো?

—হ্যাঁ, হ্যাঁ। সে খেয়ে-দেয়ে এসে যাবে এখুনি ক্যান্টিন থেকে।

—তার নাম কী?

—তার নাম টেকরাম মাধার।

—সেও রাজগোন্দ?

—হ্যাঁ। সেও।

—যা চলেছে, তাতে চলো কাল সকলে মিলে গোখুরি পাহাড়ের চূড়োর কাপালদেও-এর মন্দিরে একটা পুজো দিয়ে আসি।

আমি বললাম, কাল না পরশু করো। প্রদীপকাকু কাল ফিরুক।

প্রদীপকাকু বাদ যায় কেন?

—সেটা ঠিক।

তারপরে ঋজুদা আবার পাইপটা ফিল করে ধরিয়ে সোফায় বসে সামনের সেন্টার টেবিলে পা দুটি তুলে দিল।

১১

আধঘণ্টাটাক পরে আমরা যখন বেরলাম টেকরাম মাধারকে সঙ্গে নিয়ে তখন বিকেল চারটে বেজে দশ।

ঋজুদা বলল, চলো সঞ্জীব, ক্যান্টিন ঘুরে যাই এক কাপ করে চা খেয়ে। ফিরতে ফিরতে তো রাত হয়ে যাবে।

—চলুন।

—রুদ্র তুই সুন্দরীর ব্রেকফাস্ট-এর বাক্সটা, যেটা ম্যাগনিফায়িং গ্লাস দিয়ে দেখলাম সেটা কোথায় রেখেছিস?

—একেবারে আমার স্যুটকেস-এ। চাবি দিয়ে রেখেছি।

—ভালো করেছিস।

ক্যান্টিনের সামনে পৌঁছতেই সেই যুবক নীলগাই, রাজা এগিয়ে এল অভ্যর্থনা করতে।

সঞ্জীবকাকু পকেট থেকে বিস্কুটের প্যাকেট খুলে তাকে খাওয়াল চা-এর অর্ডার দিয়ে এসে।

www.boiRboi.blogspot.com

—তাড়াতাড়ি করতে বলেছ তো? আমাদের তো বেশ দেরি হয়ে গেল।

—বলেছি। এখুনি পাঠাচ্ছে চা। ছেলে দুটো খুব ভালো।

—কোন ছেলে দুটো?

—মধুকর আর সুধাকর। যারা ক্যান্টিন চালায়। ওদের পদবি দাহিকর। একজন ক্যান্টিনেই থাকে আর একজন রাতে গ্রামে চলে যায় স্কুটারে করে।

—কোথায় গ্রাম?

—চোরখামারাতে। চোরখামারা রোড-এর শেষে ওই নামেরই গ্রাম আছে যে। আগে বলিনি বুঝি?

—না তো। কতদূর সে গ্রাম?

—এই পনেরো কিমি মতো হবে।

তিতির বলল, রাতে যেতে ভয় করে না?

—হয়তো করে। তবে প্রকাশ করে না। তাছাড়া বনের মধ্যে বন্যপ্রাণী আর মানুষ তো সহাবস্থান করেই। কোনও ঝগড়া তো নেই। তবে ভাল্লুকের মতো জানোয়ার, যারা গায়ে পড়ে ঝগড়া করতে ভালোবাসে তাদের কথা আলাদা। বুনো শুয়োরেও ঝামেলা করে বিনা প্ররোচনাতে। তবে স্কুটারের আওয়াজ আর আলোতে তারা দূরে দূরেই থাকে।

ঝাড়খণ্ডের পালামৌ অথবা উত্তরবঙ্গে যেখানে হাতি আছে সেখানে বিপদ। ভটকাই বলল।

হাতিরা আবার মোটর সাইকেল অথবা স্কুটারের শব্দকে সহ্য করতে পারে না। বিরক্ত হয়।

—তাই বুঝি।

সঞ্জীবকাকু বললেন।

চা এসে গেল। একটা স্টেইনলেস স্টিলের থালার ওপরে স্টেইনলেস স্টিলের গ্লাস-এ করে। খুব গরম চা।

রাজা, গাড়ির জানালা দিয়ে মুখ ঢোকল ভিতরে।

সঞ্জীবকাকু বললেন, বিস্ক ফার্ম কোম্পানির চকোলেট ক্রিম। আরও খেতে চায়। তোমরা খাবে না কি?

আমরা সমস্বরে বললাম, একদম নয়। এই তো খেয়ে উঠলাম।

চা খাওয়া হলে ঋজুদা বলল, চলো এবারে।

গাড়ি ছাড়া হল অন্ধারবনের উদ্দেশ্যে। ঋজুদা বলল, তুমি গণ্ডিয়াতে মিশিরকোটকর সাহেবকে একবার ধরো তোমার মোবাইলে। তাঁকে কাল সকালে একবার আসতে বলো, বলবে যে আমি অ্যাডিশন্যাল প্রিন্সিপাল ফরেস্ট সেক্রেটারি মজুমদার সাহেবের সঙ্গেও কথা বলছি। ওঁকে বলে দেব যে আমিই অনুরোধ করেছি ওঁকে আসতে।

ঠিক আছে। বলেই সঞ্জীবকাকু মিশরিকোটকর সাহেবকে ধরলেন বাড়িতে। আজ নাকি তাঁর স্ত্রীর জন্মদিন। অতিথি-টতিথি আসবেন। তাই তাড়াতাড়ি বাড়ি ফিরেছেন। সব শুনে উনি বললেন, এগারোটা নাগাদ আসবেন—তার আগে আমরা জঙ্গলে এক চক্কর ঘুরে আসতে পারব।

—গণ্ডিয়া কতদূর নাগজিরা থেকে?

—পঞ্চাশ কিমি। আর নাগপুর একশো বাইশ কিমি।

—তার মানে প্রদীপদের নাগপুর পৌঁছতে পৌঁছতে রাত হয়ে যাবে।

—তা তো হবেই। শহরের কাছাকাছি গেলেই ট্রাফিকের মধ্যেও পড়তে হবে।

সঞ্জীবকাকু বললেন।

www.boiRboi.blogspot.com

এবারে ঋজুদা নিজের মোবাইল বের করে নাগপুরে মজুমদার সাহেবকে ফোন করে ঘটনার কথা সব বলল। তারপর বলল, আপনারা ওই জার্মান মহিলাদের প্রজাপতি ধরার অনুমতি দিয়েছেন? পোপোটলাল সাহেব বলছিলেন, সুব্রাহ্মণম সাহেব নাকি অনুমতি দিয়েছেন?

ওপ্রান্ত থেকে মজুমদার সাহেব বললেন, হতেই পারে না। উনি তা দিতেই পারেন না। জানাজানি হলে বিধানসভাতে প্রশ্ন উঠবে।

—ওঁরা প্রজাপতি ধরে নিয়ে যাচ্ছেন। তার মধ্যে Rarest of the Rare—সম্ভবত এখনও আনচার্টেড একটা প্রজাপতি নাম মুনলাইট মিসচিফও ধরেছেন। পোপোটলাল সাহেব এবং অন্য মেমসাহেবের এই আশ্চর্য অসুস্থতার পিছনেও ওঁর হাত আছে বলে আমার সন্দেহ। ওই দু'জন হয়তো মারাও যেতে পারেন। মজুমদার সাহেব, আপনি আই জি পুলিশের সঙ্গে যোগাযোগ করে এখুনি ওঁর পাসপোর্টটা কনফিসস্টেট করতে বলুন। তার জন্যে যদি এফ আই আর-এর দরকার হয় তাহলে আমি সাকোলির ফাঁড়িতে অথবা গণ্ডিয়া পুলিশ স্টেশনে এফ আই আরও করতে পারি। আপনি যদি মিশিরকোটকরকে কাল গণ্ডিয়ার এসি বা ডিসি'কে সঙ্গে করে আনতে বলেন তাহলে ভালো হয়। মিশিরকোটকরের সকাল এগারোটা নাগাদ আসার কথা আছে।

কথা শেষ হলে মোবাইল বন্ধ করে ঋজুদা বলল, মজুমদারসাহেব খুবই ডিসটার্বড। হওয়ারই কথা। ওঁদের দুজনের মধ্যে যদি একজন সত্যিই মরে যান তবে তো কেসটা একেবারে অন্যদিকে মোড় নেবে।

ঋজুদার মোবাইল বাজল।

—কী হল?

www.boiRboi.blogspot.com

—ওঁদের দুটি গাড়ির নাম্বার। আর জার্মান মহিলার নাম?

—কত নাম্বার রে ভটকাই? মনে আছে?

ভটকাই নাম্বার বলে দিল। এসব ভটকাই-এর নখদর্পণে থাকে। আমাদের গাড়ির নাম্বার তো বললই পোপোটলাল সাহেবদের টাটা সুমোর নাম্বারও বলে দিল। একেবারে ফোটোগ্রাফিক মেমারি ভটকাই-এর।

ঋজুদা মজুমদার সাহেবকে ধরল। তারপর বানান করে বলল, STEFFI WOLFESSHON আর যিনি অসুস্থ তাঁর নাম ELDA UNGER। তারপর সঞ্জীবকাকুকে জিজ্ঞেস করে পোপোটলাল সাহেবের দাদা এবং মিস্টার রুডল্ফ উইধাস-এর নাম বলে দিলেন। বললেন, নাগপুর শহরে ঢোকার আগেই পুলিশ গাড়ি ইন্টারসেপ্ট করবে এবং পুলিশ তাদের সহযোগিতা করবে—নজরদারিও করবে।

দেখবেন, আবার আমার চেলা প্রদীপ গাঙ্গুলিকে যেন হয়রানি না করে। সে বেচারি ওদের অসহায়তার জন্যেই এসকর্ট করে নিয়ে গেছে। ওকে রাতেই ফ্রি করে দেবেন নইলে ও কাল সকালে রওয়ানা হয়ে আমাদের কাছে নাগজিরাতে ফিরে আসতে পারবে না। ওই যাত্রাদলের অধিকারী আর ওই যদি আটকে যায় তবে আমাদের এই ট্রিপটাই মাটি হবে।

ঋজুদার কথাও শেষ হল আর গাইড টেকরাম মাধার ড্রাইভার সিয়াজিরাও'কে বলল গাড়ি ডানদিকের পথে ঢোকাতে। এ পথটি বড় রাস্তা নয়। একটি অব্যবহৃত পথ পাহাড়ের ঢালুতে নেমে গিয়ে আবার পাহাড়ে চড়েছে। পাহাড়ের গায়ে গায়েই—ওপরে নয়। একটু এগোতেই দেখি একটি লেপার্ড তার দুটি বড় বাচ্চা নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। প্রায় নিঃশব্দ ইঞ্জিনের টোয়াটো কালিস গাড়ি গিয়ে পৌঁছতেই তারা ছত্রখান হয়ে তিনজন তিনদিকে চলে গেল। এপ্রিলের বিকেলে

হলুদ বনে হলুদ চিতারা হলুদতর ঝিলিক তুলে এলোমেলো হয়ে গেল। গাড়িটা একটু এগোতেই দিশাহারা বাচ্চা দুটো আবার মায়ের কাছে, তার নিরাপত্তাতে, ফিরে এল দৌড়তে দৌড়তে। সে এক দৃশ্য!

বাচ্চা দুটি বছর দুয়েকের হবে। এখনও একা একা শিকার করতে পারে না তবে মাকে শিকারে অবশ্যই সাহায্য করে। চিতা দেখে আমাদের দিল খুশ হয়ে গেল। গাড়ি ঘুরিয়ে আবার বড় রাস্তাতে পড়ে অন্ধারবনের দিকে চললাম আমরা।

অন্ধারবনে যখন পৌঁছলাম তখন সন্ধে হতে বেশি দেরি নেই। সত্যিই বন সেখানে খুবই ঘন। বড় বড় অইন গাছ, ধাওধা, বিজা, গড়াই, টিলসা, তেন্দু এবং বাঁশের নিবিড় জঙ্গল। পথটা ওখানেই শেষ।

ঋজুদা বলল, নাম গাড়ি থেকে। টেকরাম মাধারও নামল। ঋজুদা বলল, সকালের সিনটাকে রি-কনস্ট্রাক্ট করতে হবে।

আমরা নামতেই ঋজুদা বলল—দ্যাখ, সাদা কার্ডবোড এর প্যাকেটগুলো এইভাবে জঙ্গলে ফেলে গেছে পরিবেশ-এর শ্রাদ্ধ করে। নিজেদের দেশের জঙ্গলে তো একটুকরো কাগজও ফেলে না। এদের সুশিক্ষা সভ্যতা সব নিজেদের দেশেই রেখে আসে না কি এরা?

তারপর বলল, রুদ্র, প্যাকেটগুলো সাবধানে তুলে আন। এর মধ্যে একটা পোপোটলাল সাহেবের লাঞ্চ-এর। সাবধানে খুলবি। মধ্যে কিছু থাকতে পারে।

প্যাকেটগুলো তো খোলাই। গোটা ছয়েক খালি বিয়ারের বোতল পড়ে আছে ইতস্তত।

আমি গেলাম প্যাকেট আর বিয়ারের বোতলগুলো কুড়োতে।

ঋজুদা টেকরামকে বলল, এবার বলো তো এখানে পৌঁছে

www.boiRboi.blogspot.com

পোপোটলাল সাহেব আর মেমসাহেব কী করেছিলেন?

টেকরাম বলল, ওঁরা আমাদের মানে, আমাকে আর ড্রাইভারকে গাড়িতে রেখে দুজনেই প্রজাপতি ধরার ছাঁকনি নিয়ে ওই ডানদিকে চলে গেলেন—যেদিকে অন্ধারপানি। বাঁয়ে যেদিকে স্যাঁতসেঁতে জঙ্গল মেমসাহেব সেদিকেই গেলেন। প্রায় ঘণ্টাখানেক পরে মেমসাহেব একটা প্রজাপতি ধরে এনে খুব যত্ন করে বাক্সর মধ্যে রেখে বাক্সের ডালাতে সেলোটেপ লাগিয়ে দিলেন।

তারপর আবার চলে গেলেন। পোপোটলাল সাহেব সেই যে গেলেন ডানদিকে আর তার সাড়াশব্দ পেলাম না। প্রায় ঘণ্টা তিনেক পরে উনি ফিরলেন। উনি ফেরার আগে মেমসাহেব ওই গাছতলার পাথরে বসে বিয়ার খাচ্ছিলেন। মেমসাহেবকে খুব খুশি খুশি দেখাচ্ছিল। পোপোটলাল সাহেব ডাকলেন, স্টেফি, স্টেফি, বলে। ওঁর গলার ডাক শুনেই গাড়ির পেছন থেকে তিনটি বাক্স বের করলেন। লাঞ্চ ছিল তার মধ্যে। একটা আমাকে দিলেন, আরেকটা ড্রাইভারকে আর অন্যটা নিজে নিলেন। আর চতুর্থ একটা বের করলেন, পোপোটলাল সাহেবের জন্যে।

—তোমার লাঞ্চ প্যাকেটে কী ছিল?

—স্যান্ডউইচ, কলা, আপেল এইসব।

—পোপোটলাল সাহেবের বাক্সে কী ছিল?

—তা আমি দেখিনি। তাছাড়া সে প্যাকেটটার মুখ সেলোটেপ লাগানো ছিল।

...—মেমসাহেব নিজের প্যাকেটটা নিয়ে ওই পাথরের ওপরে রাখলেন কিন্তু খুললেন না।

...—পোপোটলাল সাহেব নিরাশ হয়ে ফিরলেন। মনে হল, উনি কোনও প্রজাপতি ধরতে পারেননি। মেমসাহেব পোপোটলাল

সাহেবকে বিয়ার খেতে বললেন। পোপোটলাল সাহেব বিয়ার খেতে লাগলেন ওই পাথরেই বসে। বোধহয় বললেন, দু'বোতল বিয়ার খেয়ে তারপরে খাবার খাবেন। তেষ্টা পেয়েছে খুব। দুজনে নানা কথা বলছিলেন ইংরেজিতে। আমি তো ইংরেজি বুঝি না সাহেব...তা কী হচ্ছিল বলতে পারব না। তবে এটা বুঝলাম যে মেমসাহেব যে প্রজাপতিটা ধরেছেন সেই সম্বন্ধে কোনও কথাই উনি পোপোটলাল সাহেবকে বললেন না। বরং দু'হাতের পাতা উলটে দেখালেন যে উনিও কিছু ধরতে পারেননি।

পোপোটলাল সাহেব বিয়ার খেয়ে আবার চলে গেলেন হাতে জাল নিয়ে।

পোপোটলাল সাহেব চলে গেলে মেমসাহেব তাঁর নিজের লাঞ্চ প্যাকেটটা খুলে খেলেন।

আধঘণ্টাটাক পরে পোপোটলাল সাহেব ফিরে এলেন। আমি আর ড্রাইভার তখন গাড়িতে গিয়ে বসে আমাদের দেওয়া প্যাকেট থেকে খানা খেতে লাগলাম। পোপোটলাল সাহেব এলে তাঁকে তাঁর জন্যে নির্দিষ্ট বাক্সটা দিয়ে মেমসাহেব বললেন, আমি একটু আসছি।

—কোথায় গেলেন মেমসাহেব?

ঋজুদা শুধোলেন।

সম্ভবত বাথরুমে। কিছুটা তাঁকে দেখতে পেলাম তারপরই জঙ্গলের আড়ালে তিনি অদৃশ্য হয়ে গেলেন।

—আর পোপোটলাল সাহেব?

—তিনি পাথরটাতে বসলেন। তারপর নিশ্চয়ই ওঁর প্যাকেটটা খুলে খাবার খেয়ে থাকবেন। হঠাৎ তাঁর চিৎকার শুনে আমরা গাড়ি থেকে নেমেই দেখি তিনি যন্ত্রণাতে কাতরাচ্ছেন।

কই চিজ কাটা হ্যায় ক্যা সাব আপ কো?

www.boiRboi.blogspot.com

—কুছতো দিখা নেহি। পাতা নেহি চলা। মগর কুছ কাটা হ্যায় জরুর। নেহি তো ইতনা জ্বলন ঔর ইতনা দরদ! বলেই, মুখ খোলা বাক্সটা পাশে নামিয়ে রাখলেন। আর খাওয়ার মতো অবস্থা ওঁর ছিল না।

একটু পরে মেমসাহেব খুব সাবধানে মাটির দিকে নজর করতে করতে ফিরে এসে সাহেবকে দেখে খুব অবাক হলেন। বললেন, কী হল?

—আই ডোন্ট নো। বললেন, সাহেব।

এটুকু ইংরেজি আমি আর ড্রাইভার দুজনেই বুঝলাম।

আমি মেমসাহেবকে বললাম, করনা ক্যা?

মেমসাহেব ইংরেজিতে বললেও বুঝলাম যে ফিরে যাওয়ার কথাই বলছেন।

...—পোপোটলাল সাহেবের পায়ে জোর ছিল না। যন্ত্রণাতে তিনি কথা বলতেও পারছিলেন না। আমরা দু'জনে, মানে আমি এবং ড্রাইভার তাঁকে কোনওক্রমে তুলে পিছনের সিটে শুইয়ে দিলাম। অত বড় লম্বা-চওড়া মানুষ, ওজন কি কম? আমাদের ঘাম ছুটে গেল। ওঁকে জল খাওয়ালাম। সাহেব খাবি-খাওয়ার মতো করছিলেন। আমরা গাড়িতে উঠে গাড়ি স্টার্ট করে, ঘুরিয়ে যখন নিলয়-এর দিকে আসতে লেগেছি তখন সাহেব যন্ত্রণাতে চিৎকার করে কাঁদতে লাগলেন। অতবড় লম্বা চওড়া পুরুষ মানুষ তিন বছরের বাচ্চার মতো কাঁদছিলেন। কোনওভাবে খুব জোরে গাড়ি চালিয়ে আমরা এসে নিলয়তে এসে পৌঁছলাম। তারপর তো জানেনই আপনারা।

ঋজুদা বলল, প্যাকেটগুলো আর বিয়ারের ফাঁকা বোতলগুলো তুলে নিয়ে আজ ফিরে চল। আজ অন্ধারবন আর দেখতে হবে না। কাল আবার আসব কার্বলিক অ্যাসিড-এর শিশি সঙ্গে করে।

—কার্বোলিক অ্যাসিডের গন্ধে একোলজি ইরিটেটেড হবে না?

—হলে হবে। চাচা আপন প্রাণ বাঁচা।

ব্যাপারটা কী? ট্যারান্টুলা? চিঙ্কিকেডে ঠিকই বলেছিল।

মাধার বলল।

আমি টেকারাম মাধারকে বললাম—তুমি চিঙ্কিকেডেকে চিনতে? এখন নভেগাঁও-তে আছে। চৌকিদার। সে আগে নাগজিরাতে ছিল।

—আমি চিনতাম না।

—তুমি কত বছর গাইড-এর কাজ করছ?

—তা পাঁচবছর হবে সামনের শাওন মাহিনাতে।

ভটকাই বলল, ঋজুদা যতই আমাকে উড়িয়ে দিক—দেখবি শেষমেশ ট্যারান্টুলাই বেরবে।

সঞ্জীবকাকু বললেন, পোষা ট্যারান্টুলা।

ঋজুদা বলল, পোপোটলাল সাহেবের লাঞ্চ প্যাকেটটা গিয়েই আমাকে দিবি। এখন অবশ্য রাত হয়ে যাবে। ম্যাগনিফাইং গ্লাস দিয়ে দেখতে হবে। চৌকিদারকে হ্যাজাকটা জ্বালতে বলবি। লণ্ঠনের আলোতে ভালো দেখা যাবে না।

—ঠিক আছে।

আমি বললাম।

ভটকাই বলল, দেখেছিস, পথটা অন্ধারবনের এইখানে এসে শেষ হয়ে গেছে।

—হ্যাঁ। ডেড এন্ড।

তিতির বলল।

সঞ্জীবকাকু বললেন, এখানে একটা পেরেনিয়াল ওয়াটার সোর্স আছে। সামনে সেই জলের ওপরে পাহাড়ের গায়ে বনবিভাগের

www.boiRboi.blogspot.com

বানানো লোহার হাইড আউট আছে। বাঘে যখন ওই জলে জল খেতে আসে তখন ছবি তোলেন অনেকে। পুরো নাগজিরার মধ্যে এরকম ঘন জঙ্গল আর বেশি নেই। বড় বাঘ আর বাইসনের আড্ডা এখানে। আর বাঁদিকে যে স্যাঁতসেঁতে ছায়াচ্ছন্ন জায়গা আছে সেখানে নানারকম প্রজাপতি দেখা যায়। সেই জন্যেই তো গাইড ওঁদের এখানে নিয়ে এসেছিল।

—কালকে জায়গাটাকে ভালো করে এক্সপ্লোর করতে হবে।

ভটকাই স্বগতোক্তি করল।

ঋজুদা আমাকে বলল, দেখ তো রুদ্র—পোপোটলাল সাহেবকে যে লাঞ্চ প্যাকেটটা দিয়েছিল দাঁড়কাক তার ওপরটা পারফোরেটেড কিনা?

আমি বললাম, হ্যাঁ।

—আর ওঁর নিজের বাক্সটা।

—না পারফোরেটেড নয়।

—টেকরামকে জিগগেস কর তো ওদের যে লাঞ্চ প্যাকেট দিয়েছিল সেগুলোর ওপরটা পারফোরেটেড ছিল কি ছিল না?

আমি জিগগেস করলাম। ভালো করে বোঝাতে না পারাতে সঞ্জীবকাকু মারাঠিতে জিগগেস করলেন। তারপর বললেন, না ছিল না।

যে বাক্সে প্রজাপতিটা ধরে এনে রেখেছিলেন তার ঢাকনাটাও নিশ্চয়ই পারফোরেটেড ছিল? জিগগেস করো তো সঞ্জীব।

সঞ্জীবকাকু জিগগেস করে বললেন, হ্যাঁ ছিল।

হুম-ম-ম। বলল ঋজুদা। তারপর বলল, আমি একটু পাইপ খাচ্ছি। ব্যাপারটা কী ঘটে থাকতে পারে তোরা সকলেও ভাব তা নিয়ে। আমার মাথা এখন মোটা হয়ে গেছে।

মোটাভাই-এর গাড়িতে চড়তে মানা করেছিলাম তো আমি এইজন্যেই। ভটকাই বলল।

তিতির বলল, 'কাল হো না হো' বি দ্যাখোনি? শাহরুখ খান, প্রীতি জিন্টা আর কী যেন নাম পতৌদি আর শর্মিলার ছেলের?

—কথাটা কি বলো না?

গুজরাতিতে মোটাভাই মানে বড় ভাই। ও মোটা সে মোটা নয়।

সঞ্জীবকাকু বললেন, আমার একটা কথা ভেবে অবাক লাগছে যে সুন্দরী মেমসাহেব এবং পোপোটলাল সাহেবকে যাই কামড়ে থাকুক সেই জিনিসটা ওদের দুজনের কেউই দেখতে পেলেন না? তাছাড়া একটা পিঁপড়ে কামড়ালেও লাগে, যে জিনিসের কামড়ে মানুষের প্রাণ সংশয় হয় সে যখন কামড়াল তখন বোঝা পর্যন্ত গেল না?

ভটকাই বলল, এসব অন্ধারবনের রহস্য। চিঙ্কিকেডে ঠিকই বলেছিল। ট্যারান্টুলা। আর দেরি নয় চলো। কাল প্রদীপকাকু ফেরামাত্রই আমরা গোখুরি হিলস-এর চূড়োতে গিয়ে কাপালদেও-এর পুজো দিই ভালো করে। পুজো দিয়ে অন্ধারবনের বিপদ থেকে বাঁচতে।

সত্যিই এ এক রহস্য।

জানা কথাই তো। চিঙ্কিকেডে বলেইছিল অন্ধারবনের রহস্যর কথা। ট্যারান্টুলা।

মুখ থেকে পাইপটা নামিয়ে ঋজুদা বলল, আঃ থামবি তুই ভটকাই। ফাটা রেকর্ডের মতো একই কথা বলে চলেছিস তো চলেইছিস।

—তা কী করব। তোমরা কেউই তো মিস্ট্রিটা সল্‌ভ করতে পারছ না। বুদ্ধিতে যখন ব্যাখ্যা চলছে না তখন অলৌকিক ব্যাপারই

বলতে হবে। আমাকে রাতে ডাকল কে?

—সে আবার কী কথা? তোকে আবার কে ডাকল?

ঋজুদা অবাক হয়ে বলল।

—নিশি। আবার কে?

তিতির বলল, বুলশিট। এই ভটকাইকে তুমি এবার তোমার টিম থেকে বাদ দাও ঋজুদা। ও একটা ইন্‌করিজিবল্ বাফুন হয়ে উঠছে।

আমি সঞ্জীবকাকুকে বললাম, টেকরামকে জিগগেস করুন তো এখানে, মানে নিলয়ের কাছে কোনও রাতচরা পাখি বা নিশাচর প্রাণী, মানে ব্যাঙ ট্যাঙ আছে কি যারা ভটকাই, ভটকাই বলে ডাকে?

টেকরাম বলল, আছে তো!

—আছে? কী নাম তাদের?

—তাদের নাম ভচকাই।

—সে কী?

—হ্যাঁ। বাঘ সাপ বা জঙ্গলের অন্য প্রাণীর হাতে যে সব মানুষ মরে তারা ভূত হয়ে যায়। রাতে ওই রকম ডাকে।

তিতির বলল, ও রুদ্র—এ তো ভারি কেলো হল!

—কেলো বলে কেলো!

—কেমন দেখতে জিনিসটা?

—ছোট ছোট চড়ুই-এর মতো।

—তোমার সাহেবরা এই পাখির কথা জানে?

না স্যার। সাহেবরা ইংরেজি-শেখা মানুষ। এসবে বিশ্বাসই করেন না। আমি আপনাদের বলেছি বলবেন না যেন, আমার চাকরি চলে যাবে।

তিতির বলল, এদের চাকরি যাওয়াই উচিত।

আমি বললাম, তার আগে ভটকাই-এর চাকরি যাওয়া উচিত।

www.boiRboi.blogspot.com

ভটকাই তেড়ে উঠে বলল, কেন ঋজুদা যখন ওড়িশার কালাহাণ্ডি জঙ্গলের বাঘমুণ্ডার কথা বলে তখন তো ঋজুদার চাকরি যায় না।

কী দুঃসাহস!

আমরা সকলে ভটকাই-এর দুঃসাহসে স্তব্ধ হয়ে গেলাম।

সঞ্জীবকাকু বললেন, ঋজুদারই যদি চাকরি যায় তবে তোমাদের কী অবস্থা হবে?

তখন প্রায় অন্ধকার হয়ে এসেছে। টেকরাম গাড়ি থামাতে বলল। বাঁদিকে চেয়ে দেখি পথের পাশে দু-তিন সারি গাছের পরে একটি তৃণভূমি। তাতে প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড একদল শুয়োর। অত বড় শুয়োর কখনওই দেখিনি। সবচেয়ে আশ্চর্যের বিষয় এই যে শুয়োরগুলো ছটফট করছিল না। স্থাণুর মতো দাঁড়িয়েছিল। অধিকাংশই বড়, তিন-চারটি ছোট ছিল। আলো-আঁধারিতে তাদের কালো অবয়বগুলো পেছনের কালোতর জঙ্গলের পটভূমিতে এক অলৌকিক ছবির সৃষ্টি করেছিল। প্রায় তিন-চার মিনিট আমরা দেখলাম তাদের। দিন দ্রুত মরে আসছিল। শুয়োরের দলে তারপরে নড়াচড়া শুরু হল।

টেকরাম বলল সিয়াজিরাওকে, চলো ভাই, আগে বাড়ো।

পরিবেশে পোড়া দিনের গন্ধ। থম মারা গরম একটা। হাওয়া নেই। একটু পর থেকে আবহাওয়া ঠাণ্ডা হতে শুরু হবে, হাওয়া উঠবে, নানা বনফুলের গন্ধ ছুটবে। তবে দিন ও রাতের মাঝে এই অর্যমার এক আলাদা বিধুর সৌন্দর্য আছে। যাদের চোখ আছে, নাক আছে, তারাই জানে।

গাড়ি চললে ঋজুদা বলল, এরকম বড় শুয়োর দেখেছিলাম ছেলেবেলাতে। জেঠুমণির সঙ্গে বিহারের, এখন ঝাড়খণ্ডের সিঙ্গার

উপত্যকাতে।

—সেটা কোথায়?

—ঝুমরি তিলাইয়া থেকে রজৌলির ঘাট পেরিয়ে যে ঘাট-পথ নওয়াদা, জৈনদের তীর্থ পাওয়াপুরিতে চলে গেছে সেই পথে গিয়ে পাহাড়ের পরেই বাঁদিকে ছিল সে উপত্যকা। অত বড় বড় শুয়োর আর শজারু আর কোথাওই দেখিনি। নাগজিরার শুয়োরেরা কত বছর আগের কথা মনে পড়িয়ে দিল।

সঞ্জীবকাকু বললেন তা তো হল, কিন্তু ওড়িশার কালাহাণ্ডির বাঘমুণ্ডার কী ব্যাপার?

ঋজুদা পাশ কাটিয়ে গিয়ে বলল, ও তুমি রুদ্রর কাছ থেকে শুনে নিও খন। বনপাহাড়ের গরিব মানুষদের অনেক ভয়ভক্তির জিনিস থাকে। তারা তো মিথ্যে বলে মানতে রাজিও নয়।

তারপরই বলল, টেকরাম-এর বাড়ি কোথায়?

—চোরখামারা গ্রামে। এই নাগজিরারই মধ্যে।

—জঙ্গলের মধ্যে তো?

—হ্যাঁ ভীষণই জঙ্গলের মধ্যে।

—ওরা তো রাজগোন্দ?

—হ্যাঁ।

দ্যাখো, আজও নাগজিরা বাংলোতেই ইলেকট্রিসিটি আসেনি। তবে বোঝো এইসব অঞ্চল কত অনুন্নত। অন্ধকারের মধ্যে, দারিদ্র্যের মধ্যে, অশিক্ষার মধ্যে অনেক অবাঞ্ছিত বিশ্বাস জন্মায়। কিন্তু সে সবকে জোর করে তাড়াবার কোনও দরকার আছে বলে আমার মনে হয় না। ওদের জীবনযাত্রা, পরিবেশ অনুষঙ্গ যখন বদলাবে তখন এইসব কুসংস্কারজাত বিশ্বাস আপনা থেকেই অপসারিত হবে। এই আদিবাসীরা কিন্তু আমার তোমার মতো এসি ঘর আর এসি গাড়ি চড়া

www.boiRboi.blogspot.com

মানুষদের চেয়ে অনেক সুখী। আমরা আরাম চেয়েছি, নিরন্তর আরামের খোঁজে দৌড়ে বেড়াচ্ছি তাই আমাদের মোক্ষও আরাম। আর ওদের মোক্ষ হচ্ছে আনন্দ। কত অল্পতে কত সুখী হওয়া যায় তা ওদের ভালো করে লক্ষ করলেই বুঝতে পারবে। ওই সব অদ্ভুত বিশ্বাস থেকে ওদের বিচ্ছিন্ন করার দরকারই বা কি আমাদের? নিজেরা যখন ছাড়বে তখনই ছাড়ুক।

ভটকাই বলল, টেকরাম ভাই, আমাকে একটা ভটকাই পাখি দেখাবে?

—ভচকাই। কিন্তু ও পাখি দেখতে নেই।

—কেন?

—দেখলেই মৃত্যু।

—তোমাদের নাগজিরা তো দারুণ জায়গা দেখছি। এখানে অদৃশ্য জিনিস কামড়ায়, কামড়াবার সময় ব্যথা লাগে না, যে কামড়াল তাকে দেখাও যায় না, অথচ তারপরই প্রাণ সংশয় হয়, রাত-পাখি ডাকে কিন্তু তাকে দেখা বারণ। আগে এত সব জানলে আসতামই না। দুসস-স-স।

১২

রাতে ঋজুদা হ্যাজাক জ্বেলে পোপোটলাল সাহেবের লাঞ্চ প্যাকেটের ভিতরটা ভালো করে ম্যাগনিফাইং গ্লাস দিয়ে পরীক্ষা করল। করে আমাকে বলল, তুইও দ্যাখ তো রুদ্র কোনও লোম বা আঁশ দেখতে পাস কিনা।

আমিও দেখলাম। নাঃ। সেরকম কিছুই দেখা গেল না।

ঋজুদা বলল, এই বাক্সটাও সুন্দরী মেমসাহেবের বাক্সরই মতো সাবধানে রাখ তোর জিম্মাতে।

ভটকাই এসেই খিচুড়ি রাঁধতে লেগে গেছিল।

ঋজুদাকে জিজ্ঞেস করল, অ্যাজ ইউজুয়াল মুগের ডালের ভুনি খিচুড়িই তো করব ঋজুদা?

—তোর যা খুশি কর। আমার এখন খাওয়া-দাওয়াতে মন নেই।

—সেই জন্যেই তো শ্রীকৃষ্ণের ভূমিকাতে আমাকেই অবতীর্ণ হতে হল। কিন্তু কিসমিস নেই, চিনেবাদাম নেই, ব্যাপারটা ভালো

www.boiRboi.blogspot.com

জমবে না। তবে সুধাকর ও মধুকর দাহিরকরদের ক্যান্টিনে বানানো 'খিচুড়ি'র চেয়ে ভালো অবশ্যই হবে। ঘি ঢালব জমিয়ে।

তিতির বলল, তা তো ঢালবেই। সৈয়দ মুজতবা আলি সেই বলেছিলেন না? "স্বপ্নেই যদি পোলাও রাঁধবে তবে আর ঘি ঢালতে কঞ্জুষী করছ কেন?" তা তোমার স্বপ্নের ভুনি খিচুড়ির বেলাও সে কথা খাটে। কী রাঁধবে জানি না, খেয়ে Steffi Wolfessohn আর পোপোটলাল সাহেবের মতো বমি না করতে হয়।

—তুমি একটা ক্লাস ওয়ান গ্রেড ওয়ান অকৃতজ্ঞ তিতির। এত জঙ্গলে এত ভালো ভালো রান্না করে খাওয়ালাম তারপরেও এই কথা।

আমি বললাম, ওকে ছেড়ে দাও তিতির। অনেক দিন পর "ড্যাগ-মাস্টার" হয়েছে—নাউ হি ইজ ইন হিজ এলিমেন্টস—ওকে ফ্রি-হ্যান্ড দাও। লেট হিম এনজয় হিমসেল্ফ।

—ঠিক আছে। তিতির বলল।

তারপর বলল, ভটকাই পাখিটার রহস্য উন্মোচন করতে হবে।

সঞ্জীবকাকু বললেন, ভটকাই তো নয়, টেকরাম তো বলল, ভচকাই।

—সে যাই হোক।

আমি বললাম।

তিতির বলল, ও ভটকাই নয়, ভচকাই?

—হ্যাঁ। সঞ্জীবকাকু বললেন।

—কিন্তু রুদ্র, বাখ্বমুণ্ডার ব্যাপারটা তো তুমিই বলবে বললেন ঋজুদা। কই? বললে না তো।

বললাম, ঋজুদা তো আর নিজে সে পাখির ডাক শোনেনি ভটকাই-এর ভচকাই-এর মতো।

www.boiRboi.blogspot.com

—বাঘডুম্বাটা কি বস্তু?

—কালাহাণ্ডিতে যখন মানুষখেকো বাঘ মারতে গেছিল ঋজুদা বহু বছর আগে, তখন স্থানীয় জঙ্গলের মানুষদের কাছে শুনেছিল যে মানুষখেকো বাঘে যেসব মানুষকে মারে এবং খায় তাদের আত্মা পাখি হয়ে যায়। সেই পাখিদেরই বাখ্বডুম্বা বলে।

—তারা কী করে ডাকে?

সঞ্জীবকাকু বললেন।

—সেটাই ইন্টারেস্টিং।

আমি বললাম।

—কী রকম?

—ওরা ডাকে, গাছের ঘন পাতার আড়ালে বসে, শুধুই রাতের বেলা, কিরি-কিরি-কিরি-কিরি—ধূপ্-ধূপ্-ধূপ্-ধূপ্-ধূপ্ করে। বুদ্ধদেব গুহ'র 'নগ্ন-নির্জন' উপন্যাসে আমার মা প্রথমে পড়েন তাঁর ছেলেবেলাতে। মায়ের কাছে শুনেছি ওই উপন্যাস আনন্দবাজারে বেরবার পর বেশ কিছুদিন পর্যন্ত নাকি তরুণী মায়েরা তাদের শিশুরা দুষ্টুমি করলেই বাধ্বডুম্বার ভয় দেখাতেন। বলতেন, ডাকব? ডাকব নাকি বাখ্বডুম্বাকে? কিরি-কিরি-কিরি-কিরি ধূপ্-ধূপ্-ধূপ্-ধূপ্—?

তিতির বলল, শিশুদের মনে এসব ঢোকানোটা সুশিক্ষার অঙ্গ নয়। যে লেখকেরা এইসব আজগুবি জিনিস লেখেন তাঁরাও প্রশংসার যোগ্য নন।

ঋজুদা বলল, হোরেশিও, দেয়ার আর মেনি থিংগস ইন হেভেন অ্যান্ড আর্থ হুইচ ইওর ফিলসফি এভার ড্রেমপট অফফ।

তিতির বলল, কোটটা ভুল হল, তবে শেক্সপিয়রের অবশ্যই।

মানেটা বুঝেছিস তো! তাহলেই হল। আমি নিজে কালাহাণ্ডির বন-পাহাড়ের মানুষদের গভীরভাবে বিশ্বাস করতে দেখেছি

বাখুডুম্বাতে। তাছাড়া, আমি নিজে না শুনলেও ওদের মধ্যে অনেকেই তার ডাক শুনেছে। ওই অকুতোভয় মানুষগুলোর এই ভয়কে তাই তথাকথিত-শিক্ষিত আমি উড়িয়ে দিতে পারিনি। এই গরিব, প্রাকৃত, প্রকৃতি-নির্ভর আদিম আদিবাসী ও অনাদিবাসী বন-পাহাড়ের মানুষদের বিশ্বাস-অবিশ্বাসকে আমি উড়িয়ে দিতে কোনওদিনই পারিনি। ওদের সঙ্গে, ওদের মতো অসহায় সম্বলহীন হয়ে বন-পাহাড়ে বাস করলে, তবেই ওদের বিশ্বাস-অবিশ্বাসের স্বরূপকে বোঝা যায়। ওরা তো তোদের মতো কম্প্যুটার-স্যাভি নয়, যতদিন না ওদেরও তোদের সচ্ছলতা, শিক্ষা, জ্ঞান-গম্মির সমান উচ্চতাতে টেনে তুলতে পারছিস ততদিন তোরা ওদের বুঝতেই পারবি না, ওদের ভালোবাসা তো দূরস্থান।

শেষের দিকে ঋজুদার গলার স্বর গম্ভীর এবং কিঞ্চিৎ তিরস্কারময় হয়ে গেল।

এইসব মানুষদের ছোট করলে, তাদের বিশ্বাস-অবিশ্বাস নিয়ে রসিকতা করলে ঋজুদা মনে মনে ভীষণই দুঃখিত হয়, আমাদের উপরে চটেও যায় তবে আমাদের ভালোবাসে বলে মুখে কিছু বলে না। বলে, কিছু জিনিস থাকে যা নিজেরা না বুঝতে চাইলে, না বুঝলে, অন্যজনে কিছুতেই তা বোঝাতে পারে না।

আমরা চুপ করে রইলাম।

ঋজুদা চান করতে গেল। আমাদের বলে গেল, সাবধানে হাঁটা-চলা করবি। সুন্দরী মেমসাহেবকে যা-ই কামড়ে থাকুক সে তো মরেনি। হয়তো এখনও এই নিলয়ের মধ্যেই আছে। আমাদের যে-কারোকেই সে কামড়াতে পারে। অবশ্য যদি বাইরে চলে গিয়ে থাকে তো অন্য কথা। তবে সে যে কী? তাই যখন জানা নেই, সাপ না পোকা, না মাকড়সা, না অন্য কিছু—তখন সাবধানতার মার নেই।

অচানক অসুস্থতার হেতুটা কী?

—তা আমি কী করে বলব। ডাক্তাররা, বিশারদেরা আছেন। তুমি পুলিশের যে অফিসার ওখানে আছেন তাঁকে বলে দেবে যে গণ্ডিয়া বা সাকোলি যেখান থেকেই বনবিভাগের সঙ্গে পুলিশ অফিসার আসবেন তাঁদের হাতে লাঞ্চ বক্সগুলো দিয়ে দেব। ফরেনসিক ডিপার্টমেন্ট-এর ওঁরা পরীক্ষা করে দেখলে সুবিধা হবে। সেগুলো ওঁরা সঙ্গে সঙ্গে যেন নাগপুরে পৌঁছে দেন এমন ইনস্ট্রাকশন আজই দিয়ে রাখতে।

—আমার সঙ্গেই দিয়ে দিলেন না কেন?

—রিস্ক ছিল। ওই বাক্সগুলো পরে কোর্টেও প্রডিউস করতে হতে পারে।

তারপর বলল, দাঁড়কাক যে একা এবং তার পেছনে যে কোনও চক্র নেই তা তো জানা নেই। এ জন্যেই তোমাকে দিয়ে পাঠাইনি। কেউ কেড়ে নিলে কী হত?

—তা বটে।

—ঠিক আছে। কতক্ষণে যে বাড়ি গিয়ে ভালো করে চান করে দুটো নির্জৌষধি মেরে ভাত খেয়ে ঘুমব তাই ভাবছি।

—মানুষের ভালো করো, ঈশ্বর তোমার ভালো করবেন।

ছাড়লাম।

ঋজুদা মোবালইটা সুইচ-অফ করে বলল, শুনলে তো সবাই।

প্রদীপকাকু যা জোরে কথা বলেন কারোরই শুনতে অসুবিধা হয়নি।

তিতির বলল।

প্রদীপ অত্যন্তই সফট্-স্পোকেন। কখনই জোরে কথা বলে না। এখন খুবই ক্লান্ত, বিরক্ত ও উত্তেজিত হয়ে রয়েছে ও।

সঞ্জীবকাকু বললেন।

www.boiRboi.blogspot.com

হবে।

তিতির ভটকাইকে বলল, আমার ওপরে ভরসা করে যদি ছাড়তে পারো তাহলে খিচুড়ির ভারটা আমার উপরেই ছেড়ে চানটা করে আসতে পারো তুমি ভটকাই।

—না, কর্তব্য অর্ধসমাপ্ত রেখে আমি অন্য কিছুই করি না। রাঁধব তো খিচুড়িটাই। ভাজা-ভুজি সব খাওয়ার ঠিক আগে গরম-গরম করব। তোমরা যাও, চান সেরে নাও। তোমরা এলে আমি যাব। আপনিও যান সঞ্জীবকাকু। আপনি আর ঋজুদা আবার গ্লেনকিসকিস না কি খাবেন খাওয়ার আগে।

—গ্লেনকিসকিস নয় গ্লেনফিডিশ।

—ওই হল।

বলল ভটাকাই।

আমি তাহলে যাচ্ছি। দশ মিনিটে আসছি ঋজুদা।

সঞ্জীবকাকু বললেন।

এসো। বলে, ঋজুদা পাইপটা ধরাল।

চান করতে করতে আমি ভাবছিলাম সাপ মাকড়সা যাই কামড়ে থাকুক সুন্দরী মেমসাহেব আর পোপোটলাল সাহেবকে কামড়াবার সময়ে কোনও ব্যথা তাঁদের দুজনেই বোধ করলেন না এটা কী করে হয়? দ্বিতীয়ত জিনিসটাকে যদি দাঁড়কাক লাঞ্চ-এর প্যাকেট-এর মধ্যেই রেখে থাকেন তাহলেও দুজনের একজনের চোখেও প্যাকেট খুলে খাওয়ার সময় তা পড়ল না তাই বা কী করে হয়? এ তো বড় রহস্য হল। এখন দুজনের মধ্যে একজনও পুরো সুস্থ হয়ে উঠলে তখনই তাঁর কাছ থেকে শোনা যাবে ব্যাপারটা আসলে কী ঘটেছিল?

দাঁড়কাক প্রজাপতি ধরেছেন নাকি অনেক। তার মধ্যে যদি একটিও DANID EGGFLY থাকে তবে তো তাঁর তিন বছরের জেল

www.boiRboi.blogspot.com

অবধারিত। পাঁচ হাজার টাকা জরিমানাও হবে। অন্যান্য স্পেসিস ধরলেও শাস্তি হবে। বনবিভাগের বড়সাহেব অনুমতি দিয়েছেন এই মিথ্যাটা তাঁরা সাদা চামড়ার মানুষ বলেই সকলে সহজে মেনে নিল! সাহেবরা পঞ্চাশ বছরেরও আগে দেশ ছাড়লেও কী হয়, এখনও আমাদের হীনম্মন্যতা গেল না! অথচ ওদের মতো মিথ্যেবাদী চোর ছ্যাঁচোর খুনি যে আর হয় না যারা জানে তারাই জানে। দাঁড়কাক যদি মুনলাইট মিসচিফ না কী যেন নাম, সেই প্রজাপতি পেয়ে থাকে তবে তো কথাই নেই। সেই প্রজাপতি নাকি এখনও লিস্টেডই হয়নি। ওই নামে ওরা এমনিতেই ডাকছিলেন। ওই প্রজাপতির নাম, যদি দাঁড়কাক ধরে নিয়ে যেতে পারে, তবে হয়তো সারা পৃথিবীতেই হয়ে যাবে স্টেফি উলফেসহনই! পৃথিবী বিখ্যাত হয়ে যাবে স্টেফি উলফেসহন!

পোপোটলাল সাহেবকে মারতে চাওয়ার পেছনে না হয় ওই কারণ কাজ করে থাকতে পারে যে কৃতিত্বটা দাঁড়কাক একাই নিতে চায় কিন্তু এলডা উঙ্গারকে মারতে চাইল কেন? স্টেফি উলফেসহন-এর কৃতিত্ব ভাগাভাগি যাতে না হয় সেই জন্যে? মানুষ এত নীচও হতে পারে! আহা! ফুলের মতো সুন্দরী মেমসাহেবটি। একসঙ্গে দুজনে এল জার্মানি থেকে দূরদেশে এই গরমের মধ্যে নাগজিরাতে আর কৃতিত্বের সবটুকুই যে একাই নেবে বলে ওপার থেকেই আঁটঘাঁট বেঁধে এসেছিল। সাপই হোক আর যাই হোক, যাই কামড়েছে ওঁদের দুজনকে তাও হয়তো জার্মানি থেকেই বয়ে নিয়ে এসেছেন? কিন্তু শীতের দেশে, ট্রপিকাল দেশের এইসব সাপখোপ কি হয়? পুরো ব্যাপারটাই একটা ধাঁধা।

স্টেফিকে দেখতে অনেকটা মেয়ে টেনিস প্লেয়ার নাভ্রাতিলোভার মত। মেয়ে না পুরুষ বোঝা যায় না। এখন এলডা প্রাণে বাঁচলে হয়। আর এদের সাহায্য করতে এসে পোপোটলাল

সাহেব কী বিপদেই না পড়লেন! ওদের কথা ভেবে ভটকাই-এর খিচুড়ি উৎসব-এ মন লাগছে না।

সন্ধে হওয়ার পরে পরেই কিন্তু গরমটা কমে যায়। রাত যত বাড়তে থাকে ungulates-দের ডাক যতই মাথা গরম করে দিতে থাকে ততই ঠাণ্ডা ভাবটাও বাড়তে থাকে। তবে দুপুরবেলাটা সত্যিই কষ্ট হয়। কটি তালপাখা নিয়ে এলে বেশ হত। অথবা ব্যাটারিতে চলা ফ্যান। আমরা উঃ আঃ করছি বটে, ঋজুদার কোনও বিকার নেই। শীত গ্রীষ্ম বর্ষা কিছুতেই ঋজুদার যেন আপত্তি নেই। ঋজুদা একদিন বলেছিল, যখন মনে হবে খুব গরম বা খুব শীত, মনে হবে অসহ্য হয়েছে, তখন মনে করার চেষ্টা করবি আরও কত বেশি ও গরম তুই এর আগে সহ্য করেছিস। মনে করলেই দেখবি গরম বা শীত আর তেমন লাগছে না। কথাটা কিন্তু ঠিক। আমি অমন মনে করে দেখেছি।

ভাবছিলাম, ঋজুদার কত কথাই না আমি জানি! তিতির তো এসেছে অনেক পরে, আর ভটকাই তো দুদিনের চিড়িয়া। কিন্তু হলে কী হয়? ও সরকারি অফিসের কর্মচারীর মতো আমাদের সুপারসিড করে ফেলেছে প্রায়। আমি খাল কেটে কুমির আনলাম।

আমরা সকলেই চান-টান সেরে বারান্দাতে বসে আছি আর নানা জানোয়ারের লাগাতার ডাক শুনছি। ঋজুদা ও সঞ্জীবকাকু বেণুকাকুর দেওয়া জিনিসটি খাচ্ছেন, আমরা থামস-আপ। অনেকগুলো থামস-আপ আর কিনলি মিনারেল ওয়াটার-এর লিটারের বোতল নিয়ে এসেছি সঙ্গে করে আমরা। সঞ্জীবকাকুরা সোডা নিয়ে এসেছেন বোতলে। যেহেতু ইলেকট্রিসিটি নেই তাই এখানেও ফ্রিজও নেই, বরফও নেই। যেখানে যা।

ভটকাইও এসে বসেছে চান সেরে। বলেছে, আমাকে দশ মিনিটের নোটিশ দেবে, গরম-গরম ভাজাগুলো ভেজে দেব।

www.boiRboi.blogspot.com

ঋজুদা বলল, আচ্ছা, আমরা যখন খাই তখন সবসময়েই কি থালার দিকে চেয়ে থাকি?

তিতির বলল, খাওয়া যখন শুরু করি তখন একবার দেখি অবশ্যই তারপরে কি দেখি? অন্য দিকে চেয়ে বা গল্প করতে করতেই তো খাই।

—যখন গল্প করার কেউ থাকে না, যখন একা একা খাই?

—তখনও সবসময়েই কি খাওয়ার দিকে চেয়ে থাকি, আমার তো মনে হয় না।

—যদি লাঞ্চ প্যাকেট থেকে খাবার খাস? তখন?

—তখনও প্যাকেট খোলার পরেই একবার দেখে নিই কী কী আছে প্যাকেটে—তারপর, খাওয়া শুরু করার পরে কি প্যাকেটের মধ্যে তাকাই? মনে হয় না।

ঋজুদা বলল, তোদের সকলেরই কি এই মত?

ভটকাই বলল, আমি কিন্তু তাকাতে তাকাতেই খাই। খাবার শুধুই কি খাওয়ার? দেখবারও তো বটে। অন্যদের কথা জানি না।

সঞ্জীবকাকু বললেন, বিষধর সাপ কি খুব ছোটও হতে পারে?

—পারে বই কি? কেন ক্লিওপেট্রা যখন আত্মহত্যা করলেন তাঁর ঝাঁপিতে রাখা সাপের কামড় খেয়ে? সেই সাপটি কি বড় ছিল?

—দেখা তো যায়নি। আমরা সিনেমাতে যা দেখেছি তা হল ছোট্ট ঝাঁপিটা কোলের ওপরে তুলে ক্লিওপেট্রা তার ডানহাতটাকে ঝাঁপির মধ্যে ঢুকিয়ে দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই নেতিয়ে পড়লেন। সাপটা আঙুলেই বোধহয় কামড়েছিল।

ঋজুদা বলল, এলডা উঙ্গারের শরীরে কোনও দংশন চিহ্ন ছিল কিছুর?

—তাছাড়া, যেই ভাবছি, কিছু কামড়াল আর এলডা এবং

পোপোটলাল কেউই কিছু বুঝতে পারল না কেমন করে হয়?

তিতির বলল, এলডার হাতে, কবজির কাছে আমি দুটো লাল চিহ্ন দেখেছিলাম। উনি তো বলতে পারছিলেন না।

—আর পোপোটলালের?

সঞ্জীবকাকু বললেন, ওঁর ডানহাতের তর্জনীতে আমিও দুটি লাল ফুটকি দেখেছি এই এক-দেড় ইঞ্চি ব্যবধানে।

ভটকাই ব্যাপারটা সরলীকরণ করে বলল, পুলিশ যখন দাঁড়কাককে থানায় নিয়ে গিয়ে প্যাঁদানি দেবে তখন সব বেরবে।

আমরা সকলেই ওর কথাতে হেসে উঠলাম।

ঋজুদা বলল, একটা জিনিস আমার মাথাতে প্রথম থেকে এসেছে।

—কী? আমাদের বলো ঋজুকাকা।

—এখনও বলার সময় আসেনি। কালকে ওঁরা সব আসুন বনবিভাগ এবং পুলিশ থেকে সব শুনি। প্রদীপের কাছে শুনি ডাক্তারেরা ও ফরেনসিক এক্সপার্টরা কী বললেন, তারপর আমার কথা বলব, মানে, আমার যা অনুমান।

—তবে একটা কথা পরিষ্কার যে ভটকাই-এর বা চিঙ্কিকেডের ট্যারান্টুলার কোনও ভূমিকা এখানে নেই।

ভটকাই বলল, তুমি কী করে শিওর হলে?

—এই জন্যেই হলাম যে দুটি বাক্সর একটি বাক্সের মধ্যেও কোনও রোম বা আঁশ পাওয়া যায়নি। অন্তত ম্যাগনিফাইং গ্লাস দিয়েও দেখা যায়নি। মাকড়সা জাতীয় প্রাণী হল বাক্সের মধ্যে একাধিক রোঁয়া থাকতই বা লোম, যাই বলিস।

তিতির বলল, উলফেসান যদি কনফেশান করেন তাহলেই ঝামেলা মিটে যায়।

—এত বড় ঝানু মেম কি অত সহজে কনফেশান করবে?

তারপরই বলল, তবে গাড়ির ড্রাইভার এবং গাইড টেকরাম এবং 'নিলয়'র চৌকিদার সকলেই এক বাক্যে বলবে যে উলফেসানই লাঞ্চ প্যাকেট দিয়েছিল পোপোটলাল সাহেব এবং এলডা উঙ্গারকে—অন্য কেউ নয়। আদালতে ওদের সাক্ষী হিসেবে প্রয়োজন হবে। তাছাড়া, ওদের লাঞ্চ প্যাকেট দুটিই পারফোরেটেড ছিল এবং ঢাকনাতে সেলোটেপ মারা ছিল কিন্তু ড্রাইভার, গাইড এবং নিজেও যে প্যাকেট নিয়েছিল তাতে কোনও পারফোরেশন ছিল না। পারফোরেশন ছিল যে সব বাক্সে প্রজাপতি ধরে রেখেছিল এবং যে দুটোতে ওদের দুজনের লাঞ্চ ছিল।

—ঘটনাটা ঘটল তো ঘটল একেবারে শেষদিনে। কেন?

তিতির বলল।

—শেষদিনই তা সবচেয়ে ভালো দিন। দাঁড়কাক যে DANID EGGFLY বা MOONLIGHT MISCHIEF ধরতে পারবে তা তো আগে থাকতে জানত না। ওরা কেউই হয়তো ভাবেওনি যে ধরতে পারবে। ধরতে না পারলে ওঁদের দুজনকে মারার চেষ্টার দরকারও ছিল না। যদি আগেও ধরে থাকে তো অন্যদের বলেনি। অন্যদের কেউও ধরে থাকতে পারে। সে কারণেই তাদের পৃথিবী থেকে সরিয়ে দেওয়া প্রয়োজন বোধ করছিল দাঁড়কাক। বাক্সে করে যাই এনে থাকুক তাদের জঙ্গলে ছেড়ে দিয়ে ফিরে যেত হয়তো।

সঞ্জীবকাকু বললেন, ওঁরা যে MOONLIGHT MISCHIEF বা স্টেফি উলফেসহন যে নামেই ওই প্রজাপতি ধরে পৃথিবীতে পরিচিত হোক না কেন, ধরতে পারবেনই তা স্টেফি জানলেন কী করে?

—নিশ্চিতভাবে জানেননি হয়তো কিন্তু মনে আশা করেই তো এসেছিলেন। নইলে ফ্রাঙ্কফুর্ট আর মিউনিখ থেকে মহারাষ্ট্রের এই নাগজিরাতে কি আসতেন? ওঁদের মিশনটা খুবই উচ্চাকাঙ্ক্ষার ছিল

www.boiRboi.blogspot.com

সে জন্যেই এসেছিলেন এবং ভারতে এত জঙ্গল থাকতে শুধুমাত্র নাগজিরাতেই! হয়তো অন্য কোনও জার্মান লেপিডপটারিস্ট এখানে আগে এসেছিলেন তাঁর কাছ থেকে শুনেই হয়তো ওঁরা এসেছিলেন এই প্রজাপতির সন্ধানে।

—এবারে কি ভাজা ভাজব? খাবে তোমরা?

ভটকাই প্রসঙ্গান্তরে গিয়ে বলল।

—বাজে কটা?

—আটটা।

এত তাড়াতাড়ি খেলে শোবার আগে খাবার হজম হয়ে যাবে।

সঞ্জীবকাকু বললেন।

—ঠিক কাঁটায় কাঁটায় সাড়ে আটটাতে খেতে বসব আমরা ভটকাই। সাড়ে নটার মধ্যে শুয়ে পড়ব। কাল খুব ভোরে জঙ্গলে যাব নইলে ওঁরা সকলে আসবার আগে আমরা ফিরে আসতে পারব না।

—তা ঠিক।

—তুই আটটা কুড়িতে ভাজাভুজি কর।

—তুমি ভাজো, আমি আর রুদ্র টেবল লাগাই, গ্লাসে জল দিই। ওখানে তো ম্যাটও আছে দেখছি। বন্দোবস্তের কোনও ত্রুটি নেই।

—সবই ভালো শুধু নিলয়ের জন্যে একজন আলাদা রান্নার লোক থাকলে ব্যাপারটা জমে যেত।

ভটকাই বলল।

ঋজুদা বলল, আজকালকার দিনের বনভ্রমণকারীরা সব সিরিয়াস। ভটকাই-এর মতো সদাই খাই-খাই নেই তাদের। পিকনিক করতে আসে না তারা। তাছাড়া, বায়োডাইভার্সিটি, একোলজি, একো ট্যুরিজম ইত্যাদি অনেক বড় বড় কথাও আকছার বলে। ওয়াইল্ড লাইফটা আজকাল খুব লাভবান একটা পেশাও হয়ে গেছে। জংলি

www.boiRboi.blogspot.com

জানোয়ার নিয়ে লেখা, তাদের ছবি তোলা, ভিডিও ফিল্ম তোলা এসব আজকাল অনেকেই প্রফেশন করেছেন। ভালো ছবি তুলতে পারলে টিভির বিভিন্ন চ্যানেল তা কিনে নিচ্ছে। প্রচুর রোজগার। নব্য বনভ্রমণকারীদের পোশাক-আশাক, টুপি, জুতো, সানগ্লাস, ফেডেড জিন্স এসবও ভালো ব্যবসার সামগ্রী হয়েছে। যে বন-জঙ্গলকে আমরা শুধু হৃদয়ের উত্তাপ আর ভালোবাসা দিয়ে আমাদের মতো করে জেনেছি সেই বন-জঙ্গলই এদের ফিল্ড-ওয়ার্কের জায়গা হয়েছে, ল্যাবরেটরি হয়েছে। মানুষের জ্ঞানের ইচ্ছাটার বদলে অন্যকে ইমপ্রেস করার ইচ্ছাটা এমনই তীব্র হয়ে গেছে যে ভালোবাসাটাই হয়তো মরে গেছে। এ যুগে ওয়ার্ডসওয়াথ, কীট্স বা বিভূতিভূষণ বা হেনরি ডেভিড থোরোরা বোধহয় আর জন্মাবেন না। বন আর মুনি-ঋষিদের সাধনাস্থল থাকবে না হয়তো। উৎসুক, উদগ্রীব, মানুষের পদক্ষেপ এবং উদগ্র ঔৎসুক্যে বনের নীরব নিভৃতি হয়তো ছিন্নভিন্ন হবে। যে বনকে আমরা জানতাম— কবির চোখ দিয়ে দেখতাম—যা নিয়ে কাব্য করতাম সেই বন ভবিষ্যতে হয়তো আর খুঁজেই পাওয়া যাবে না। আগামী প্রজন্মের সাহিত্যিকেরা থোরোর THE WALDEN, ওয়াল্ট হুইটম্যান-এর LEAVES OF GRASS বিভূতিভূষণের চাঁদের পাহাড় এবং রবীন্দ্রনাথের লেখার মতো লেখা হয়তো আর লিখবেন না।

বলেই, বলল, তোরা কী বলিস?

তিতির বলল, আমরা যাই বলি কিন্তু পুরনোদের তো নতুনদের জন্যে জায়গা ছেড়েই দিতে হবে। আজ আর কাল। এই নতুনরাও একদিন পুরনো হয়ে যাবে। নতুনতর এক ঝাঁক মানুষ আসবে তখন। এই তো নিয়ম।

ঋজুদা বলল, বাঃ। ভেরি ওয়েল সেইড। সাধে কি বলি যে তিতিরের বুদ্ধিই আলাদা!

১৩

খাওয়া-দাওয়ার পরে ঋজুদা বলল, চা-টা খাওয়ার বিলাসিতা বাদ দিয়ে কাল আলো ফুটতে ফুটতেই চল বেরিয়ে পড়া যাক। ভোর পাঁচটাতেই পুবের আকাশ ফর্সা হয়ে যায়। মহারাষ্ট্র তো বেশ পশ্চিমে। আমাদের কলকাতাতেই সাড়ে চারটেতেই ফর্সা হয়।

আমরা সকলেই বললাম, ঠিক আছে। তুমি যা বলবে।

বলেই, যে যার ঘরের দিকে চললাম। সঞ্জীবকাকু গাড়ি নিয়ে লগ-হাট-এর দিকে এগোলেন। একে তো চিঙ্কিকেডের ট্যারান্টুলা, তার ওপরে ভটকাই-এর ভচকাই তার ওপরে ঘোর অন্ধকার রাত, লগ-হাট কাছে হলেও গাড়ি থাকলে পায়ে হেঁটে যাওয়ার কোনও মানেই হয় না। তাছাড়া, বড়কা শুয়োরেরাও UNGULATES-দের মধ্যেই পড়ে। দাঁত দিয়ে পেট ফাঁসিয়ে দিতে কতক্ষণ।

খিচুড়িটা বেশ ভালোই রেঁধেছিলি রে।

আমি বললাম।

—থ্যাঙ্ক উ্য। আমি তো ভালোই রাঁধি এবং রেঁধে চিরদিন তোদেরই খাইয়ে এলাম, কিচেন ম্যানেজারি করলাম, অথচ তোরা এমনই অকৃতজ্ঞ যে সবসময়েই আমাকে হুড়ো দিয়ে এলি।

—আরে ওটাই তো ভালোবাসা। তুই বুঝতে না পারলে আমরা কী করব!

তারপর বললাম, আজ কি তুই জানালার দিকে শুবি?

—কেন?

—না, তোকে যদি ভচকাই পাখি রাতে ডাকতে আসে।

—ইয়ার্কি না মেরে তাড়াতাড়ি শুয়ে পড়। দশটা বাজে।

তারপর বলল, বাথরুমের হ্যারিকেনের ফিতেটা একটু বাড়িয়ে দিই, আর ঘরেরটা কমিয়ে দিই। কি বল?

—তা দে। কিন্তু রাতে বাথরুম গেলে খালি পায়ে যাস না।

—আহা, বাথরুমে স্লিপার পরে গেলেই বা কী হবে। সুন্দরী মেমসাহেবকে যে পার্টি কামড়েছিল সে যে 'নিলয়ে'র মধ্যেই নেই তার গ্যারান্টি কি? থাকলেও সে যে কোথায় আছে তা তো কেউই বলতে পারে না। বাইরেও চলে গিয়ে থাকতে পারে। কিন্তু ঋজুদার কথামতো চৌকিদার বাইরে কার্বলিক অ্যাসিড ছড়ানোতে বাইরে বেরিয়েও সে কার্বলিক অ্যাসিডের লক্ষণরেখা পেরোতে না পেরে ভিতরে ফিরে এসে থাকতে পারে।

ভটকাই বলল।

বললাম, বাজে চিন্তা ছেড়ে এখন ঘুমো তো দেখি।

—ঘুম আসবে না অত সহজে।

—তবে সুন্দরী মেমসাহেবের মুখটা মনে কর। আহা কী সুন্দর রে তোর সুন্দরী।

www.boiRboi.blogspot.com

একেবারে ফুলের মতো।

ভটকাই বলল, প্রজাপতির মতো। এখন মানে মানে ভালো হয়ে উঠুক সুন্দরী এই প্রার্থনা কর।

করছি, বলে আমি চোখ বন্ধ করলাম। চোখ বন্ধ করলেও কান তো খোলাই রইল। বাইরের হ্রদে কত হরিণ শম্বর কোটরা নীলগাই এবং অন্যান্য জানোয়ার যে জমেছে এসে তার ইয়াত্তা নেই। মুহুর্মুহু তাদের বিভিন্ন ডাক ব্যাকগ্রাউন্ড মিউজিকের মতো মনে হচ্ছে। প্রত্যেকের স্কেলই আলাদা। কারও ন্যাচারাল A, কারও B Natural, কারও C সার্প। নাগজিরা অর্কেস্ট্রা। অন্ধকার আকাশে তারারা স্বমহিমাতে ফুটে আছে। বেশ ঠাণ্ডা হয়ে গেছে প্রকৃতি এখন। একটু পরেই চাদর দিতে হবে গায়ে। নানা কথা ভাবতে ভাবতে কখন যে ঘুমিয়ে পড়েছি নিজেই জানি না।

১৪

আমরা যখন চোরখামারা রোড দিয়ে নাগজিরা পার্কের মধ্যে ঢুকলাম তখন পুবের আকাশ সবে লাল হয়েছে। বোধহয় এক মাইলও যাইনি এক আশ্চর্য দৃশ্য দেখে সকলেই পুলকিত হলাম। ঋজুদা হয়তো দেখেছে এমন দৃশ্য আগে কারণ অনেক মানুষখেকো বাঘই মেরেছে ঋজুদা কিন্তু আমরা কেউ দেখিনি। দেখলাম, জঙ্গলের ডানদিকের হরজাই জঙ্গল থেকে বেরিয়ে একটি মস্ত বড় বাঘ ধীরে সুস্থে পথটি পেরিয়ে বাঁদিকের জঙ্গলে ঢুকছে। এমন দৃশ্য দেখাই যায়। কিন্তু বাঘটির মুখ রক্তে একেবারে লাল। তার মানে, শেষরাতে কোনও শিকার ধরে সেই শিকারকে খাচ্ছিল এতক্ষণ—এখন জলে যাচ্ছে জল খেতে। বনের মধ্যে কোথায় জল আছে তা বাঘই জানে।

বাঘ বাঁদিকের জঙ্গলের গভীরে ঢুকে গেলে সঞ্জীবকাকু বললেন, এটা বাঘ না বাঘিনী?

—ছুবি তুলেছ?

www.boiRboi.blogspot.com

—তুলেছি বইকি। তবে আলো বড্ডই কম ছিল আর খুব কাছে তো ছিল না যে ফ্ল্যাশ ব্যবহার করব। তবে জুম লেন্স ব্যবহার করেছি। ছবি ভালোই উঠবে।

—গাড়ি রোক্কো তো ভাই।

ড্রাইভার গাড়ি থামালে ঋজুদা গাড়ি থেকে নেমে পথের ধুলোতে বাঘের থাবার ছাপ দেখে নিল ভালো করে। আমরাও নামতে যাচ্ছিলাম। টেকরাম মাধার বাধা দিল। বলল, কাছেই বাঘ রয়েছে, তাছাড়া নাগজিরার বনে তো নামা বারণ।

ভটকাই বলল, ঋজুদা যে নামল?

—উনকা বাত দুসরা হ্যায়।

—কাহে?

—উনোনে জঙ্গলকো জানতা হ্যায়।

—তুমকো কৈসে মালুম?

সঞ্জীবকাকু বললেন।

হামলোগোনে জঙ্গলকিহি আদমি হ্যায়, হামলোগ সমঝ পাতা কওন ক্যা জানতা।

ভটকাই ফিসফিস করে বলল, আর আমাদের তুমি মানুষ বলেই গণ্য করো না। আমরাও যে আফ্রিকা-ফেরত বন-মাস্টার তা কি তুমি জানো?

ঋজুদা ফিরে এসে গাড়িতে বসল। বলল, টাইগার। টাইগ্রেস নয়।

—কী বিরাট বাঘ!

তিতির বলল।

—ও আরও অনেক বড় হবে। এখন ওর ভরা যৌবন। বিয়ে করবে শিগগিরই।

আমরা হেসে উঠলাম।

—কী মেরেছে? বাঘবাবু।

ভটকাই বলল।

আমার তো অন্তর্ভেদী দৃষ্টি নেই। তবে মনে হয় কোনও বড় জানোয়ারই মেরেছে। শম্বর বা বাইসন, থুরি গাউর। তবে যা-ই মেরে থাকুক সে জানোয়ারের শরীরের গভীরে মুখ ডুবিয়ে মাংস খেয়েছে বলেই মুখময় অমন রক্ত মাখামাখি হয়ে আছে। রক্ত অবশ্য সব সময়েই লাগে। মানে, ওরা যখন খায়। তবে যখন মানুষের রক্ত লাগে তখন দেখলে আমার বড় গা বমি-বমি করে। কিন্তু মানুষখেকো আর কটি বাঘ হয়। যারা হয়, তারাও তো অধিকাংশ মানুষের হঠকারিতার জন্যেই হয়, মানুষেরই কৃতকর্মের জন্যে। তাই তখন অনেক মানুষকে তাদের জীবন দিয়ে দু'একজন হঠকারী মানুষের কৃতকর্মের প্রায়শ্চিত্ত করতে হয়।

—কোথায় যাচ্ছে বাঘটা?

—জল খেতে। জল খেলেই মুখের রক্ত অনেকটা ধুয়ে যাবে, তবে বাঘ তো জলে মুখ ডুবিয়ে জল খায় না, জিভ দিয়ে চাক্ চাক্ শব্দ করে জল খায়।

—জল খেয়ে কোথায় যায়? সঞ্জীবকাকু বললেন।

—তার ডেরাতে। সে ডেরা গোখুরি পাহাড়ের কোনও গুহাও হতে পারে অথবা কোনও ছায়াচ্ছন্ন বনভূমির দোলামতো জায়গাও হতে পারে অথবা গভীর বাঁশবনের ভিতরে, যেখানে বাঁশপাতার নরম বিছানা পাতা। সারা দিন বাঘ সেখানেই ঘুমুবে। তারপর সন্ধে সন্ধের সময়ে আবার রোদে বেরবে। যদি জানোয়ারটাকে আজই মেরে থাকে তবে সেই জানোয়ারের মড়িতেই ফিরে আসবে আবার খেতে। বড় জানোয়ার হলে তিন-চারদিন ধরেও খেতে পারে বাঘ। তার শিকার

www.boiRboi.blogspot.com

করা জানোয়ারের মড়ি সে অতি সাবধানে গাছের ছায়াতে বা ঝোপের ভিতরে লুকিয়ে রাখে যাতে ওপর থেকে শকুনেরা তা দেখতে না পায়। শকুনেরা দেখতে পেলে বাঘ আসার আগেই তারা খেয়ে মড়ি সাফ করে দিতে পারে। এই বনে হায়না নেই।

—কেন নেই?

সঞ্জীবকাকু বলল।

—তা আমি বলতে পারব না। হায়নারা থাকলে, তারাও খেতে পারে। হায়নাদের চোয়ালে অসম্ভব জোর। তারা মোটা-সোটা হাড়ও ভেঙে খায়, কটাং-কটাং আওয়াজ করে।

বলেই বলল, আগে বাড়ো মোটা ভাই।

তারপর টেকরাম মাধারকে বলল, অন্ধারবনমে চলো।

হঠাৎই ভোজবাজির মতো সূর্যটা গোখুরি পাহাড়ের আড়াল থেকে বাইরে এল। পুরো বন আলোয় ভরে গেল। ভটকাই হঠাৎ চিৎকার করে বলল, রোক্কে, রোক্কে।

বাবার কাছে শুনেছি আগেকার দিনের বাসের পাঞ্জাবি কন্ডাকটরেরা 'রোক্কে রোক্কে জেনানা হ্যায়' বলত ড্রাইভারকে। ভটকাই-এর রোক্কে শুনে মনে পড়ে গেল সে কথা।

আমরা ওর দিকে অবাক চোখে তাকাকেই ও বলল, দ্যাখো দ্যাখো ঋজুদা গ্রেট এগফ্লাই। কত্তগুলো!

আমরা দেখলাম, হালকা কালোর ওপরে সাদা ছোপ ছোপ একদল প্রজাপতি উড়ছে পথের ডানদিকে ঝোপের ওপরে।

ভটকাই গেয়ে উঠল "আজি প্রাতে সূর্য ওঠা-আ-আ সফল হলো কার।"

তিতির ওর গান শুনে হেসে ফেলল। বলল, সূর্যদেব বাংলা বুঝলে তোর গান শুনে লজ্জায় আবার পাহাড়ের আড়ালে চলে

যেতেন।

আমি বললাম, রবি ঠাকুরও বেঁচে থাকলে লজ্জাতে মরে যেতেন।

ভটকাই বলল, এখন তো কপিরাইট উঠে গেছে। তোরা এখনও গাইতে দিবি না আমাকে।

আমি বললাম গা না, যত খুশি গা। তবে বাথরুমে বা একা একা গা। আজকাল কে না রবীন্দ্রসঙ্গীত গাইছে আর ক্যাসেট করছে। রবীন্দ্রসঙ্গীতের ক্যাসেট বা সিডি করাটা তো একটা ব্যারামে দাঁড়িয়ে গেছে এখন। সকলেই মনে করে যে সে গাইয়ে। তোকেই বা ঠেকাচ্ছে কেডা?

আধঘণ্টার মধ্যে আমরা অন্ধারবনে পৌঁছে গেলাম। 'নিলয়' থেকে এক ঘণ্টার উপর লাগে। তবে গাড়ি তো খুব আস্তে আস্তে চলে।

দিনমানেও অন্ধারবন অন্ধকার। মাথার ওপরের পাতার চন্দ্রতপের ফাঁক-ফোকর দিয়ে যেটুকু আলো নিচে এসে পৌঁছচ্ছে সেটুকুই ভরসা। চারদিকে গভীর বাঁশের জঙ্গল। বাঁশফুল পড়ে আছে পথময়। আর বিরাট বিরাট আইন গাছ, তেন্দু গাছ, ধাওদা, বেহরা এবং সেগুন। এখানে একটা মহীরুহ আইন আছে যা মহারাষ্ট্রের দ্বিতীয় বৃহত্তম আইন। আমাদের মতো চারজন মানুষও দু'হাত প্রসারিত করে বেড় দিলেও তার পরিধিকে ঘিরতে পারবে না। আমরা সবাই নামলাম গাড়ি থেকে একে একে। দূর থেকেই দেখা গেল প্রজাপতির মেলা। কোনও প্রজাপতি ভেজা বালিতে মুখ ছুঁইয়ে জল খাচ্ছে উড়তে উড়তে, মুহূর্তের জন্যে বসছে আবার উড়ছে। কিছু আবার এমনিই উড়ে বেড়াচ্ছে নাচতে নাচতে।

ভটকাই বলল, ঈ-স, সব প্রজাপতি যদি চিনতাম। এবারে

www.boiRboi.blogspot.com

কলকাতা ফিরে একজন লপ্‌লপ্‌ডারটিস্ট-এর সঙ্গে যোগাযোগ করে সব শিখে নেব।

তিতির বলল, 'লপ্‌লপ্‌ডারটিস্ট নয়, লেপিডপটারিস্ট।

—ওই হল! মানে বুঝেছ তো। তাহলেই হল।

ঋজুদা বলল, জঙ্গলের মধ্যে তোরা অমন ঊর্ধ্বমুখী হয়ে চলিস না। ওই তো কয়েক বছর আগেই কানহা-তে একজন Keen Bird-watcher পাখি খুঁজতে খুঁজতে ঊর্ধ্বমুখ হয়ে বনের মধ্যে চলতে চলতে এক শুয়ে-থাকা বাঘের ঘাড়ে গিয়ে পড়েছিল।

—তারপর? বাঘের সঙ্গে কি ঘোড়া-ঘোড়া খেলল?

বাচাল ভটকাই বলল।

—খেলার সুযোগ আর পেল কই? বাঘ বিরক্ত হয়ে তাকে এক চাঁটি কষিয়ে দিল। আর বাঘের চাঁটি বলে কথা। ঘাড়সমেত মাথাটি বুকের ওপর নুয়ে এল বার্ড-ওয়াচারের। হাসপাতালে পৌঁছবার আগেই শেষ। দেখে চল।

জঙ্গল যেমন সুন্দর তেমনই ভয়াবহ। এই সৌন্দর্যর মধ্যেই বিপদ যে কোথায় লুকিয়ে থাকে কেউই বলতে পারে না এবং পারে না বলেই জঙ্গল এত ইন্টারেস্টিং।

ভাবছিলাম আমি।

ঋজুদা দাঁড়িয়ে পড়ে নীচু গলাতে ডাকল, টেকরাম ভাই।

টেকরাম আর ড্রাইভার সামনের সিটে বসে গুটখা খাচ্ছিল ভাগাভাগি করে। টেকরাম গুটকা মুখেই 'স্যার' বলে গাড়ির দরজা খুলে নেমে গেল।

ঋজুদা বলল, আমাদের আরেকবার বলো তো ঠিক কী কী ঘটেছিল এখানে গতকাল। সবকিছুই বলবে। কিছুই বাদ দেবে না।

টেকরাম বলল, এখানে পৌঁছবার পর হাতে প্রজাপতি ধরার

www.boiRboi.blogspot.com

ছাঁকনি নিয়ে সাহেব আর মেমসাহেব দুজনে দুদিকে চলে গেলেন।

—কে কোন দিকে?

—মেমসাহেব বাঁ-দিকে আর পোপোটলাল সাহেব ডানদিকে, যেদিকে বাঘ দেখার জন্যে পাহাড়ের গায়ে লোহার খাঁচা আছে। দুজনেরই অন্য হাতে বিয়ারের বোতল ছিল।

তারপর?

—তারপর ঘণ্টা তিনেক পরে মেমসাহেব আগে ফিরে এলেন। এসে, দুটি প্রজাপতি রাখলেন ফুটো ফুটো করা দুটি বাক্সে। মেমসাহেবকে খুব খুশি খুশি দেখাচ্ছিল। আমাদের কিছু বললেন, আমরা তো ভাষা বুঝি না। তবে একটা শব্দ ছিল হাংরি—সেটা মনে আছে।

—তারপর?

—তারপর মেমসাহেব আমাকে আর ড্রাইভারকে দুটি প্যাকেট দিলেন। ইঙ্গিতে বললেন খেতে।

—তোমাদের প্যাকেটগুলো তো ফুটো-ফুটো ছিল না, তুমি কাল বলেছিলে।

—না সাহেব ছিল না।

—তারপর?

—তারপর আমরা গাড়ির আড়ালে গিয়ে প্যাকেট খুলে খেতে লাগলাম।

—কী ছিল প্যাকেটে?

—আপেল, আঙুর, কলা, কাটা পাউরুটি তার মধ্যে শশা টম্যাটো আর মিষ্টি মিষ্টি ঝাল ঝাল লালরঙা কোনও জিনিস।

—মেমসাহেব খেলেন না?

—না। উনি পোপোটলাল সাহেব যেদিকে গেছিলেন সেদিকে

চলে গেলেন দুই বগলের তলায় দুটি করে চারটি বিয়ার নিয়ে। তারপর অতসব নিয়ে একা একা যেতে অসুবিধে হওয়ায় আমাকে বললেন সঙ্গে যেতে। আমি বিয়ারগুলো নিয়ে সঙ্গে চললাম।

—তারপর?

—আমরা যখন বাঘ দেখার লোহার খাঁচাটার কাছে পৌঁছলাম, দেখলাম পোপোটলাল সাহেব আসছেন জঙ্গলের গভীর থেকে। মেমসাহেব কী যেন জিজ্ঞেস করলেন সাহেবকে। পোপোটলাল সাহেব দুদিকে মাথা নেড়ে জানালেন, না। আমার মনে হল প্রজাপতি যে পাননি তাই জানালেন।

—তারপর?

—মেমসাহেব সাহেবকে দুটো বিয়ার দিলেন। তারপর একটা বড় পাথরে বসে দুজনেই বিয়ারের বোতল খুলে বিয়ার খেতে লাগলেন। আর গল্প করতে লাগলেন।

—সাহেব মেমসাহেবকে কিছু জিজ্ঞেস করেননি?

ঋজুদা জিজ্ঞেস করল টেকরাম মাধারকে।

টেকরাম বলল, করেছিলেন কিন্তু মেমসাহেব মনমরা হয়ে দুদিকে মাথা নেড়েছিলেন।

—মেমসাহেবকে দেখে তোমার যে খুশি খুশি মনে হয়েছিল, সেই খুশিটা কি পোপোটলাল সাহেবের সঙ্গে দেখা হওয়ার পরও ছিল?

—লক্ষ্য করিনি। খুব সম্ভব ছিল না। দুজনেই মনমরা হয়ে বসে বিয়ার খাচ্ছিলেন এবং ইংরেজিতে কথা বলছিলেন।

তারপর টেকরাম বলল, খুশিটা যে গায়েব হয়ে গেছিল তাতে আমি একটু অবাকই হয়েছিলাম।

—তারপর?

—তারপর আমি ফিরে এসেছিলাম গাড়িতে। প্রায় ঘণ্টাখানেক পর ওঁরা দুজনে গাড়ির কাছে ফিরে এলেন। পোপটলাল সাহেব একটা বড় পাথরে বসলেন, বসে আরও একটা বিয়ার খুললেন। সেই সময়ে মেমসাহেব খাবারের একটা প্যাকেট গাড়ি থেকে বের করে ওঁর পাশে রেখে আরেকটা প্যাকেট নিজে নিয়ে আমাদের চোখের আড়ালে, বাঁ-দিকে, যে দিকে উনি সকালে গেছিলেন সেদিকে চলে গেলেন বনের মধ্যে। সাহেবকে কী যেন বলে গেলেন ইংরেজিতে। কী বললেন, আমি বুঝিনি। পোপটলাল সাহেব মাথা নাড়লেন। তারপর ঐ বিয়ারটা শেষ করে নিশ্চয়ই খাবারের প্যাকেট খুলে খেতে লাগলেন। কখন খাওয়া শুরু করলেন আমরা দেখিনি কারণ আমাদের খাওয়া শেষ করেই আমি আর ড্রাইভার গাড়ির আড়ালে পাথরে বসে গুটখা খাচ্ছিলাম। সাহেবদের সামনে বসে খাওয়া বা গুটখা খাওয়াও বে-আদবী। কিছুক্ষণ বাদেই সাহেব হঠাৎ চিৎকার করে উঠে বললেন, মর গিয়া রে মর গিয়া। মুঝে বাঁচাও টেকরাম।

আমি আর ড্রাইভার দুজনেই যখন দৌড়ে ওঁর কাছে গিয়ে বললাম, ক্যা হুয়া সাব?

উনি বললেন, জানতা নেহি, কুছ দিখা ভি নেহি। মগর মুঝে জরুর সাপনে কাটা।

—কাঁহা গিয়া উও সাপ?

—ম্যায় কুছ দিখা নেহি। ম্যায় তো মরহি যাউঙ্গা। জলদি ওয়াপস চলো 'নিলয়' মে। হর্ন বাজাও। মেমসাব কো বোলাও।

তারপর বলল, জঙ্গলে তো হর্ন বাজানো মানা কিন্তু হর্ন বাজাবার আগেই দেখা গেল মেমসাহেব আসছেন।

—উনি এসে কী করলেন?

—সাহেবের সঙ্গে কী কথা বললেন জানি না। সাহেব বললেন

www.boiRboi.blogspot.com

গাড়ি ঘুমাও টেকরাম। জলদি করো।

ঋজুদা বলল, কাল তো পোপটলাল সাহেবের খাবার প্যাকেটটা আমরা এখান থেকে নিয়ে গেলাম কুড়িয়ে। তোমার ঠিক মনে আছে যে তোমাদের খাবার প্যাকেট আর সাহেবের খাবার প্যাকেটটা আলাদা রকম দেখতে ছিল?

—হ্যাঁ। পরিষ্কার মনে আছে। আমাদের দুজনের আর মেমসাহেবের প্যাকেটটাতেও ফুটো ফুটো ছিল না। তাছাড়া, সাহেবের প্যাকেটটাতে সেলোটেপও লাগানো ছিল।

ঋজুদা বলল, ঠিক আছে। তুমি গাড়িতে গিয়ে বসো আমরা পনেরো-কুড়ি মিনিটের মধ্যেই ফিরে আসছি। কারণ নটার মধ্যে আমাদের 'নিলয়'-এ ফিরতেই হবে।

—ঠিক হ্যায় সাব।

আমি, ঋজুদা আর সঞ্জীবকাকু বাঁ-দিকে আর তিতির আর ভটকাই ডানদিকে চলে গেল। ঋজুদা বলল, অস্বাভাবিক কিছু দেখলে, ওদের ব্যবহার করা কোনও জিনিস, বা কাগজপত্রও দেখতে পেলেও কুড়িয়ে আনবি। আর ঘড়ি দ্যাখ। ঠিক পঁচিশ মিনিট পর গাড়ির কাছে ফিরে আসবি।

ঠিক আছে। বলে, তিতির আর ভটকাই চলে গেল।

আমরা বাঁ-দিকে গেলাম। সঞ্জীবকাকু নিঃশব্দে ছবি তুলতে লাগলেন, গাছ-গাছালির, আমার আর ঋজুদার, প্রজাপতির, বাঁশফুলের। মিনিট দশেকও যায়নি আমার হঠাৎ চোখে পড়ল উলফেসহন মেমসাহেবের লাঞ্চ প্যাকেটটা একটি মস্ত বড় জামগাছের নীচে পড়ে আছে। সম্ভবত ঐ গাছের ছায়াতে বসেই উনি খাচ্ছিলেন। ঋজুদার ইঙ্গিতে আমি প্যাকেটটা তুলে নিলাম। তার ঢাকনিটা খোলা ছিল। আশ্চর্য হলাম দেখে যে, প্যাকেটটাতে খাবার

www.boiRboi.blogspot.com

ভর্তিই আছে। মেমসাহেব কিছুই খাননি।

আমরা যখন মেমসাহেবের লাঞ্চ প্যাকেট নিয়ে আলোচনা করছি ঠিক সেইসময়েই ভটকাই-এর চিৎকারে অন্ধারবন একেবারে গমগম করে উঠল। কোনও বিপদ হল কি ওদের?

ঋজুদা বলল, তুই দৌড়ে যা রুদ্র। আমরা আসছি।

আমি আমার টি-শার্টের নীচে বেল্ট-এর সঙ্গে বাঁধা পিস্তলের হোলস্টারটা খুলে পিস্তল হাতে নিয়ে দৌড়লাম কাঁটা ঝোপঝাড় ও পাথর মাড়িয়ে। যেখান থেকে ভটকাই-এর চিৎকার এসেছিল সে দিকটা আন্দাজ করে দৌড়লাম। আশ্চর্য! তিতিরের কোনও আওয়াজ নেই। কিছুটা দৌড়ে যেতে দেখলাম ভটকাই, বাঘ দেখার জন্যে যে লোহার হাইডটা আছে নীচের স্যাঁতসেঁতে দোলা থেকে পাঁচ মিটার মতো ওপরে পাহাড়ের গায়ে, যেখানে একটা বড় কালো পাথরের ওপর দাঁড়িয়ে আছে এক পায়ে, নাচের ভঙ্গিমাতে। সত্যি! ছেলেটা ভাঁড়ামিতে এক নম্বর।

—হয়েছে কী?

আমি গলা তুলে বললাম। ততক্ষণে দেখলাম, তিতিরও এদিকেই আসছে বনের গভীর থেকে।

ভটকাই বলল, মিস্টার শার্লক হোমস, কিছু হয়নি। কিন্তু হতে পারে।

হেঁয়ালি ছেড়ে খুলে বল।

মিস্টার ওয়াটসন কি বালখিল্য যে তুই যা বলবি তাই করবে। মিস্টার শার্লক হোমস সিনিয়র আসুন আগে তখন বলব।

—কী ইয়ার্কি করছিস?

—নো ইয়ার্কি। আই অ্যাম ডেড সিরিয়াস।

বলেই, দু কোমরে হাত দিয়ে গানের মতো করে আবৃত্তি করল

"সোনামণি সোনামণি দিনখন গণিগণি
সব তার দিয়ে যায় পাগলা
তোমা বিনে সবখানে একলা।"

—কার কথা বলছিস?

—সুন্দরীর। এলডা উঙ্গার।

এমন সময় ঋজুদা আর সঞ্জীবকাকুও এসে পড়লেন।

ভটকাই ঋজুদাকে অর্ডার করল। আপনাকে একটু কষ্ট করে এখানে উঠতে হবে মিস্টার ঋজু বোস।

তিতির আমাকে বলল, ভটকাইটা দিনে দিনে একটা ভাঁড় হয়ে উঠছে। ঋজুদা কিন্তু কোনও প্রতিবাদ না করে লক্ষ্মীছেলের মতো ওই প্রায় খাড়া পাহাড়ের গা-বেয়ে উঠে গেল ভটকাই-এর কাছে। ঋজুদা পৌঁছলে ভটকাই একপাক ট্যুইস্ট নেচে নিল একপায়েই—ডান পায়ে। আর বাঁ-পাটা শূন্যে দোলাতে লাগল।

ভটকাই বলল, এসেছ। এবারে দেখো।

বলেই, ওর ডান পাটা পাথর থেকে তুলল, তুলেই পাটা উঁচু করে ওর জুতো দিয়ে পাথরের ওপরে জোরে পদাঘাত করল।

ঋজুদা কিছুক্ষণ পাথরটার দিকে একদৃষ্টে চেয়ে থেকে বলল, গ্রে-এ-এ-ট।

তারপর বলল, কারও কাছে বড় রুমাল-টুমাল আছে?

সঞ্জীবকাকু বললেন, ক্যামেরা ঢেকে রাখার হলুদ ঝাড়ন আছে আমার কাছে।

আরে ওটা খুললে তোমার অত দামি ক্যামেরা ধুলো লেগে নষ্ট হয়ে যাবে। ভটকাই ওর গায়ের টি-শার্টটা খুলে ফেলে ঋজুদাকে দিল। বলল, বড়মামি কানাডা থেকে নিয়ে এসেছিল। নাও, ভালো কাজে লাগাও ।

www.boiRboi.blogspot.com

তারপরেই বলল, তুলি পা-টা? এতক্ষণে মরে গেছে নিশ্চয়ই।

বলেই, আস্তে করে ডান পাটা ওঠাল।

—দেখে যা তোরা।

ঋজুদা বলল। তোরা এসে দেখে যা। কেউই হাত ছোঁওয়াবি না।

আমরা সকলেই বেশ কষ্ট করে ওপরে উঠে লোহার খাঁটাচার পাশের পাথরের কাছে গিয়ে দেখলাম একটা মস্ত বিছে একেবারে চেপ্টে আছে পাথরের ওপরে।

আমি বললাম, যদি কামড়াত তোকে?

হাঃ। শ্রীলেদারের চামড়ার বুট। পুরো শরীরের ওজন সমেত বিছের ঘাড়ে চড়েছি ওই জুতো পরে। বাছাধন কি আর প্রাণে বাঁচে? সাপ হলেও তাকে নড়তে দিতাম না পায়ের তলা থেকে।

ঋজুদা বলল, ভটকাই হাত ছোঁয়াস না। মারাত্মক বিষাক্ত বিছে-এ। তুই তোর টি-শার্টটা ভাঁজ করে তার মধ্যে রুদ্র আর তিতির ঝোপ-ঝাড় থেকে পাতা ও সরু ডাল ছিঁড়ে ও ভেঙে নিয়ে এলে তাদের সাহায্যে টি-শার্টের মধ্যে তোল। রুদ্র সাহায্য কর ভটকাইকে।

ঋজুদা যেমন যেমন বলল, তেমনই করলাম।

ঋজুদা খুব খুশি খুশি গলাতে বলল, যা ভেবেছিলাম তাই হল। তবে Snag রয়ে গেল এখনও । সেসব পুলিশের দলবল সমাধান করুক। আজ বিকেল থেকেই শুধুই বনে বনে টহল দিয়ে বেড়াব আমরা, যা করতে এসেছিলাম। এত বড় বন। এখনও তো সব জায়গায় যাওয়াই হয়নি।

—কাল সকালে কিন্তু কাপালাদেও-এর মন্দিরে যেতে হবে। নইলে অকৃতজ্ঞতা হবে।

তিতির বলল।

—কথাটা মন্দ বলিসনি। ঋজুদা বলল।

আমি বললাম, যদি পোপোটলাল সাহেবকে বিছেতে কামড়ে থাকে তবে ভটকাই যেটাকে শিকার করল সেটাই কি এই বিছে?

—হতে পারে। আবার নাও হতে পারে। পোপোটলাল সাহেবকে আসলে কিসে কামড়েছে সেটা যতক্ষণ না জানা যাচ্ছে ততক্ষণ সবাই Surmise মাত্র।

'নিলয়'-এ ফেরার পথে সঞ্জীবকাকু ভটকাইকে জিগগেস করেছিলেন, তুমি যে হাফ-গান আর হাফ-কবিতা শোনালে ট্যুইস্ট নাচতে নাচতে তা কি তোমারই রচনা?

—না, আমার নয়। আমারই বলে বাহাদুরি নিতে পারতাম কিন্তু আমি রুদ্রর মত গুণ-চোর নই। এ এক নাম-না-জানা প্রেমিক তার নাম-না-জানা (মানে আমাদেরও অজানা) প্রেমিকার উদ্দেশ্যে প্রেমিকার জন্মদিনে এই বিজ্ঞাপনটা ৮/৫/২০০০-এ আনন্দবাজারে দিয়েছিল। দারুণ লাগাতে, আমি মুখস্থ করে রেখেছিলাম। সেটা তখন হঠাৎ-ই মনে পড়ে গেল।

—তুই একটা জিনিয়াস! ঋজুদা বলল।

ভটকাই বলল, তোমার মাথা-মোটা চ্যালাদের সে কথাটা বলো। তারা তো আমাকে মানুষ বলেই গণ্য করে না।

তিতির বলল, আরেকবার বলবে ভটকাই কবিতাটা?

ভটকাই বলল :

"সোনামণি সোনামণি দিনক্ষণ গণিগণি
সব তার দিয়ে যায় পাগলা
তোমা বিনে সবখানে একলা।"

আমরা সবাই হেসে উঠলাম। এমনকি ঋজুদাও।

ঋজুদা বলল, তোরা হাসছিস কিন্তু বিজ্ঞাপনদাতার দুঃখটা তোরা কেউই বুঝলি না?

www.boiRboi.blogspot.com

আমি বললাম, বুঝলাম বইকি। যে দুঃখ তার একার ছিল তা আমাদের সকলের হয়ে গেল। এর চেয়ে বড় প্রাপ্তি ওঁর আর কি হতে পারত!

আমরা যখন নিলয়ের কাছাকাছি পৌঁছে গেছি চোরখামারা রোড দিয়ে এগোচ্ছি নিলয়ের দিকে, ঋজুদা বলল, এবার একবার যোগাযোগ করো তো প্রদীপের সঙ্গে তোমার মোবাইলে—জানা যাক সে এখন কোথায় এবং ওদিককার খবর কী?

সঞ্জীবদার এবং ঋজুদারও মোবাইল এতক্ষণ অফ্‌ফ্‌ করা ছিল। সঞ্জীবদা বোতাম টিপেই বললেন, হ্যাঁ। তুমি এখন কোথায় প্রদীপ?

—সাকোলিতে?

—তবে তো কাছাকাছি পৌঁছে গেছ। ওদিকের খবর কী?

—খারাপ।

—কেন?

—ওই যে জার্মান রুডল্ফ উইধাস, ও এক বিরাট চক্রের সঙ্গে জড়িত এবং স্টেফি উলফেসহনও এই চক্রে আছে। শুধু প্রজাপতিই নয়, ভারতবর্ষ থেকে আরও নানা জিনিস তারা পাচার করছে বহুদিন হল। এখান থেকে বাংলাদেশে পাঠায় আর সেখান থেকে সারা পৃথিবীতে। ওকেও অ্যারেস্ট করেছে পুলিশ।

—কাকে?

—রুডল্ফ উইধাসকে। পুলিশ নাকি অনেক দিন থেকেই ওর ওপরে নজর রেখেছিল—এই প্রজাপতির ব্যাপারটা আর পোপোটলাল সাহেব আর এলডা উঙ্গারের আশ্চর্য অসুস্থতাতে পুলিশের সন্দেহ ঘনীভূত হয়েছে। ওদের দুজনেকেই আজ কোর্টে প্রডিউস করবে পুলিশ তারপর তাদের কাস্টডিতে দীর্ঘদিন রেখে জিজ্ঞাসাবাদ করার অনুমতি চাইবে কোর্টের কাছে। সব কাগজে আজ

খবর বেরিয়ে গেছে। টিভি'তেও কভার করছেই।

—ওঁরা আছেন কেমন?

কী আর বলব! এলডা উঙ্গার ভোর চারটেতে মারা গেছেন। পোপোটলাল সাহেব লড়াই করছেন মৃত্যুর সঙ্গে। তাগড়া মানুষ তো। তবে কতক্ষণ যে লড়তে পারবেন তা বোঝা যাচ্ছে না। ডাক্তারেরা বলছেন, ইন্টারন্যাল ব্লিডিং হচ্ছে নানা জায়গা থেকে এবং কিডনিও ফেইল করে গেছে।

—ইসস্‌স্‌। সঞ্জীবদা বললেন।

—ওপাশ থেকে, মানে গোন্দিয়া বা সাকোলি থেকে পুলিশ অফিসার আর বনবিভাগের ওঁরা আসেননি?

—আমরা এখনও 'নিলয়' থেকে দু' কিমি মতো দূরে আছি। পৌঁছলেই জানতে পারব।

—তোমরা সবাই ভালো আছ তো? তোমাদের কারওকে কিছু কামড়ায়নি তো?

—না। আমরা ভালোই আছি। ভটকাই কামড়েছে।

—ভটকাইকে কামড়েছে। কী বলছ কী?

—আরে না না। ভটকাই কামড়েছে। তুমি এসো, সব বলব।

—ঠিক আছে ঋজুদাকে সব বলে দিও।

ঋজুদা এমনিই শুনতে পারছেন সব। তুমি বাসর ঘরের নতুন বরের মতো ফিসফিসিয়ে কথা তো কইছ না।

—ঠিক আছে।

বলে, প্রদীপকাকু মোবইল অফ্‌ফ্‌ করে দিলেন।

নিলয়ের গেট দিয়ে ভিতরে ঢুকতেই দেখি চার-পাঁচটি জিপ এবং একটি ভ্যান। সবই খাঁকি আর অলিভগ্রিন রঙের। খাঁকিগুলো পুলিশের আর অলিভগ্রিনগুলো বনবিভাগের।

ওঁরা সবাই বসার ঘরে বসেছিলেন। ঋজুদা আর আমরা ঢুকতেই উঠে দাঁড়ালেন।

ঋজুদা সকলকে বসতে বলল। সকলে বসলে, বলল আপনারা তো সব শুনেইছেন।

—সব শুনিনি, কিছুটা শুনেছি।

আপনাদের এখানে ডেকে কষ্ট দেবার কারণ আপনাদের হাতে কিছু ভাইটাল প্রমাণ আমরা তুলে দেব।

আমি গিয়ে এলডা উঙ্গার-এর লাঞ্চ বক্সটা নিয়ে এলাম আমার ঘর থেকে। ভটকাই, পোপোটলাল সাহেব এবং স্টেফি উলফেসহন-এর প্যাকেটটাও দিল ওঁদের।

বাক্সগুলোর মধ্যে তফাত কী কী, বাইরের তফাত এবং ভিতরের তফাত তা বুঝিয়ে দিল ঋজুদা। বলল, স্টেফি যে বাক্স থেকে কিছুমাত্র খায়নি তা থেকে অনুমান করা যায় যে তিনি খাবেন বলে বা অন্য কোনও কারণে অন্যদের চোখের আড়াল যাননি—গেছিলেন হয়তো পোপোটলাল সাহেবের থেকে দূরে যেতেই। যখন পোপোটলাল সাহেব আক্রান্ত হবেন তখন তাঁর কাছে না থাকতে। অন্যর সন্দেহ এড়াবার জন্যেই হয়তো এমন করেছিলেন।

ওঁদের সঙ্গে ডেপুটি কনজার্ভেটর অফ ফরেস্টস মিস্টার ইয়াটবোনেও ছিলেন। উনি মেঘালয়ের মানুষ, প্রদীপকাকু বলেছিলেন। গোন্দিয়া থেকে পুলিশের ডি এস পি মিঃ সালগাঁওকারও এসেছেন তাঁর কন্টিনজেন্ট নিয়ে।

ঋজুদা মিস্টার ইয়াটবোনকে জিজ্ঞেস করল, আপনাদের এই নাগজিরাতে ট্যারান্টুলা কি আছে?

—আমি যতদিন নাগজিরার চার্জ-এ আছি কোনও কেস পাইনি। তবে আগে কখনও ছিল কিনা বলতে পারব না। নাগজিরার বয়স তো

www.boiRboi.blogspot.com

অনেক—তাছাড়া এই দেড়শো বর্গকিমির বেশি এলাকার মধ্যে মাকড়সার মতো ছোট প্রাণী আছে কী নেই তা বলা মুশকিল। প্রজাপতি নিয়ে আমরা ইনটেনসিভ স্টাডি করেছি, এখন মনে হচ্ছে Spiders and Scorpions এর ওপরেও একটা ইনটেনসিভ স্টাডি করা দরকার। তবে প্রজাপতিতো নাগজিরার স্ট্রং পয়েন্ট। সারা পৃথিবী থেকে লেপিডপটারিস্টরা সারা বছরই এখানে আসেন—তাই আমাদের গরজেই ওই স্টাডি করা হয়েছিল।

তারপর উনি বললেন, কেন? আপনার কি মনে হয় ওঁদের দু'জনকে ট্যারাণ্টুলা কামড়েছে?

ঋজুদা বলল, শুধুমাত্র ট্যরাণ্টুলা নয়, ব্ল্যাক উইডো আর ব্রাউন স্পাইডারও কামড়াতে পারে। কিন্তু এলডা উঙ্গার এবং মিস্টার পোপোটলাল-এর লাঞ্চের প্যাকেটের ভিতরটা ম্যাগনিফাইং গ্লাস দিয়ে খুব ভালো করে দেখেও কোনও রোঁয়া বা আঁশ খুঁজে পাইনি। বাক্সর মধ্যে কোনও মাকড়সা থাকলে-দু একটি রোঁয়াও অন্তত বাক্সে লেগে থাকার কথা ছিল। তবু বাক্স দুটো তো দিয়েই দিচ্ছি, মিস্টার সালগাঁওকার স্কুল অফ ট্রপিকাল মেডিসিন এবং ফরেনসিক ল্যাবরেটরিতে নিয়ে ভালো করে পরীক্ষা করান।

—স্পাইডার না হলে আর কী হতে পারে?

সালগাঁওকার সাহেব বললেন।

—বাই প্রসেস অফ এলিমিনেশন বের করতে হবে বাক্সের মধ্যে কী ছিল? সাপও থেকে থাকতে পারে।

ঋজুদা জানাল।

তারপরই বলল, আমার অনুমান ভুলও হতে পারে। যে প্রাণীর কামড়ে ওঁদের এই অবস্থা তারা যে লাঞ্চ প্যাকেটের মধ্যেই ছিল এটা আমার অনুমান। তা পুরোপুরিই ভুলও হতে পারে। আপনারা

www.boiRboi.blogspot.com

ফরেনসিক ল্যাবরেটরিতে নিয়ে গিয়ে পরীক্ষা করে দেখুন। তাছাড়া আরেকটা রহস্য হল, যাঁদের কামড়াল তাঁরা সেই জীবকে দেখতেই পেলেন না!

সালগাঁওকার সাহেব বললেন, স্পাইডার না হলে আর কী হতে পারে আপনার মতে? তারা বাক্সের মধ্যেই ছিল কি না তা পরে দেখা যাবে।

ঋজুদা বলল, খুব বিষাক্ত ছোট সাপও হতে পারে। বিছেও হতে পারে।

মিস্টার ইয়াটবোন বললেন, বিছের কামড় এমন মারাত্মক হতে পারে? নাগপুর থেকে যা শুনলাম তাতে তো দেখছি এ প্রাণী বাঘেদের চেয়েও ভয়ংকর।

ঋজুদা বলল, ব্রাউন স্পাইডার মাকড়সার বিষ সাইকোটক্সিক, হেমোলিটিক এবং অন্যান্য রকমের হয়। তার কামড়েও মানুষের মৃত্যু হয় মাঝে মাঝে। আর ব্ল্যাক উইডোর কামড়ে চার শতাংশ-র মতো মানুষের মৃত্যু হয়। ট্যারাণ্টুলার বিষ নানারকমের হতে পারে এবং সাধারণত মৃদু হয়। এরা দেখতে ভয়াবহ বলেই মানুষ এদের মাত্রাতিরিক্ত ভয় পায়। তাদের কামড়ে Localised effect হয়। খুব কম ক্ষেত্রেই মানুষ মারা যায় এবং যন্ত্রণাও অন্য মাকড়সার কামড়ের চেয়ে কম হয়। তাছাড়া, উত্তর আমেরিকা, মেক্সিকো, মধ্য আমেরিকাতে ট্যারাণ্টুলার যেসব স্পিসিস পাওয়া যায় তাদের নির্বিষই বলা চলে। ভারতের মতো ট্রপিকাল কান্ট্রিতে ওগুলো আকারেও অনেক বড় হয় এবং বিষও বেশি হয়। তবে বললামই তো, ট্যারাণ্টুলার কামড়ে মানুষের মৃত্যু খুব কমই হয়।

সালগাঁওকার বললেন, তাহলে বাকি রইল আর কী কী? আমাদের নাগজিরার ইতিহাসে আজ অবধি কোনও ট্যুরিস্টকেই

মাকড়সা, বিছে বা সাপ কামড়ায়নি। কামড়ালে আমাদের বদনাম হয়ে যেত।

তারপর বললেন, এই কেস-এ একমাত্র বাকি রইল সাপ। তার তো শেষ নেই। আর বিছে। বিছেরও নানা স্পেসিস হয়—সেন্টুরোডস, টিটিয়ার্স, লিউরাস। হয়তো আরও স্পেসিস আছে। ওদের বিষ নিউরোটক্সিক, কারডিওটক্সিক, হোমোলিটিক, লেসিথিনাস, ইত্যাদি। এদের কামড়ে যে সব উপসর্গ দেখা দেয় তার সঙ্গে পোপোটলাল সাহেব আর এলডা উঙ্গারের উপসর্গ মিলে যাচ্ছে। নিঃশ্বাস নিতে কষ্ট হয়, ফুলে ওঠে শরীর, তীব্র যন্ত্রণা হয়, ঘাম হয়, অস্থির অস্থির করে শরীর, লালা বেরোতে থাকে মুখ দিয়ে, বিভ্রান্ত করে দেয় কষ্টতে, বমি হয়, বুকে ব্যথা হয়, শরীর অসাড় হয়ে যায় এবং অবশেষে মৃত্যু হয়।

—আপনার কী মনে হয় মিস্টার বোস?

—আমার কিছুই মনে হয় না। অস্পষ্ট অনুমানই করতে পারি শুধু এই পর্যায়ে। তবে একটা ইন্টারেস্টিং ঘটনা হচ্ছে এই যে আজই সকালে আমরা আন্ধারবনে গেছিলাম—যেখানে পোপোটলাল সাহেব অসুস্থ হয়ে পড়েন—সেখানের অনতিদূরে একটি Scorpion দেখতে পায় ও জুতোর নীচে পিষে মারে আমার চেলা এই ভটকাই।

ভটকাইকে সবাই কনগ্র্যাচুলেট করলেন।

ঋজুদা বলল, এবার আন তোর শিকার।

ভটকাই দু'হাতে ওর টি-শার্টটা ধরে নিয়ে এল।

ঋজুদা বলল, রুদ্র দ্যাখ না, প্রদীপ তো নাগপুর থেকে কেক-বিস্কুট অনেক এনেছিল, একটা বাক্স-টাক্স পাওয়া যায় না?

টি-শার্টের ভাঁজটা খুলে ভটকাই বিছেটাকে দেখাল সবাইকে। সকলেই বিস্ফারিত চোখে চেয়ে রইলেন।

www.boiRboi.blogspot.com

ঋজুদা বলল, এটা নিয়ে যান নাগপুরে। ফরেনসিক ল্যাবরেটরিতে বা ট্রপিকাল মেডিসিনের ল্যাবরেটরিতে কাজে লাগবে।

তারপরই বলল, শুনেছেন তো এস এস উঙ্গার মারা গেছেন ভোর চারটেতে এবং পোপটলাল সাহেব লড়ছেন মৃত্যুর সঙ্গে। উনি যদি বেঁচে ওঠেন তবে তাঁর জবানবন্দি পেলেই আপনাদের কাজ সহজ হয়ে যাবে। এস এস উঙ্গারের পোস্ট মর্টেম রিপোর্টও সাহায্য করবে আপনাদের। আমার দ্বারা যতটুকু সাহায্য হয় তা নিশ্চয় করব কিন্তু যেসব টুকরো টুকরো তথ্য আপনারা পেলেন তাই আনওয়াইল্ড করে আপনাদের সত্যে পৌঁছতে হবে।

এমন সময়ে প্রদীপকাকুর গাড়ি ঢুকল এসে 'নিলয়'-এর হাতাতে। প্রদীপকাকু গাড়ি থেকে নেমে বসার ঘরে ঢুকে বলল, খুবই দুঃখের খবর, পোপোটলাল সাহেব একটু আগেই মারা গেলেন।

ঋজুদার চোয়াল দুটো শক্ত হয়ে এল। ঋজুদা ওঁদের দিকে ফিরে বললেন, তথ্য সাবুদ সব সংগ্রহ করে কেসটা আপনাদের এমন করে সাজাতে হবে যাতে খুনি শাস্তি পায়ই। বিছে কামড়ে থাকুক আর মাকড়সা কিংবা সাপ, তা তো জার্মানি থেকে সঙ্গে করে নিয়ে আসেনি স্টেফি। এখানেই কেউ ওকে সাপ্লাই করেছিল। এবং রুডল্ফ উইধাস বা তার লোকজনই যে তা করেনি সে বিষয়ে আদৌ নিশ্চিত নই আমি।

তারপর একটু চুপ করে মাথা নিচু করে বসে থেকে বলল, চৈনিক দার্শনিক কনফ্যুসিয়াস বলেছিলেন, "If you pay evil with good what do you pay good with?" ওদের কঠোর শাস্তি যাতে হয় তাই দেখুন, এমনকি মৃত্যুদণ্ডও। তারপরই বললেন, মৃত্যুদণ্ডর চেয়ে যাবজ্জীবন কারাদণ্ড একদিকে দিয়ে ভালো। আজীবন শারীরিক

পরিশ্রমের সঙ্গে মনে মনেও জ্বলতে হবে তাকে। ফাঁসিতে ঝুললে তো তার সব যন্ত্রণার শেষই হয়ে গেল।

বনবিভাগের মিশরিকোটকার সাহেব ধরা গলাতে বললেন, পোপোটলালকে আমি চিনতাম। ভারী ভালো আর হাসিখুশি মানুষ ছিল সে।

ঋজুদা ওঁকে বলল, যেসব প্রজাপতি স্টেফি ধরেছে তার মধ্যে কী কী আছে তা নাগপুরে নিয়ে গিয়ে ভালো করে দেখুন। নাগপুরে তো বহু নামী নামী লেপিডপটারিস্ট আছেন।

—হ্যাঁ। তা তো দেখতেই হবে।

—ওয়াইল্ড প্রোকেটশন অ্যাক্ট ভায়োলেট করার জন্য তো ক' বছরের জেল হতে পারে—যাবজ্জীবন কারাদণ্ড বা ফাঁসিতো হবে না। মানুষ খুন করার অপরাধে ওকে এবং ওর সহকারীদের ফ্রেম করতে হবে আপনাদের।

—সে তো ঠিক কথাই।

তারপরে সালগাঁওকার সাহেব বললেন, আমরা তাহলে উঠি এখন। অনেক কাজ।

ঋজুদা বললেন, উঠবেন কি? এক কাপ করে চা খেয়ে যান, আজকের হিরো ভটকাই-ই বানিয়ে দেবে।

মিশরিকোটকার সাহেব বললেন, কেন? চৌকিদার আপনাদের সেবা করছে না?

—করছে করছে।

এখন চা খাওয়ার মুড নেই। আমরা কেউ-ই তো নাস্তা করিনি। সাকোলিতে গিয়েই হালুইকরের দোকানে যা হয় খেয়ে নেব।

ঋজুদা বলল, যাওয়ার আগে আপনাদের উইটনেসদের নাম নোট করে নিন। তাদের প্রত্যেককে ইন্টারোগেট করতে হবে

www.boiRboi.blogspot.com

আপনাদের। সাক্ষী হিসাবে কোর্টে প্রডিউস করাতে হবে। নইলে আপনারা দোষীদের শাস্তি দিতে পারবেন না।

তারপর বলল, এক নম্বার নিলয়ের চৌকিদার, দু নম্বর উলফেসহনদের টাটা সুমোর ড্রাইভার।

বলেই বলল, গাড়িটার নাম্বার কী ছিল প্রদীপ?

প্রদীপকাকু নাম্বার এবং ড্রাইভারের নাম বলে দিলেন। ভাড়া গাড়ি—গাড়ির মালিকের নাম ও ঠিকানাও বললেন।

সালগাঁওকার সাহেব বললেন, বাঃ।

ঋজুদা বলল, তারপর ওদের গাড়ির গাইড টেকরাম মাধার।

—থ্যাঙ্ক উ্য। বললেন সালগাঁওকার সাহেব।

তারপর বললেন, আপনাদের সঙ্গে যোগাযোগ কী করে রাখা যাবে।

আগামী তিন-চারদিন বোধহয় যাবে না। এখানে তা ইলেকট্রিসিটি নেই, আমাদের মোবাইলগুলো কাজ করছে না। প্রদীপেরটা হয়তো করবে একদিন। কারণ নাগপুর থেকে চার্জ করিয়ে এনেছে।

তাহলে?

আমরা আগামী শনিবার দুপুরে ওয়ার্ধা রোড-এ 'নীরির' গেস্ট হাউসে গিয়ে পৌঁছাব। মিস্টার তপন চক্রবর্তী ডিরেক্টরকেও খবর দিয়ে রাখতে পারেন।

তারপর বলল, আমার সাহায্যর আর কি দরকার? সবই তো গুছিয়ে দিলাম। এখন আপনারা তা থেকে প্রকৃত ঘটনা আর ঘটনার পেছনে যাঁরা আছেন তাঁদের নিয়ে পড়ুন। দু-জন নিরপরাধ, ভালোমানুষ এমনভাবে খুন হয়ে যাবে তা তো হতে পারে না।

তারপর বলল, বিছেটার স্পেসিসটা ঠিক কী তা কিন্তু আমাকে

জানাবেন পরে। তবে ঐ বিছেটাই মানে যেটা ভটকাই মারল, সেটাই যে পোপোটলাল সাহেবকে কামড়েছিল সে সম্বন্ধে আমি এখনও নিঃসন্দেহ নই। গভীরে গিয়ে ফরেনসিক ল্যাবরেটরি এবং ট্রপিকাল মেডিসিনের ল্যাবরেটরিতে গুণী বিজ্ঞানীরা আসল সত্যে অবশ্যই পৌঁছবেন।

ওঁরা সকলেই উঠে দাঁড়ালেন। ঋজুদাকে অসংখ্য ধন্যবাদ দিলেন। বললেন, নাগজিরাতে বেড়াতে তো প্রতি বছর কত ট্যুরিস্টই আসেন কিন্তু এমন অকলদার ওয়েল-ইনফর্মড ট্যুরিস্ট কজন?

ইয়াটবোনে সাহেব বললেন, মজুমদার সাহেবের পি এ'র কাছ থেকে আপনার সম্বন্ধে সব খবরই পেয়েছি আমি। উই আর লাকি টু হ্যাভ উ্য অ্যাট নাগজিরা।

ভটকাই হঠাৎ ফটাস করে ইয়াটবোনে সাহেবকে বলল, উই উড লাইক টু ভিজিট কাপালাদেও টেম্পল টুমরো। ক্যুড উ্য প্লিজ হেল্প আস?

উনি বললেন, বাই অল মিন্‌স। আমি দুজন ফরেস্ট গার্ড আর দু'জন গানম্যান পাঠিয়ে দেব আপনাদের এসকর্ট করে নিয়ে যাবার জন্যে। তবে সকাল সকাল বেরোবেন আর খাবার-দাবার জল সব নিয়ে যাবেন। ওখানেও চালে-ডালে খিচুড়ি বানিয়ে খেতে পারেন। গাড়ি যতদূর যাবে নিয়ে যাবেন তারপর হেঁটে চড়তে হবে গোখুরি পাহাড়ের চূড়াতে। বেশ অনেকখানি।

ভটকাই বলল, সেটাই তো মজা। ট্রেকিং না করলে আর কী হল!

—ভালো। ভালো। যান। এত সব বাজে ব্যাপার ঘটে গেল, 'দেও'য়ের কাছে পুজো দেওয়াটা ভালো—যাতে যে ক'দিন আর আছেন নির্বিঘ্নে কাটাতে পারেন।

ওঁরা চলে গেলে তিতির ভটকাইকে বলল, ভটকাই, তুমি কি

কনভার্সেশানাল ইংলিশের ক্লাস করছ নাকি আজকাল? দারুণ ইংরেজি বলছ তো!

ভটকাই একটু মিচকি হেসে বলল, আমার এক দাদু এমন ইংরেজি বলতেন যে সাহেবরা পর্যন্ত বুঝতে পারত না।

—তোর কোন দাদু?

—আমি চেপে ধরলাম ওকে।

বলল, বাবার বড় জ্যাঠামশায়। বুঝলি না! It runs in the blood.

আমরা হেসে উঠলাম।

তারপর ভটকাই বলল, আজ চিঁড়ের পোলাও টোলাও থাক ঋজুদা। মনটাই খারাপ হয়ে গেল ওঁদের মৃত্যুসংবাদে।

ঋজুদা বলল, আমিই কথাটা বলব ভাবছিলাম। খুব খুশি হলাম তুই নিজেই কথাটা বললি বলে। তোরা ম্যাচিওর্‌ড হচ্ছিস।

আমি বললাম, আমরা আজ ব্রেকফাস্ট স্কিপ করব সুন্দরী মেমসাহেব আর পোপোটলাল সাহেবের প্রতি শ্রদ্ধা জানাতে।

তিতির বলল, তোমার কবিতাটি প্রদীপকাকুকে একবার শুনিয়ে দাও ভটকাই।

—আমার নিজের লেখা তো নয়।

—সে যারই হোক, বল না।

ভটকাই তোতা পাখির মতো, গান গাওয়ার মতো বলল,

"সোনামণি সোনামণি দিনক্ষণ গণিগণি
সব তার দিয়ে যায় পাগলা
তোমা বিনা সবখানে একলা।"

প্রদীপকাকু কবিতা শুনে হেসে উঠলেন।

ঋজুদা বলল, প্রদীপকাকুকে, প্রদীপ তুমি নাগপুরে ওঁদের

www.boiRboi.blogspot.com

সকলকে জানিয়ে দাও যে আমাদের এখানে যেন কেউ আর যোগাযোগ না করেন। যা ঘটার তা তো ঘটেই গেছে। এলডা উঙ্গার আর পোপোটলাল সাহেব তো চলেই গেছেন। এখন ওঁরা সবরকম তদন্ত করুন, রুডল্ফ উইধাস এবং ভটকাই-এর দাঁড়কাককে গ্রিল করুন।—কী ওঁদের দু'জনকে কামড়েছিল তা নিয়ে গবেষণা করুন ল্যাব-এ। আমাদের আর তো কিছু করার নেই। আর ওঁদের তদন্তের ফল কী হল তা জানা ছাড়া আমাদের এই অঘটনে আর কোনওভাবেই জড়ানোর মানে হয় না। আমার এই তিন চেলা ও চামুণ্ডি আমার ওপর এমনিতেই খেপে থাকে ও আছে...

—কেন?

প্রদীপকাকু বললেন।

আরে যেখানেই নির্ভেজাল ছুটি কাটাতে যাই ওদের নিয়ে সেখানেই একটা না একটা ঝামেলাতে ফেঁসে যাই। ওদের বেড়াতে আসাটাই মাটি হয়। সাতদিনের একদিন কাটল নভেগাঁওতে, আর নাগজিরাতে দু'দিন কাটল ওই প্রজাপতিওয়ালাদের নিয়ে। বাকি তিনদিন আমরা শুধুই নাগজিরার রন্ধ্রে রন্ধ্রে চষে বেড়াব। বেড়াবার মতো জায়গাও বটে। এত Games খুব কম বনেই আছে। ফেরার আগের দিনটাত নাগপুরেই কাটবে।

আগামীকালও তো হোল-ডে কাপালদেও-এর মন্দিরে যাওয়া-আসাতে কাটবে।

সঞ্জীবকাকু বললেন।

তিতির বলল, তা কাটুক। সেটা একটা দারুণ এক্সপিরিয়েন্স হবে—পুণ্য করা ছাড়াও।

—তা ঠিক। ঋজুদা বলল।

—আজকে তো আমরা ব্রেকফাস্ট খাচ্ছি না। খেতে কারও

ইচ্ছেও করছে না। চা বানাই? এককাপ করে চা খেয়ে একে একে সবাই চানে যাই। দেরি করলে জল গিজারের জলের মতো গরম হয়ে যাবে।

ভটকাই বলল।

—তা যা বলেছিস।

ঋজুদা বলল।

সকলের চা খাওয়া হলে ভটকাইকে আমি বললাম, তুই আগে যা ভটকাই। তোর হলে, আমি যাব।

সকলেই প্রায় চলে গেল চানে, একে একে। প্রদীপকাকু আর সঞ্জীবকাকু গেলেন লগ-হাট-এ। গাড়ি নিয়ে।

তিতির বলল, আজ ক্যান্টিনে গিয়ে রাজাকে ব্রেকফাস্ট খাওয়ানো হল না।

দুপুরে যখন ক্যান্টিনেই ভেজিটারিয়ান থালি খেতে যাব আমরা, তখনই খাইও।

—সেটা ভালো বলেছ। আজ আমরা সবাই নিরামিষ খাব।

—এখানে তো আমিষ খাওয়াই বারণ।

ভটকাই বলল।

—ও তাই তো! ভুলেই গেছিলাম।

সকলে চলে গেলে আমি একা বসে সামনের সুনসান হ্রদের দিকে চেয়ে চলে-যাওয়া ওঁদের দুজনের কথা ভাবছিলাম। হ্রদের কাছে এখন একটিও জানোয়ার নেই, বেলা পড়লে এসে জমবে একে একে। পাখিরাও গিয়ে বসেছে ঘন পাতার আড়ালে। পোপোটলালের সাহেব আর পরমাসুন্দরী এলডা উঙ্গারকে দাঁড়কাক স্টেফি উলফেসহন কোথায় পাঠালো কে জানে! মানুষের লোভ, মানুষের যশাকাঙ্ক্ষা মানুষকে যে কত নীচে নামাতে পারে দাঁড়কাকই তার

www.boiRboi.blogspot.com

প্রকৃষ্ট উদাহরণ। যশাকাঙ্ক্ষার মতো অপযশের জিনিস হয়তো আর কিছুই হতে পারে না। বিশেষ করে. সেই যশাকাঙ্ক্ষা যদি কোনও অনধিকারীর হয়। আজকাল জীবনের সব ক্ষেত্রেই অনধিকারীদেরই ভিড়। গুণীরা নিজের ঘরে মুখ লুকিয়ে থাকেন আর নির্গুণেরা মেদিনী দাপিয়ে বেড়াচ্ছে চরম নির্লজ্জতাতে। ঋজুদা এ কথা সবসময়েই বলে। বলে, ইকনমিক্স-এর গ্রেশাম সাহেবের ম্যাক্সিম এখন জীবনের সব ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য "Bad money drives away good money."

ভটকাই পাকার মত বলে উঠল, হবে না? এমনটাই তো হবে! এখন যে ঘোর কলি!

www.boiRboi.blogspot.com

যমদুয়ারে

কী নাম রে বাবা। যমদুয়ার!

ভটকাই বলল।

যেমন জায়গা তার যোগ্য নাম।

ঋজুদা বলল।

জায়গাটা কোন রাজ্যে?

রাজ্য মানে? STATE বলছিস?

হ্যাঁ।

জায়গাটা দুই রাজ্য আর এক অন্য দেশের সংযোগস্থলে।

তিতির বলল, কীরকম?

পশ্চিমবঙ্গ, আসাম এবং ভুটানের সীমান্তে যমদুয়ার। প্রথমবার যমদুয়ারে যাই জেঠুমণির সঙ্গে। তখন আমি স্কুলে পড়ি। সে এক অভিজ্ঞতা।

কী অভিজ্ঞতা বলো না?

www.boiRboi.blogspot.com

আমি বললাম।

সে বলব'খন যমদুয়ারে পৌঁছে।

তারপর বলল ভুটানের মহারাজারও প্রিয় জায়গা যমদুয়ার। তিনি কখনও কখনও হেলিকপ্টারে করে থিম্পু থেকে এসে যমদুয়ারে কাঠের দোতলা বাংলোর সামনের মাঠে নামেন। তাঁবু পড়ে যায় অনেক। মহারাজা বলে কথা, এ ডি সি, বেয়ারা, বাবুর্চি, গান-বেয়ারার মিলে অনেকেই মানুষ। নিজে হেলিকপ্টার থেকে নামার আগে তাদের মধ্যে অনেকেই হাঁটাপথে পাহাড় থেকে নেমে আসে। এসে মহারাজের জন্যে সব বন্দোবস্ত করে রাখে। অপেক্ষাতে থাকে। ফুন্টসোলিং থেকে আসে জিপ, বেয়ারা, নাপিত, গান-বেয়ারার, বাবুর্চি। তাঁবু গেড়ে থাকে তারা। সঙ্গে আসে নানা খাদ্য পানীয়। বন্দুক-রাইফেল।

এখনও আসেন মহারাজা?

এখন আসেন কিনা বলতে পারব না কিন্তু আগে প্রায়ই আসতেন। এখনও ভুটান থেকে নানা মানুষ কাঁধে বড় বড় বেতের তিনকোণা ঝুড়ি নিয়ে নেমে আসে প্রায় প্রতিদিনই যমদুয়ারে। শীতকালে কমলালেবু নিয়ে আসে। সারা বছর ভুটানি মদ নিয়ে আসে। তারপর তাদের যা প্রয়োজন তা ভারত থেকে নিয়ে যায়। চা, চিনি, শুয়োরছানা, তরি-তরকারি যা যখন পায়। ভুটান পাহাড় থেকে নেমে সঙ্কোশ নদী পেরিয়ে এপারে চলে আসে তারা।

যমদুয়ারে কী কী জানোয়ার আছে?

কোন জানোয়ার নেই তাই বল? তবে গণ্ডারটা নেই। হাতি আছে, বাঘ আছে, বুনো মোষ আছে, নানারকম হরিণ, চিতা, হায়না। যমদুয়ার জায়গাটা সমতল। সঙ্কোশের অববাহিকা। বেশিই শাল জঙ্গল। এত বড় বড় শাল যে তাদের প্রথম শাখা বেরোয়,

পনোরো-কুড়ি ফিট ওপর থেকে। অন্য নানা গাছও আছে। সঙ্কোশের এই উপত্যকাতে পাহাড় নেই। তাই বোধহয় শম্বর এখানে দেখা যায় না। শম্বরেরা পাহাড় পছন্দ করে। নদীপারের বিস্তীর্ণ তৃণভূমিতে প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড শিং পিঠের ওপর নামিয়ে দিয়ে বুনো মোষেরা চরে বেড়ায়।

বুনো মোষদের দেবতার নামই টাঁড়বাড়ো? বিভূতিভূষণের 'আরণ্যকে' পড়েছিলাম।

তিতির বলল।

—হ্যাঁ।

এখানে পোষা মোষেদের বাথানও আছে। উত্তর ভারতের গভীর জঙ্গলের মধ্যে, যেমন অরণ্যচারী গুর্জররা বাস করে তাদের বড় বড় মোষের দল নিয়ে, যেমন হৃষীকেশের গঙ্গার অন্য পারে রাজাজি ন্যাশনাল পার্কের মধ্যে, তেমনই নেপালিদেরও মোষের বাথান আছে এ অঞ্চলে। বাঘে-ভরা এই দুর্গম বনে তারা মোষ পালে। সেই দুধও যায় ভুটানে। এই নিরস্ত্র নেপালি গোয়ালাদের দুর্জয় সাহস।

তারপর বলল, যমদুয়ারেরই মতো উত্তরবঙ্গের ভুটান ঘাটের কাছে ভুটানের সীমান্তে একটি জায়গা আছে। তার নাম পীপিং। সেখানে ভুটানের ওয়াঞ্চু নদী গভীর পাহাড়ি গিরিখাতের মধ্যে দিয়ে বয়ে এসে সমতলে পড়ে হঠাৎই মহানন্দে হাত-পা-চুল মেলে নিজেকে ছড়িয়ে দিয়ে রায়ডাক নদী হয়ে গেছে। ভুটান ঘাটে এসে। তার রূপও ভারী চমৎকার। গর্জন করতে করতে রায়ডাক উপলখণ্ড বিছোনো অসমান খাত বেয়ে উচ্ছল হয়ে বয়ে চলেছে ছোট-বড় প্রপাতে প্রপাতে এক্কা-দোক্কা খেলতে খেলতে। ভুটানঘাট, জয়ন্তী, হয়ে বৈচিত্র্যময় উত্তরবঙ্গের জনবসতিপূর্ণ এলাকাতে ঢুকে গেছে রায়ডাক।

www.boiRboi.blogspot.com

আমি বললাম, সত্যি! আমাদের দেশে যে কত নদী, কতরকম নদী, প্রকাণ্ড বড় নদী থেকে নাম-না-জানা ছোট ছোট নালা, এরকম বৈচিত্র্য সম্ভবত পৃথিবীর আর কোনও দেশেই নেই।

নেইই তো! যদিও পৃথিবীর সব দেশ তো আমি দেখিনি।

তিতির বলল।

তুমি কটা নদী দেখেছ? আমাদের দেশের মধ্যে?

ভটকাই তিতিরকে জিজ্ঞেস করল।

তিতির বলল, ওড়িশার মহানদী দেখেছি। মহানদী, গিরিখাত দিয়ে বয়ে গেছে চোদ্দো মাইল বা সাতকোশ। তাই সেই খাত বা গণ্ডের নাম সাতকোশীয়া গণ্ড। চোদ্দো মাইল পরে সে গিরিখাতের বাইরে পড়ে অনেক চওড়া হয়ে গেছে চৌদুয়ারে। তার দুপাশে জনবসতি গড়ে উঠেছে। নদী চলে গেছে কটক শহরের বুক চিরে।

তারপর মধ্যপ্রদেশের নর্মদাও দেখেছি। মার্বল রকের মধ্যের ভেড়াঘাট হয়ে গিরিখাত দিয়ে বয়ে নর্মদা গিয়ে সমতলে পড়েছে—। সমতলে পড়তেই নদীর দুপাশে জনবসতি গড়ে ওঠে। জল তো প্রাণদায়িনী।

ঋজুদা বলল, ছত্তিশগড়ের ইন্দ্রাবতী নদী চিত্রকোট প্রপাতে এসে পাহাড়শ্রেণী থেকে নীচে আছড়ে পড়েছে গভীর জঙ্গলের উপত্যকাতে। চিত্রকোট দেখলে মনে হয় মিনি-নায়গ্রা। আমেরিকা আর কানাডার সীমান্তের। তারপর দক্ষিণে আছে কাবেরী, কৃষ্ণা, গোদাবরী।

তারপর ঋজুদা বলল, মনে আছে রুদ্র? আমরা যখন মধ্যপ্রদেশের অচানকমারে গেছিলাম তখন অমরকণ্টকেও তো বেড়াতে গেছিলাম সেখান থেকে। সেখানে নর্মদা আর শোন এই দুই নদীর উৎস!

www.boiRboi.blogspot.com

বললাম, মনে আবার নেই। অমরকণ্টকে সাউথ ইস্টার্ন কোলফিল্ডস-এর গেস্ট হাউসের দক্ষিণ ভারতীয় চৌকিদারের বানানো যে দোসা খেয়েছিলাম তেমন দোসা কোথাওই খাইনি।

ঋজুদা বলল, তা যা বলেছিস।

ভটকাই বলল, তোমরা আমাকে বল খাদ্যরসিক, তোমরা নিজেরা কী?

আসামে আছে ব্রহ্মপুত্র। আমাদের গঙ্গা, রুদ্রপ্রয়াগ থেকে নেমে এসেছে। দেবপ্রয়াগে অলকানন্দা আর মন্দাকিনী মিলিত হওয়ার পরেই সেই মিলিত জলধারার নাম হয়েছে গঙ্গা। গঙ্গা খরবেগে হৃষীকেশ-এর কাছে সমতলে ছড়িয়ে গেছে। তারপর চলে গেছে হরিদ্বারের দিকে।

তিস্তাও গিরিখাতের মধ্যে দিয়ে বয়ে এসে কালিঝোড়ার কাছে সমতলে নেমে দুপাশে আদিগন্ত ছড়িয়ে গেছে, বাঁদিকে ডুয়ার্স আর ডানদিকে শিলিগুড়ি জলপাইগুড়িকে শাসন করে।

ঋজুদা আবার বলল।

তিতির বলল, ঋজুকাকা, তোমার যমদুয়ার কিন্তু নদীতে ভেসে গেল।

ঋজুদা হেসে বলল, কথাটা ভুল বলিসনি।

আমরা সকলেই হেসে উঠলাম একসঙ্গে।

সকলে বসেছিলাম ব্রহ্মপুত্রের পারের ধুবড়ি শহরের সার্কিট হাউসের বারান্দায়। আজই আমরা আমবাড়ি-ফালাকাটা এয়ারস্ট্রিপে নেমে ধুবড়িতে এসেছি। ধুবড়িও ব্রহ্মপুত্রের পারে, গুয়াহাটিরই মতন।

ঋজুদা বলল, একবার ছেলেবেলায় জেঠুমণির সঙ্গে ঘোর বর্ষাতে গারো পাহাড়ের নীচের সরু জিঞ্জিরাম নদীতে মানুখেকো

কুমির মারতে এসেছিলাম। ধুবড়ির নেতাধোপানির ঘাট থেকে ছোট্ট ছইওয়ালা ডিঙ্গি নৌকোতে, ভরা-বর্ষার প্রলয়ঙ্করী ব্রহ্মপুত্র পেরিয়ে গেছিলাম, শালমাড়া, ফুলবাড়ি পেরিয়ে জিঞ্জিরাম। সে এক অভিজ্ঞতা। সাম্প্রতিক অতীতে শুনেছি শালমাড়া এখন চলে গেছে ব্রহ্মপুত্রের গর্ভে। সেবারে রূপসী এয়ারস্ট্রিপে নেমেছিলাম ধুবড়ি শহরের কাছেই। যুদ্ধের সময়ে আমেরিকানরা বানিয়েছিল সেই এয়ারস্ট্রিপ। দিনমানে লেপার্ড ঘুরে বেড়াত নির্জন পুটুসের জঙ্গলে-ঘেরা সেই এয়ারস্ট্রিপে। তখন জ্যামেয়ার কোম্পানির ড্যাকোটা প্লেন যাতায়াত করত রূপসী আর দমদমের মধ্যে। নন-প্রেসারাইজ্‌ড, নন-এয়ারকন্ডিশন্‌ড প্লেন কিন্তু পাইলটদের মতে দারুণ ওয়েদার-ওয়ার্দি। বছরের বিভিন্ন সময়ে কমলালেবু, পাট, গারো পাহাড়ের শয়ে শয়ে ময়না পাখির সঙ্গে লম্বা বেঞ্চে দড়ি ধরে বসে থাকতে হত সেই প্লেনে। ওপাশের যাত্রীদের মুখ দেখা যেত না। এয়ার হস্টেজ-টস্টেস ছিল না। শুধু পাইলট, কো-পাইলট আর আমরা। প্যাসেঞ্জারদের মধ্যে বেশিই পৃথুলা মাড়োয়ারি মহিলা গরম প্লেনের মধ্যে তামাক পাতার বোঁটকা গন্ধে ওয়াক ওয়াক করে বমি করতে করতে যেতেন। সে এক অভিজ্ঞতা।

তারপর বলল, তবে সুখের কথা এই যে ওই প্লেনেই জেঠুমণির সঙ্গে গৌরীপুরের বড় রাজকুমারীর সঙ্গে আলাপ হয়েছিল। পরে ওঁর ছোট ভাই লালজি, যাঁর ভাল নাম প্রকৃতীশচন্দ্র বড়ুয়া, তাঁর সঙ্গেও খুবই আলাপ হয়। নামনি-আসামে তাঁর হাতিধরার ক্যাম্পে জেঠুমণি বহুবার গেছেন। বড় রাজকুমারীর ছেলে মণীন্দ্র বড়ুয়ার সঙ্গেও আলাপ ছিল আমাদের। উনি কলকাতাতে জেঠুমণির বাড়ির কাছেই বাড়ি করেছিলেন। হাতি মারতে গিয়ে, হাতি তাড়া করাতে, রাতের বেলা অন্ধকারে দৌড়ে পালাতে গিয়ে নেপালিদের আলুখোঁড়া গর্তে

www.boiRboi.blogspot.com

পড়ে যান। হাতির হাত থেকে বাঁচেন যদিও, মেরুদণ্ডে চোট লাগাতে বাকি জীবন বিছানাতে শুয়ে বেডসোর হয়ে মারা যান মণীন্দ্রবাবু (মুনীনবাবু) মাঝবয়সে।

তিতির বলল, লালজির মেয়েই না পার্বতী বড়ুয়া? হাতি বিশেষজ্ঞ?

তাই-ই তো! আর লালজির আরেক বোনের নাম প্রতিমা বড়ুয়া, হস্তিকন্যার গান, গোয়ালপাড়িয়া গানের জন্যে যিনি বিখ্যাত। তবে লালজি পৃথিবীর মধ্যে একজন অন্যতম হাতি বিশেষজ্ঞ ছিলেন। শোনপুরে যে প্রতি বছর ভারতের সবচেয়ে বড় হাট বসে গবাদি এবং অন্যান্য প্রাণীর, সেই হাটে কোনও ক্রেতাই হাতি কিনতেন না 'বাবা'-কে জিজ্ঞেস না করে।

কার বাবা?

সকলেরই বাবা। লালজির নাম ছিল বাবা, সারা দেশের হাতির জগতে। তবে একবার আমি জেঠুমণির সঙ্গে উত্তরবাংলোর মূর্তিতে গেছিলাম, যে মূর্তি গরুমারার কাছে, এখন যেখানে মূর্তি নদীর ওপরে দুর্দান্ত বাংলো বানিয়েছেন বনবিভাগ, সেখানে দেখেছি লালজিকে সকলেই, মানে তাঁর কর্মচারীরা, মাহুতরা, 'রাজা' বলে ডাকছিলেন। উনি খুব একটা মজার কথা বলেছিলেন সেবারে আমাদের।

কী কথা? বলো না ঋজুদা?

বলেছিলেন, 'একবার নবকান্ত বড়ুয়া আইস্যা কইল্, বাবা, আপনে মন্ত্রী হইবেন?'

মানে, ইলেকশনে দাঁড়াবার অনুরোধ নিয়ে এসেছিলেন।

'তা আমি তারে কয়্যা দিলাম, আছি ত রাজাই, মন্ত্রী হয়্যা কি কাম?'

আমি বললাম, লালজির গল্প আরও বলো ঋজুদা। ওরা ত

শোনেইনি। শুনে খুব আনন্দ পাবে।

ঋজুদা বলল, তাহলে আর যমদুয়ারে যাওয়ার দরকার কি? সার্কিট হাউসেই তিন-চারদিন থেকে, ভাল খেয়েদেয়ে লালজি আর যমদুয়ারেরও গল্প শোনাই তোদের। তারপর চল ফিরে যাই কলকাতা।

ভটকাই আর তিতির তীব্র আপত্তি করে উঠল।

আমি বললাম, ছাত্তারদা কাল ভোর পাঁচটাতে এসে হাজির হবে বোঁচকা-বুঁচকি নিয়ে, তার কী হবে?

তাও তো বটে। তবে ছাত্তারের বোঁচকা-বুঁচকি বলতে কাঁধে একটি ঝোলা, আর কাঁধে ঝোলানো বন্দুকটি। খাকি প্যান্ট, খাকি বুশ শার্ট আর পায়ে বাটা কোম্পানির মেটে-রঙা একজোড়া কেড্‌স। বেল্টের সঙ্গে লাগানো একটা আট ইঞ্চি ছুরি, রেমিংটনের। ব্যসস্। আর কিছুই নয়। তবে জিপে তো ও চড়তে পারে না। চড়ে সাইকেলে। কিন্তু ধুবড়ি থেকে যমদুয়ার তো সাইকেলে যেতে পারবে না তাই আমাদের সঙ্গেই যাবে ও। ছাত্তারকে নিয়ে আমরা পাঁচজন। ভাবছি, জিপের ড্রাইভারকে এখানেই রেখে যাব।

তিতির বলল, কী দরকার। জঙ্গলে কত কাজে লেগে যাবে ড্রাইভার। তারপর চাকা-টাকা পাংচার হলে কী হবে?

কেন? ভটকাইকে তো সঙ্গে আনাই এইসব কাজের জন্যে। ERRAND BOY-এর কাজ করবে সে।

তবু, ড্রাইভারকে নিয়েই চল ঋজুকাকা। তুমি না হয় একাই বসো সামনে—ড্রাইভারের পাশে। আবু ছাত্তারদাদা আর আমরা পেছনে আরামে বসে যাব। জিপের পেছনে চারজন তো বসাই যায়।

www.boiRboi.blogspot.com

২

কথাই ছিল যে খুব ভোরে উঠে তৈরি হয়ে তড়িঘড়ি ব্রেকফাস্ট করে আমরা বেরিয়ে পড়ব যমদুয়ারের দিকে যাতে দিনে দিনে পৌঁছতে পারি। গভীর নির্জন জঙ্গল। যার বহু মাইলের মধ্যে কোনও জনবসতি নেই। সুন্দরবনের গোপেন বাগচি মশায়ের মোটর বোটের সারেঙ-এর ভাষাতে, বুঝলেন কি না স্যার, এখানে 'খাদ্য-খাদকের' বড়ই অভাব। সেখানে গিয়ে পৌঁছতে হবে বলে কথা।

সবই ঠিকঠাক ছিল শুধু শিকারি ছাত্তারই আসতে পারলেন না। রাতেই একজন লোকের হাতে চিঠি দিয়ে পাঠিয়েছিলেন যে তাঁর খুব জ্বর তিনি আসতে পারছেন না।

ঋজুদা বলল, ছাত্তারের ওপরে বেশি জোরাজুরি করা বিপজ্জনক হবে।

কেন? তিতির বলল।

যদি গুলি করে দেয়?

তার মানে?

ও ভীষণই বদরাগী মানুষ। দুর্জয় সাহস কিন্তু বনেজঙ্গলে জন্তু-জানোয়ারের সঙ্গে থাকতে থাকতে ও শহুরে মানুষদের একেবারেই পছন্দ করে না। বেশি কথাও পছন্দ করে না।

ঋজুদার এই কথা যে কত বড় সত্যি তা পরে আমরা সকলেই মর্মে মর্মে বুঝেছিলাম যখন কলকাতাতে বসে একদিন খবর পেলাম যে ছাত্তারদাদা একই দিনে তার এগারোজন আত্মীয়কে গুলি করে মেরে দেয় জমিজমা নিয়ে বিবাদের কারণে। সে বনের জানোয়ারদের মতো সরল ছিল। শহুরে মানুষের বক্রতা ও ভণ্ডামি তার অসহ্য হয়েছিল। ফলে তার ফাঁসি হয়ে গেছে। গুয়াহাটি হাইকোর্টে আপিল করেও কিছু হয়নি। ঋজুদা টাকা পয়সাও পাঠিয়েছিল। যারা ছাত্তারদাকে জানত তাদের মধ্যে আরও অনেকেই আর্থিক সাহায্য করেছিলেন। কিন্তু তাতে কোনও লাভ হয়নি।

আমরা গৌরীপুরের কাছাকাছি এসে গেছি। এইখানেই মাটিয়াবাগ প্যালেস—বড়ুয়াদের বাসস্থান। প্যালেস নামেই এখন—একদিন তার যে রমরমা ছিল আজ তার তা নেই। ঋজুদা বলল, প্রতিমাদির সঙ্গে দেখা না করে গেলে পরে জানতে পারলে খুব রাগ করবেন। আমরাও সঙ্গে গেলাম। ড্রাইভার সালাউদ্দিন বন্দুক-রাইফেল পাহারা দিয়ে জিপে রইল। অতগুলো বন্দুক-রাইফেল নিয়ে প্রতিমা বড়ুয়ার কাছে গেলে তিনি আতঙ্কিত হতে পারতেন, ভাবতেন, ডাকাতই পড়ল বুঝি।

ঋজুদার যাওয়াতে খুবই খুশি হলেন। তবে ওঁর শরীর ভাল দেখলাম না আমরা। তার কিছুদিন পরেই তিনি গত হয়েছিলেন আর তারও আগে গত হয়েছিলেন লালজি।

প্রমথেশ বড়ুয়ার 'মুক্তি' সিনেমাতে যে মস্ত হাতিটি ছিল, যার

www.boiRboi.blogspot.com

নাম জংবাহাদুর, সে অ্যানথ্রাক্স রোগে মারা যায়। তাকে প্যালেসের সংলগ্ন জমিতেই কবর দেওয়া হয়। ঋজুদা জায়গাটা দেখালও আমাদের।

তারপর আবার রওনা হওয়া গেল। জিপ আমিই চালাচ্ছিলাম। আমার পাশে তিতির তার পাশে ঋজুদা। গৌরীপুর ছেড়ে আমরা কুমারগঞ্জে এলাম—দাঁড়ালাম না। ঋজুদা যেন নস্টালজিক হয়ে পড়েছিল এ অঞ্চলের তার ছেলেবেলার নানা স্মৃতিতে। ডানদিকে দেখিয়ে বলল ডানদিকের চষা মাঠ পেরিয়ে সাইকেলে চড়ে বন্দুক কাঁধে আমরা যেতাম রাঙামাটি পাহাড়ে। সেখানে মস্ত বড় নিবিড় ছায়াচ্ছন্ন টুঙ বাগান ছিল। সেই টুঙ ফল দিয়ে নাকি এরোপ্লেনের রঙ তৈরি হত। সত্যি মিথ্যা বলতে পারব না। সেই বাগানের মধ্যে দিয়ে একটা ঝর্না বয়ে গেছিল। সে বাগানে চিতাবাঘও দেখা যেত। রাঙামাটি পেরিয়ে বেশ কয়েক মাইল আঁকাবাঁকা পাহাড়ি পথে গভীর জঙ্গল মাড়িয়ে পৌঁছতে হত আলোকঝারি। এই আলোকঝারিতে প্রতি বছর সাতই বৈশাখে একটি মেলা বসে। বহু দূর দূর থেকে নানা আদিবাসীরা পাহাড়ের এই দেবতার নামে পুজো চড়ায়, মুরগি ও কবুতর বলি হয়। বৈশাখী বনের বহুরঙ্গা পটড়মিতে বহুরঙা শাড়িতে সাজা মেয়েদের ভারী ভাল দেখাত। কে জানে! এখনও সেই মেলা হয় কী না। এই আলোকঝারি ছাড়িয়ে আমরা চলে যেতাম পর্বতজুয়ার। সেখানে মেচ উপজাতিদের বাস। জঙ্গলে গাদা বন্দুক সঙ্গে করে মেচ সর্দারের আমাদের বয়সী ছেলে আমাদের সঙ্গে নিয়ে বাঘ ও শুয়োর মারতে যেত। তার সুন্দরী বোন আর মা তামা-রঙা শরীরে হাতে-বোনা তাঁতের বহুবর্ণ পোশাক পরে কাঁঠালগাছ তলার গোবর-নিকোনো উঠোনে বসে খটাখট শব্দ করে তাঁত বুনত। নানারঙা শুকনো কাঁঠালপাতা ঝরে পড়ত উঠোনে—একটা পাগলা

হাওয়া বইত গ্রীষ্মবনের নানা গন্ধ বয়ে...

ঋজুদা বলছিল, আর সেই বর্ণনা শুনতে শুনতে আমরাও যেন গিয়ে পৌঁছে গেলাম লালমাটি—আলোকঝারি—পর্বতজুয়ারে।

কুমারগঞ্জের পরে এল তামারহাট। হাটের চারপাশ ঘিরে নানা বাড়িঘর। মস্ত বড় হাট। সপ্তাহে একদিন বসত। বহু দূর দূর গ্রাম থেকে মোষের গাড়ি, বলদের গাড়ি করে নানা জনে নানা জিনিস বয়ে আনত। হাট থেকে সর্ষের তেলের, খোলের, গুড়ের, তামাকের, তেলেভাজার আর নারী-পুরুষের গায়ের গন্ধ, মোষ ও বলদের গায়ের গন্ধের সঙ্গে উড়ত শীতের উত্তুরে হাওয়াতে। তামাহাটের পাশ দিয়েই বয়ে গেছে গঙ্গাধর নদী। সেই নদীতে বড় বড় মহাশোল মাছ, উদবেড়াল, শীতের দিনে নানা রঙ-বেরঙা পরিযায়ী পাখিরা ভিড় করত। রঙ-বেরঙের বিলিতি গুলি নিয়ে বন্দুক সমেত নৌকো চড়ে সে সব পাখি শিকার করতাম আমরা।

তামাহাটের পর পথে পড়ল ডিঙ্গডিঙ্গা চা বাগান। পথের বাঁদিকে। এই ডিঙ্গডিঙ্গাতেও হাট বসত সপ্তাহে একদিন। ডিঙ্গডিঙ্গা ছাড়িয়ে যাওয়ার বেশ কিছুটা পর পথটা ডানদিকে একটা সমকৌণিক বাঁক নিয়ে ঘুরে গেছে আর সেই বাঁকের ডানদিকে একটা দোতলা বনবাংলো। পথের মোড়ে একটা বোর্ডে লেখা আছে গুমা রেঞ্জ। এখান থেকে গুমা রেঞ্জ শুরু হল। কুমারগঞ্জের পর থেকে গুমা রেঞ্জে আসা পর্যন্ত পথের দুধারে ক্ষেত, বাড়িঘর এসব ছিল। ওই বাংলোটা ছিল বড়বাধা বিট-এ।

ঋজুদা বলল, এই সব ধানক্ষেতে আগে ধানকাটা হয়ে যাওয়ার পরে প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড চিতাবাঘ বসে থাকত। চিতাবাঘে প্রায়ই বেড়া টপকে এসে বাছুর, ছাগল এসব ধরে নিয়ে যেত। তামাহাট পাটের খুব বড় কেন্দ্র ছিল। আগে পূর্ব-বাংলা থেকে বড় বড় মহাজনী

www.boiRboi.blogspot.com

নৌকো করে পাট আসত। দেশ ভাগ হয়ে যাওয়ার পরে ধীরে ধীরে সেই ব্যবসা বন্ধ হয়ে গেছে কিন্তু যারা পাটের ব্যবসাদার ছিলেন তাঁদের প্রায় প্রত্যেকেরই বাড়িতে মস্ত বড় বড় পাটের গুদাম ছিল। সেই সব গুদাম থেকে পাটের মিষ্টি গন্ধ বেরুত। ঋজুদার এক পিসিমার বাড়ি ছিল তামারহাটে, সেই সুবাদেই তাঁর প্রথম যৌবনে এই সব অঞ্চলে বন্দুক হাতে দৌরাত্ম্য করা। তাঁর পিসেমশাইয়ের একটা চোখ ডায়াবেটিসে খারাপ হয়ে গেছিল। সন্ধের পরে মুরগির ঘর থেকে তাদের চেঁচামেচি শুনে, একজন কাজের লোককে লণ্ঠন ধরতে বলে সেই জাল-দেওয়া বড় ঘরের মধ্যে কী নড়াচড়া করছে দেখে সেদিকে তাক করে বন্দুক দেগে দেন, 'পরদিন সকালে দেখা যাবে' বলে। পরদিন দেখা গেল একটা মাঝারি মাপের চিতা মরে পড়ে আছে। তখন এই সব অঞ্চলে চিতাবাঘের এমনই বাড়াবাড়ি ছিল।

ঋজুদার মুখ থেকে এইরকম নানা গল্প শুনতে শুনতে আমরা এগিয়ে যেতে লাগলাম গভীর থেকে গভীরতর জঙ্গলের দিকে।

যমদুয়ার পড়ে কচুগাঁও ফরেস্ট ডিভিশনে। রাইমানা ছাড়িয়ে কচুগাঁও হয়ে আমরা এমন শালজঙ্গলে এসে পড়লাম যে অত বড় বড় শালগাছ কোথাও দেখিনি। আমার মতো লম্বা পাঁচজন মানুষের দু হাতের বেষ্টনীতেও বাঁধা পড়বে না সে সব শালগাছ। মাঝে মাঝে বিস্তীর্ণ তৃণভূমি—স্বাভাবিকও যেমন আছে আবার বনবিভাগ ক্লিয়ার-ফেলিং করে জঙ্গল ফাঁকা করাতে সেখানে বিস্তীর্ণ তৃণভূমিরও জন্ম হয়েছে। আরও কতরকম যে গাছ।

ঋজুদা বলল, কাজিরাঙাতে মোটকা গোগোইয়ের সঙ্গে এনকাউন্টারের সময়ে তোদের অনেক গাছ চিনিয়েছিলাম রুদ্র, তাদের অহমিয়া নামও বলে দিয়েছিলাম। এই গাছগুলো দেখে

নামগুলো বল দেখি—যদিও কাজিরাঙার জঙ্গলের রকম আলাদা—প্রতি বছর ব্রহ্মপুত্র সে জঙ্গলকে ভাসিয়ে দেয় তাই সেই জঙ্গলের সঙ্গে এই হাই-ফরেস্ট তুলনীয় নয়, তবে কিছু গাছ তো আছেই কমোন।

তারপরই বলল, প্রকাণ্ড দাঁতাল হাতিকে কি বলে অহমিয়াতে?

আমি বললাম, বুরুন্টিকা।

গুড। ঋজুদা বলল।

দুধারে মাথা উঁচু প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড গাছের মাঝ দিয়ে সরু কাঁচা পথ চলে গেছে। জিপের চাকা যাচ্ছে দু পাশ দিয়ে আর মধ্যে ঘাস গজিয়ে আছে। তবে বর্ষার সময়ে ও বর্ষার পরে এই ঘাসগুলো নিশ্চয়ই কোমর সমান হয় বেড়ে। এখন গরমের দিন বলে লালচে রঙ লেগেছে এবং অনেক ঘাস মরেও গেছে।

আমরা রাইমানার ফরেস্ট অফিসের কাছের একটা হোটেলে মুসুরির ডাল, আলুভাজা আর হাঁসের ডিমের খুব ঝাল ঝোল ভাত খেয়েছিলাম। ফারস্ট ক্লাস। বড় বড় আলু দু ভাগ করে কেটে দিয়েছিল ঝোলে। তবে তিতিরের খুবই ঝাল লেগেছিল। তারপর থেকেই হাঁসীর মতো হিসহিস করছে তিতির। ভটকাইয়ের অবস্থাও তথৈবচ। তবে ঋজুদা আর আমি দুজনেই খুব ঝাল খাই। তার ওপরে ঋজুদা দু বেলার PRINCIPAL MEAL-এর সঙ্গে দুটি করে কাঁচালঙ্কা এবং দুটি করে কাঁচা পেঁয়াজ খাবেই—রিলিজিয়াসলি। ঋজুদা বলে, জেঠুমণির ট্রেনিং। জেঠুমণি বলতেন, পেঁয়াজ, রসুন, আর লঙ্কা রোজ খেলে খাটবার ক্ষমতা বাড়ে, অসুখ-বিসুখ হয় না, সর্দি-কাশি হয় না। জেঠুমণি দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের একজন আর্মির জেনারেলের কথা বলতেন, বার্মার জঙ্গলে তাঁর বাহিনী নাকি এমন এমন কাণ্ড করেছিল যে পুরো ব্রিটিশ সেনাবাহিনীতে তাঁর বাহিনীর নাম হয়ে গেছিল

উইংগেটস সার্কাস। জেনারেল উইংগেটকে অনেকে বলতেন ONION WINGATE. পেঁয়াজই ছিল তাঁর STAPLE FOOD. প্যান্টের সামনের দুই বড় পকেট ভর্তি পেঁয়াজ থাকত সব সময়ে। পেঁয়াজের অনেক গুণ।

আমিও সেই গুণে মোহিত। রোজ সকালে একটা করে বড় কোয়ার রসুনও খাই খালিপেটে। চিবিয়ে খাই। তিতির আর ভটকাই আমাকে তাই ঠাট্টা করে বলে His Mastars Dog। যা বলে বলুক। ঋজুদার টোটকার ফলে আমি প্রায় নীরোগ হয়ে রয়েছি আর জীবনীশক্তিরও অভাব নেই আমার কোনও।

দূর থেকে গাছগাছালির আড়ালে যমদুয়ারের দোতলা বটল-গ্রিন বাংলোটা দেখা যাচ্ছিল ছবির মতো সুন্দর। আরও একটু এগোতেই পথের বাঁ পাশে একটি ভারী সুন্দর স্বচ্ছতোয়া দ্রুতগতি নদীকে দেখা গেল।

তিতির বলল, এটা কী নদী ঋজুকাকা!

এই নদীর নাম সঙ্কোশ। এই নদীই তো আসাম, বাংলা আর ভুটানের সীমানা চিহ্নিত করে বইছে।

কিছুক্ষণের মধ্যেই আমরা বাংলোর নীচের ফাঁকা জায়গাতে জিপটাকে ঢুকিয়ে দিলাম। ডানপাশে চৌকিদারের কোয়ার্টার, বাবুর্চিখানা ইত্যাদি।

জিপের শব্দ শুনে চৌকিদার এসে দাঁড়িয়ে সেলাম করল।

তোমার নাম কী ভাই?

ছার, আমার নাম হরেন গোগোই।

তুমি মোটকা গোগোই-এর কেউ হও নাকি!

সে লাজুক হাসি হেসে বলল, না ছার। তবে তার কথা শুনছি আমি অফিসারগো কাছে। গণ্ডারের চোরাশিকারি তো? কাজিরাঙাতে

www.boiRboi.blogspot.com

ধরা পড়ছিল।

ও। তবে তো তুমি জানোই।

তারও জেল হয়্যা গেছে অনেক বছরের। তার বাড়ি তো কার্বি-অ্যাংলং-এ। আমার বাড়ি বিজনিতে। বিজনির নাম শুনেছেন কি ছার?

গোয়ালপাড়ার বিজনি তো? নিশ্চয়ই নাম শুনেছি। বিজনি রাজ্যের এক কুমার কলকাতাতে আমার টেনিস খেলার পার্টনার ছিল দক্ষিণ কলকাতা সংসদে। গোয়ালপাড়াতে সিডলি বলেও একটা রাজ্য ছিল।

হ। তবে তো জানেনই আপনে।

খাবারদাবারের সব পোটলা-পুঁটলি নামিয়ে নাও হরেন। তুমি কি ভাল রাঁধতে পার?

ওই অর্ডিনারি যা রান্না, ডাল ভাত রুটি সবজি আন্ডা মুরগি এইসব।

এখানে আন্ডা মুরগি পাওয়া যাবে?

যাইতেও পারে, নাও যাইতে পারে। কওন যায় না।

তরিতরকারি?

আলু-মালু পাইতে পারেন। অন্য সবজিও পাইতে পারেন। কালই ভুটানে হাট আছে। কাউরে যদি পাঠাইতে পারেন তবে আন্ডা মুরগি সবজিও লইয়া আনতে পারে। আনলে, আমি রাইন্ধা দিমু।

তারপরই বলল, আপনারা কি শিকারে আইছেন?

ঠিক শিকারে নয়। হরিণ শম্বর এটা-ওটা আমরা অনেকই শিকার করেছি। বুনো মোষ যদিও শিকার করিনি কিন্তু করবার ইচ্ছাও নেই। তবে দেখার ইচ্ছা আছে।

হাতি মারইবেন নাকি?

www.boiRboi.blogspot.com

না। হাতি মারারও কোনও ইচ্ছা নেই।

হাতিগুলান বড় বাঁদর হইয়া গিছে।

তিতির বলল, হাতি আবার বাঁদর কী করে হয়?

আমরা হেসে উঠলাম ওর কথাতে।

হরেন বলল, ওই। কয়্যা দিলাম, কথার কথা।

তারপর বলল, রাঙ্গা নদীর নিকটেই এক বাঘে প্রায়ই মানুষ ধরতাছে।

সেই বস্তির মানুষে কারও মুখে খবর পাইলেই আইস্যা পায়ে পড়ব অনে। দশজন মানুষ নিছে বাঘটা।

কেউ মারার চেষ্টা করেনি?

করছিলেন। অনেকেই করছিলেন। সব শেষে আইছিলেন, গুয়াহাটি থিক্যা চান্দু ফুকন। পুরা সাতদিন এটি আছিলেনও কিন্তু মারবার পারেন নাই। অহম সরকার দশ হাজার টাকা রিওয়ার্ডও ডিক্লেয়ার কইর‍্যা দিছে কিন্তু কেউই তো মারণ পারলেন না।

তা রাঙ্গা বস্তি তো বেশি দূরে নয় এখান থেকে। সেই মানুষখেকো এখানে আসে না?

আসে তো। অনেকদিন আগেই এক নেপালিকে ধইর‍্যা খাইল দুপুর বেলাতে।

নেপালি কী করছিল ওখানে?

সে মোষ চরাইতে আছিল। তাগো বাথান কাছেই। এই বাংলোয় যা দুধ-টুধ লাগে তা তাগো বাথান থিক্যাই তো লই।

তা তুমি সাবধানে থাকো তো?

তা তো থাকি। সন্ধ্যা লাগনের সাথে সাথে তো কপাট বন্ধ কইর‍্যা থুই কিন্তু এ বাঘ যে দিনেই বেশি মানুষ লইছে। ওর হাত থিক্যা বাঁচনই মুশকিল।

তারপর বলল, ক্যান? আপনেরে রাইমানার রেঞ্জারবাবু কিছু কয়্যা দেন নাই?

এ কথাতে আমরা একটু অবাক হয়ে ঋজুদার মুখের দিকে তাকালাম। আমাদের ওই হোটেলে খেতে পাঠিয়ে ঋজুদা বলেছিল, রেঞ্জার অফিস থেকে আসছি আমি। তোরা খেতে শুরু কর।

এখন মনে হচ্ছে বেশ অনেকক্ষণ পরেই এসেছিল ঋজুদা।

আমাদের উৎসুক মুখের দিকে চেয়ে রইল কিছুক্ষণ ঋজুদা তারপর হরেনকে বলল, বলেছেন, সবই বলেছেন।

তারপর একটু চুপ করে থেকে বলল, আমি তোদের যমদুয়ার দেখাতে এনেছি এখানে। কিছু শিকার করতে আসিনি বলাতে রেঞ্জার শইকিয়া সাহেব বললেন, আমার এই উপকারটা করে দিন ঋজুবাবু। যমদুয়ার তো আপনার জানা জায়গা। আগেও তো বহুবার এসেছেন। একবার জনসন সাহেব, সেন্ট্রাল বোর্ড অফ ডাইরেক্ট ট্যাক্সেস-এর মেম্বার, যিনি আগে আসাম, মণিপুর, মেঘালয় ও নাগাল্যান্ড-এর ইনকাম ট্যাক্স কমিশনার ছিলেন তাঁকে নিয়ে এসেছিলেন না? আমি শুনেছি, চিফ কনসার্ভেটর অফ ফরেস্টস হাজারিকা সাহেবের কাছ থেকে।

সে তো বহুদিনের কথা।

তা হোক। আপনি তো সাতদিন থাকবেন বলেই এসেছেন। প্রয়োজনে ফরেস্ট ডিপার্টমেন্ট থেকে দুজন ভাল শিকারি ফরেস্ট গার্ডকেও পাঠিয়ে দেব জিপ দিয়ে আপনাকে অ্যাসিস্ট করার জন্যে।

তার দরকার নেই কিন্তু আপনারা ধুবড়ি থেকে আবু ছাত্তারকে আনিয়ে নিচ্ছেন না কেন? তার মতো শিকারি তো এ তল্লাটে নেই।

তাতে কিছু অসুবিধা আছে। আমাদের ফরেস্ট ডিপার্টমেন্টে আবু ছাত্তার পার্সোনা নন-গ্রাটা।

তাই নাকি?

হ্যাঁ।

কবে থেকে?

এই কয়েক বছর হল। অনেকগুলো পোচিং-এর জন্যে সেই দায়ী কিন্তু হাতেনাতে ধরতে না পারাতে তাকে আমরা বুক করতে পারছি না। গুয়াহাটির কড়া নির্দেশ আছে তাকে যেন কোনও বনেরই ত্রিসীমানাতেই ঢুকতে না দেওয়া হয়।

ভটকাই জিজ্ঞেস করল, পার্সোনা নন-গ্রাটার মানেটা কি?

ঋজুদা বলল, মানে হল অবাঞ্ছিত ব্যক্তি।

তাই?

হ্যাঁ।

তারপরই রেঞ্জার সাহেব বলেছিলেন, প্লিজ ঋজুবাবু, আমাদের এই উপকারটা করুন। আসলে আপনার নামে যমদুয়ারের রিজার্ভেশন আছে জানতে পেরে ছুটি ক্যানসেল করে আমি এখানে বসে আছি আপনাকে ধরব বলে। আমার শিলং যাওয়ার কথা ছিল ফ্যামিলি নিয়ে। যমদুয়ার থেকে আপনারা যা-কিছু সাহায্যের দরকার আমাকে ওয়্যারলেসে জানালেই আমি সেই দরকার পূরণ করব।

ওখানে ওয়্যারলেস অপারেট করবে কে?

আলাদা ওয়্যারলেস অপারেটর নেই। একেবারে রিমোট জায়গা তো। আপনাদের মতো অভিজ্ঞ বন-বিশারদ ছাড়া যমদুয়ারে আর কে যায়? যমদুয়ার তো পিকনিক করার জায়গা নয়। তাছাড়া, এই ম্যানইটারের অপারেশন আরম্ভ হওয়ার পরে আমরা যাকে তাকে যেতেও দিই না। ট্যুরিস্টদের বাঘে খেলে কি আমাদের মান বাড়বে? এমনিতেই তো গুয়াহাটি বিধানসভাতে ওই বাঘকে নিয়ে দুদিন আলোচনা হয়ে গেছে।

www.boiRboi.blogspot.com

তিতির বলল, তুমি এই মানুষখেকো বাঘের কথা আমাদের কাছে বেমালুম চেপে গেলে কেন ঋজুকাকা?

চেপে যাব না তো কী করব বল? এ পর্যন্ত এক আন্দামান ছাড়া সব জায়গাতে বেড়াতে এসেই তো একটা না একটা চক্করে ফেঁসে যাচ্ছি। যে সব জায়গাতে আগে থাকতেই কোন মিশানে যাচ্ছি তা জেনে গেছি তো গেছিই, যেমন কাজিরাঙা ইত্যাদি। সেখানে অন্য কথা। তোদের যমদুয়ার দেখাতে এনে সত্যি সত্যিই যমের মুখে ঠেলে দেব একথা জেনেত আমার ভাল লাগার কথা নয়।

ততক্ষণে হরেন আর সালাউদ্দিন মিলে রান্নাঘরের জিনিসপত্র বয়ে নিয়ে গেছে রান্নাঘরে আর আমাদের ছোট ব্যাগগুলোও তুলে দিয়েছে দোতলাতে। আমরা চমৎকার বারান্দাতে বসেছি চেয়ার টেনে। বারান্দা থেকে সোজা দেখা যায় আমরা যে পথে এলাম সেই পথটা ক্রমশ সরু হয়ে দূরে চলে গেছে গভীর জঙ্গলের মধ্যে। ডানদিকে সঙ্কোশ নদী আর নদী পেরোলে ভুটান পাহাড়। নদীটা বাংলোটাকে প্রদক্ষিণ করে পেছন দিয়ে ঘুরে চলে গেছে বনের গভীরে। নদীটা বাঁদিকের গভীর জঙ্গল থেকে আসছে। যেখানে সবচেয়ে কম চওড়া নদীটা সেখানে একটা বাঁশের তৈরি সাঁকো, ভুটান থেকে যারা নেমে আসে এবং যারা এদিক থেকে যায় তাদের ব্যবহারের জন্যে। মণিপুরের মোরে আর বার্মার তামুর মধ্যে যেমন, ওয়াঞ্চু নদীর ওপরে পীপিং-এ যেমন, তেমন এখানেও পাসপোর্ট ভিসার কোনও প্রয়োজন হয় না। এপার ওপারের মানুষদের সুবিধার জন্যেই ওসব কেতাবি ব্যাপার এখানে মান্য নয়। তাছাড়া, এপারের আর ওপারের নিয়মিত যাতায়াতকারীরা একে অন্যকে চেনেও। নদীর ওপারে একটা বড় দোকান কাম পানশালা আছে গাছের ছায়াতে। ভুটানিরা ওখানে বসে ছাং খায়। ভুটানের নানা ডিস্টিলারি থেকে

www.boiRboi.blogspot.com

বোতলে করেও নানা পানীয় আনে।

ঋজুদা বলছিল, সবই তো ভাল কিন্তু গোলমাল হয় এপারে খুন বা অন্য কোনও কুকর্ম করে ওপারে চলে গেলে কী ওপার থেকে এপারে চলে গেলে পুলিসের আর কিছুই করার উপায় নেই। অন্য দেশের পুলিসকে তার রাজধানীতে খবর দিয়ে প্রতিবিধান করতে করতে অপরাধীর আর পাত্তাই পাওয়া যায় না কোনও।

তখন বিকেল চারটে বাজে। তবে এপ্রিল মাস। অন্ধকার হতে হতে সাড়ে ছটা, আমরা যেখানেই বেড়াতে যাই সব সময়ে শুক্লপক্ষ দেখেই যাই বলেও রাত নামলে আমাদের ভালই লাগে। তবে মানুষখেকো বাঘের এলাকাতে অত ভাল আর লাগে না প্রাকৃতিক সৌন্দর্য যতই নয়নাভিরাম হোক না কেন!

একটু চা তো খেতে হয়, না, কি?

তিতির বলল।

সঙ্গে টা, কি আছে?

বিস্কিট আছে। বিজলি সিনেমার পাশের চানাচুরের দোকানের চানাচুর। আর কিছু নেই।

ভটকাই বলল।

ওতেই হবে। হরেনকে বল, আমাদের লপচু চায়ের প্যাকেট থেকে অল্প একটু চা বের করে টিপটে ভিজিয়ে টিপট, দুধের পট, চিনির পট সব যেন আলাদা করে নিয়ে আসে।

ঋজুদা বলল।

ডাইনিং রুমটাও সুন্দর, ছোট হলেও, দেখেছ ঋজুদা?

তিতির বলল।

আমি বললাম, ঋজুদা তো আগে এসেছে অনেকবার, শুনলে না?

ও তাই তো!

ঋজুদা পাইপটা ভাল করে ফিল করে ধরাল। দুদিক খোলা জিপে বসে পাইপ ধরানো এক হাঙ্গামা—বারবার জিপ দাঁড় করাতে হয় তাই অনেকক্ষণ পাইপ খেতে পারেনি ঋজুদা। পাইপটা ধরিয়ে একটা লম্বা টান দিয়ে তারপর ধোঁয়া ছেড়ে বলল, কেমন লাগছে বল যমদুয়ার?

আমরা সমস্বরে বললাম, দা-রু-ণ।

চল, চা-টা খেয়ে নদীর ধার ধরে কিছুটা হেঁটে আসি। হাতে-পায়ে একেবারে মরচে ধরে গেল।

নদীর ধারে আবার কী যাব, আমরা তো বসে আছি বলতে গেলে প্রায় নদীরই ওপর।

তা ঠিক।

একটা পায়ে-চলা সরু পথ বাংলোর হাতা থেকে নদীর দিকে গেছে। বোঝা গেল, এই বাংলোতে যত জলের কাজ, পানীয় জল, অন্য কাজের জল, সব আনতে হয় নদী থেকেই। বাসন মাজা কাপড় কাচা সব ওই নদীতেই সারতে হয়। এই বাংলোতে কোনও কুয়ো নেই। ত্রিশে জুনের পরে যখন বৃষ্টি নেমে যায় তখন এখানে কেউ আসে না। পথও আসার মতো থাকে না।

বাঁদিক থেকে পরপর বেশ কয়েকবার ময়ূর ডেকে উঠল। বনমুরগিও।

ঋজুদা বলল, কাল ভোরে উঠে আমরা যাব রাঙ্গা নদীর পাশের রাঙ্গা বস্তিতে। তারপর তোদের দেখাব হিমালয়ের পদদেশের তৃণভূমি। আফ্রিকার সেরেঙ্গেটির চেয়ে কিছু কম সুন্দর নয় সে তৃণভূমি। দূরে শ্রীকৃষ্ণর গায়ের রঙের মতো নীলরঙা মেঘ মেঘ পাহাড়শ্রেণী আর তার পাদদেশে ডাইনে-বাঁয়ে দিগন্তবিস্তৃত তৃণভূমি। সেরেঙ্গেটির মতো হাঁটু সমান ঘাস নয় এ—হাতি ডুবে যায় এ ঘাসে।

www.boiRboi.blogspot.com

তাই তো নাম এলিফ্যান্ট গ্রাস, উত্তরবঙ্গে যাদের বলে ঢাড্ডা।

কোন কোন জানোয়ার আছে এই বনে?

ভটকাই জিজ্ঞেস করল।

হাতি, বুনোমোষ, বড় বাঘ, চিতা, শম্বর, স্পটেড ডিয়ার, হগ ডিয়ার, বার্কিং ডিয়ার, ভাল্লুক, কত রকমের ছোট-বড় পাখি—ময়ূর, বাজ, ঈগল, ফেজেন্টস, ফ্লাইক্যাচার, মুরগি। নানারকমের সাপ।

তিতির বটের নেই?

ভটকাই জিজ্ঞেস করল।

না। তিতির বটেরের জায়গা হচ্ছে বিহার, উত্তরপ্রদেশ, মধ্যপ্রদেশ, রাজস্থান, সব শুকনো জায়গা। আমাদের বাংলা, আসাম আর ওড়িশাতে এবং অন্যান্য উত্তর-পূর্বের রাজ্যগুলিতেও খুব কম জায়গাতেই তিতির বটের দেখা যায়। বাইরে থেকে এনে ছেড়ে দিলে বাড়বে কিনা বলতে পারব না অবশ্য।

তারপর বলল, তোদের মধ্যে কেউ একবার রান্নাঘরে গিয়ে দেখে আয়। একবার চা ভেজানোটা দেখিয়ে দিলেই হরেন পারবে। রাতের জন্যে কী রান্না হবে তাও ঠিক করে দিয়ে আসিস। এই হরেন কেমন কুক আমি জানি না। আগে যখন এসেছিলাম তখন একজন রাভা চৌকিদার ছিল তার নাম ছিল ছইতান রাভা। সে ছিল খুব ভাল কুক। গারো পাহাড়ের পাদদেশের গ্রামে তার বাড়ি ছিল। তুরার পূর্ণ সাংমাকেও চিনত সে।

—আমরা তা হলে ঘুরে আসি।

যা। আর ফিরে এসে বন্দুক-রাইফেলগুলো ঠিকঠাক করে রাখ। গুলির ব্যাগ থেকে যার যার ওয়েপনের গুলি বের করে হাতের কাছে রাখ। সেগুলো থাকতেও আমাদের আনপ্রিপেয়ার্ডনেসের জন্যে মানুষখেকোতে এসে আমাদের না হলেও ড্রাইভার-চৌকিদারকেও

তুলে নিয়ে গেলে আমাদের মান কি বাড়বে? রাঙ্গা বস্তি এখান থেকে মাইল ত্রিশেক দূরে। বাঘের পক্ষে বেড়াতে বেড়াতে এখানে চলে আসা কোনও ব্যাপার নয়। ত্রিশ মাইল তো রাস্তা দিয়ে গেলে। বাঘ তো আর রাস্তা দিয়ে আসবে না। সে এলে আসবে, 'As a crow flies'—সে আসবে SHORTEST ROUTE ধরে। সেই জন্যে সব সময়েই এখানেও সজাগ থাকতে হবে। শুধুই বেড়ানো আর হবে না। টেনশনই টেনশন।

নিচ থেকে আমরা হরেনের সঙ্গে ট্রেতে করে চায়ের পট, কনডেন্সড মিল্কের টিন ফুটো করে, প্লেটে বিস্কিট আর চানাচুর সাজিয়ে নিয়ে উঠে এলাম। তিতির কতখানি চায়ের পাতা দিতে হবে তা দেখিয়ে দিয়েছিল হরেনকে। চা-টা ভাল করে একটা টিনের কৌটোর মধ্যে বন্ধ করে রাখতে বলল তিতির।

ঋজুদা খুব পাতলা চা খায়। আর ভটকাই সবচেয়ে কড়া। আমি আর তিতির মাঝামাঝি। তাই প্রথমে চা ঢালল তিতির ঋজুদার কাপে। ঋজুদা একেবারে শেষে আরেক কাপ খাবে। সেটা বলা বাহুল্য কড়া হবে। পাইপ সহযোগে সেই চা-টা খায় ঋজুদা।

চা খাওয়ার পর আমরা সবাই নেমে নদীর পাড়ে গেলাম। ঋজুদার কথামতো আমার রাইফেলটাকে গুলি ভরে কাঁধে ঝুলিয়ে নিয়ে গিয়েছিলাম। নদীর ধার ধরে হেঁটে গিয়ে প্রায় আধমাইলটাক গিয়ে আবার যখন ফিরে এলাম, তখন অষ্টমীর চাঁদ উঠেছে বন আলো করে। আমাদের মনও আলো করে।

গ্রীষ্মবনের একটা আলাদা গন্ধ আছে। দুপুরটা গরম থাকে। সন্ধের পর থেকেই হাওয়া ছাড়ে একটা—হাওয়াটা ল্যাব্রাডর গান ডগের মতো নানা গন্ধমাখা অদৃশ্য রুমাল মুখে ছোটাছুটি করে। সন্ধের পর চাঁদটা ক্রমশ উজ্জ্বল হতে থাকে, রাত ক্রমশ রুপোঝুরি

www.boiRboi.blogspot.com

হতে থাকে আর মনটা ভারী উদাস লাগে। কার জন্যে, কীসের জন্যে যে মন উদাসী হয় তা বোঝা যায় না, কিন্তু হয়। গভীর বনের মধ্যে গ্রীষ্মের শুক্লপক্ষের শোভা যারা নিশ্চুপে না দেখেছে, নিজের মনের মধ্যে সেই আলোকে না চুঁইয়ে আসতে দিয়েছে, তাদের জীবনই বৃথা।

আমরা ফিরে এসে দোতলাতে কাঠের সিঁড়ি দিয়ে উঠে দেখি যে ঘরে ঘরে লণ্ঠন জ্বালিয়ে দিয়ে গেছে হরেন। বারান্দাতেও রেখেছে একটা, গোল টেবিলের ওপরে। ঋজুদা বলল, এটা খাবার ঘরের দরজার আড়ালে করে দে তো। কাছে কোনও আলো থাকলে চাঁদনি রাত উপভোগ করা যায় না।

তাই করলাম আমি। ঋজুদা চেয়ারটা একটু এগিয়ে নিয়ে বারান্দার রেলিঙে পা দুটো তুলে দিল। আমরা সকলেই তখনও আধো-অন্ধকার বাংলোতে দোতলার বারান্দায় চুপ করে বসেছিলাম। ঋজুদার ট্রেনিংয়ে আমরা নির্জনে নৈঃশব্দ্য উপভোগ করতে শিখেছি। প্রত্যেকেই নিজের নিজের ভাবনাতে বুঁদ হয়ে আছি নিশ্চুপে। একেক জনের ভাবনা আলাদা আলাদা, পাশাপাশি বসে আছি বটে কিন্তু কারও ভাবনাই অন্যে দেখতে পারছি না। তা দেখার কোনও তাগিদও নেই কারও। অনেকের মধ্যে থেকেও কী করে একেবারে একা হয়ে যাওয়া যায় তা ঋজুদার কাছ থেকেই শিখেছি আমরা। চাঁদটা এখনও গাছপালার মাথা ছাড়িয়ে ওপরে ওঠেনি। তখনও আধঘণ্টাখানেক সময় লাগবে।

এবারে একটু হাওয়া দিতে শুরু করেছে। ঝুরু ঝুরু শব্দ হচ্ছে গাছে গাছে, শুকনো পাতা উড়ে উড়ে পড়ছে তারপর হাওয়ার পাতা ঝাঁট দেওয়ার শব্দ উঠছে, হাওয়ার দমকে দমকে সেই শব্দর গমক উঠছে। একটা পিউ কাঁহা পাখি ডাকছে পিউ-কাঁহা, পিউ-কাঁহা, পিউ-কাঁহা বলে। তার ডাক আর থামে না। সাধে কি আর সাহেবরা

এই পাখির নাম রেখেছিল ব্রেইন-ফিভার। এ বনে কোকিল নেই। কোকিল অনেক গভীর বনেই দেখিনি। শহর, আধা শহর এবং গ্রামে কোকিলের ডাক বেশি শোনা যায়। ঋজুদার শান্তিনিকেতনের বাড়িতে একটা পাগলা কোকিল আছে। সে শীত-গ্রীষ্ম-বসন্ত সব সময়েই ডেকে ডেকে পাগল করে দেয়। সঙ্কোশ নদীর পাড় ধরে আমরা যেমন হেঁটে এলাম তেমন করেই উড়ে যাচ্ছে একটা ল্যাপউয়িং— ঝাঁকি দিয়ে দিয়ে ডাকছে ডিড-উ্যা-ড্যু-ইট? ডিড-উ্যা-ড্যু-ইট? ডিড-উ্যা-ড্যু-ইট। ওই পাখিগুলো সব বনের মনের রহস্যই তাদের এই আধিভৌতিক ডাকে যেন চারিয়ে দিয়ে যায়। বনের মধ্যের যে-সব এলাকা রহস্যময় ছিল না, তা অন্ধকার রাতেই হোক কি চাঁদনি রাতে, বসন্তেই হোক কি বর্ষাতে এই পাখিগুলো রহস্যময় করে তোলে। আমরা বলি হট্টিটি আর সাহেবরা তার নাম দিল ডিড-উ্যা-ড্যু-ইট? সাহেবদের রসবোধ ছিল। ওদের জুলজিকাল নাম ওয়াটেলড ল্যাপউইঙ্গ। সাধারণত দু রকমের হয়। হলুদ আর লাল বুকের। অন্য রঙেরও হয় কিনা জানি না, আমি দেখিনি অন্তত।

আমরা সম্ভবত প্রায় পঁয়তাল্লিশ মিনিট একেবারে নিশ্চুপ হয়ে বসেছিলাম। বাবুর্চিখানাতে সালাউদ্দিন আর হরেন পুটুর পুটুর করে গল্প করছে। দরজা বন্ধ করে রেখেছে তারা ভেতর থেকে বাঘের ভয়ে তবে নিস্তব্ধতা এমনই স্বরাট এখানে যে তাও তাদের কথা শোনা যাচ্ছে বাংলোর দোতলা থেকে।

ঋজুদাও নিস্তব্ধতা ভেঙে বলল, একটা গান শোনা তো তিতির। অনেকদিন তোর গান শুনি না।

তারপর বলল, তিতিরের অনেক গুণের মধ্যে এটা মস্ত একটা গুণ যা খুব কম মেয়েদেরই থাকে।

তিতির বলল, কী?

ওই, গান গাইতে বললেই গায়।

তারপর বলল, আমার মায়ের ডায়ারিতে গিরিডির এক ভদ্রলোক লিখে দিয়েছিলেন 'লজ্জা নারীর ভূষণ, কিন্তু গানের বেলা নহে'।

আমরা হেসে উঠলাম।

ঋজুদা বলল, ধর তিতির। এই নির্জনতার ঘোরটা কেটে যাওয়ার আগে।

তিতির ধরল : "ব্যাকুল বকুলের ফুলে ভ্রমর মরে পথ ভুলে/ আকাশে কী গোপন বাণী বাতাসে করে কানাকানি, বনের অঞ্চলখানি পুলকে উঠে দুলে দুলে/বেদনা সুমধুর হয়ে ভুবনে আজি গেল রয়ে/বাঁশিতে মায়াতান পুরি কে আজি মন করে চুরি, নিখিল তাই মরে ঘুরি বিরহসাগরের কুলে..."

বাঃ। বলল ঋজুদা। তিতির শুধু গানই যে ভাল গায় তাই নয়, ওর গান নির্বাচনেরও প্রশংসা করতে হয়। তুই একটা ক্যাসেট কর না তিতির। বা সিডি।

ও কথা আর বোলো না ঋজুদা। আজকাল গরু মোষেও ক্যাসেট করছে। যারা চিরদিন রবীন্দ্র-বিরোধিতা করে গেল, যাদের জীবনে রবীন্দ্রনাথের বিন্দুমাত্র প্রভাবই পড়ল না, তারা পর্যন্ত ঝাঁপিয়ে পড়েছে সিডি বা ক্যাসেট করার জন্যে, যেন রবীন্দ্রসঙ্গীত গাইবার মতো সহজ কর্ম আর দুটি নেই।

সে শুধু রবীন্দ্রসঙ্গীতের বেলায়ই বা কেন, যে কোনও গানের বেলাতেই এ কথা বলা চলে। টিভি খুললেই যে সব গান শুনি সেই সব গানের অধিকাংশই কি গান? গলায় যাদের সুরই নেই, অন্য গুণপনার কথা ছেড়েই দিলাম, তারাও ক্যাসেট আর সিডি করছে।

নানা শ্রেণীর জাতীয় ভাঁড় আর BUFOONS-এ ভরে গেছে

www.boiRboi.blogspot.com

রঙ্গভরা বঙ্গভূমি। বড় মন খারাপ হয়ে যায় কিছু নির্লজ্জ নির্গুণ মানুষের নিরন্তর উল্লম্ফন দেখে। দলে দলে বামন চাঁদ ধরার জন্যে লাফালাফি করছে। বঙ্গভূমের সাঙ্গীতিক, সাংস্কৃতিক, সাহিত্যিক ক্ষেত্রে এমন বৈকল্য, এমন রৌরবের কথা এক যুগ আগেও আমাদের ভাবনারও অতীত ছিল। অথচ একজন মানুষকেও দেখি না এই সব ভণ্ড, মতলববাজ, পরম নির্গুণ মানুষদের সামনে দাঁড়িয়ে SPADE-কে SPADE বলেন। 'অন্যায় যে করে আর অন্যায় সে সহে, তব ঘৃণা তারে যেন তৃণসম দহে'। শুধু অন্যায়কারীদের দোষ দিলেই তো চলবে না।

আমি বললাম, এই নির্জনতার মধ্যে চুপচাপ থেকে যে পুণ্যটা সঞ্চয় করা গেছিল তুমি কিছু বাজে মানুষের প্রসঙ্গ তুলে এমন নির্মল পরিবেশটাই দূষিত করে দিল ঋজুদা।

ঋজুদা বলল, আই অ্যাম স্যরি। তুই ঠিকই বলেছিস।

তিতির বলল, অন্ধ শিল্পী বিনোদবিহারী মুখোপাধ্যায় একজনকে একটি চিঠিতে লিখেছিলেন : 'নির্জনতা কখনওই কারোকে খালি হাতে ফিরায় না।'

বাঃ। আমি বললাম।

ঋজুদা বলল, এ কথা শুধু উনি কেন, রবীন্দ্রনাথ তো তাঁর সারাজীবনের সাধনা দিয়ে তাঁর দীর্ঘ নির্জনবাসের মধ্যে দিয়ে, সে পদ্মার ওপারের বোটেই হোক কী শিলাইদহে বা শান্তিনিকেতনে আমাদের এই কথাই তো শিখিয়ে গেছেন। শুধু রবীন্দ্রনাথই কেন? ওয়াল্ট হুইটম্যান, হেনরি ডেভিড থোরো এবং এমন অগণ্য বড়মাপের মানুষে কি তাই আমাদের শিখিয়ে যাননি?

তারপর বলল, ভটকাই, তুই পড়বি হুইটম্যানের LEAVES OF GRESS, থোরোর THE WALDEN। পরীক্ষার জন্যে নোট মুখস্থ

www.boiRboi.blogspot.com

করলেই চলবে না।

হু। ভটকাই অত্যন্ত আনকমফর্টেবল হয়ে বলল।

এসব সিরিয়াস আলোচনাতে ভটকাইয়ের কোনওদিনই মতি ছিল না।

আমি বললাম, ভটকাই, ঋজুদাকে একটা গান শোনা না, বাংলা ব্যান্ডের।

আমি ভেবেছিলাম গভীর রবীন্দ্রভক্ত ঋজুদা বাংলা ব্যান্ডের প্রসঙ্গ ওঠাতে বিরক্ত হবে কিন্তু আমাকে অবাক করে দিয়ে ঋজুদা বলল, শোনা না ভটকাই। আমার তো খুব ভাল লাগে ভূমি, চন্দ্রবিন্দু, ক্যাকটাস ইত্যাদি ব্যান্ডের গান।

তিতির বলল, তোমার কি মনে হয় না রবীন্দ্রসঙ্গীতের প্রতি অবজ্ঞার পেছনে এই সব গানও কিছুটা দায়ী।

একেবারেই মনে করি না। রবীন্দ্রসঙ্গীত ততদিন থাকবে এবং গোরু মোষের গাওয়া গান নয়, শুদ্ধ এবং সুস্থ রবীন্দ্রসঙ্গীত, বাঙালি যতদিন বাঁচবে। রবীন্দ্রনাথের প্রতিভা উচ্চিংড়েদের প্রতিভা নয় যে বাংলা ব্যান্ড তা নিশ্চিহ্ন করে দেবে। আমার তো মনে হয় রবীন্দ্রনাথ বেঁচে থাকলে এই তরুণদের গান সবচেয়ে বেশি অ্যাপ্রিসিয়েট করতেন।

তিতির বলল, Aren't you contradicting yourself?

ঋজুদা বলল, Not the least, তবে WHITMAN-কেই QUOTE করে বলি Do I contradict myself? Very well! I do contradict myself because I am large I contain multitudes'. WHITMAN-এরই মতো রবীন্দ্রনাথও বিশাল ছিলেন, তাঁর মধ্যে অনেক কিছুই আঁটত।

বলেই, ঋজুদা বলল, না পরিবেশটা সত্যিই আমি ভারাক্রান্ত

করে তুললাম। কী রান্না হচ্ছে রাতে? ভটকাইচন্দ্র?

কী আর হবে? আমাদের জন্যে যা বরাদ্দ, সেই খিচুড়ি, আলু কি ভর্তা, বেগুন ভাজা আর আমের আচার।

বাঃ। ফারস্ট ক্লাস। কাল কিন্তু এক কাপ করে চা খেয়েই বেরিয়ে পড়তে হবে খুব ভোরে যাতে ফিরে এসে লেট ব্রেকফাস্ট করতে পারি।

ব্রেকফাস্ট নাই বা খাওয়া হল। খাই তো রোজই। আসলে যেখানে গিয়ে বাঘের খোঁজখবর করতে কত বেলা হবে কে জানে! আর যদি হদিশ পাওয়া যায় তবে তো তাড়াতাড়ি ফেরা নাও হতে পারো।

তা তো ঠিকই।

রান্না কটা নাগাদ শেষ হবে খোঁজ নিয়ে আয় রুদ্র। রাইফেলটা নিয়ে যা। কোনও রিস্ক না নেওয়াটাই ভাল। রান্না হলে খাওয়াদাওয়ার পরও ঘন্টাখানেক এই বারান্দাতে বসে তারপর শোওয়া।

আমি যখন কাঠের সিঁড়ি দিয়ে ধুপ ধুপ শব্দ করে নীচে নামছি তখন হঠাৎ চোখ গেল আকাশে। অষ্টমীর চাঁদ তখন বনের মাথা ছাড়িয়ে ওপরে উঠে এসেছে। চাঁদের আলো ছড়িয়ে পড়েছে সবখানে।

৩

নানা গাছের জঙ্গলের মধ্যে দিয়ে জনহীন, যানহীন মাটির সরু পথ দিয়ে জিপ চালাচ্ছি। তিতির ভটকাইকে কোম্পানি দেওয়ার জন্যে পিছনে গিয়ে বসেছে। শিমুল, হিজল, গামহার, সিধা গাছ, শাল এবং আরও নানা গাছ তো আছেই। তবে বিহার বা উত্তরপ্রদেশ বা মধ্যপ্রদেশ বা ঝাড়খণ্ডের বাস্তার কী মহারাষ্ট্রের জঙ্গলের এই সব গাছেরই যেমন আলাদা চেহারা তেমন আসামের গাছের। এখানে বৃষ্টিপাত অনেক বেশি হয়, মাটিও অন্যরকম। অহমিয়াতে এখানের নানা গাছকে বলে পোমা, নাহর, বনশুক, গামারি, সিধা, বরুণ, ওজার,হুঁয়ালো, ভেঁলো, সাতিয়ান। এই ভেঁলো হচ্ছে শিমুলের মতো। গামহারি তো গামহার। আর সাতিয়ান হচ্ছে আমাদের ছাতিম। ধুবড়িতে বলে ছাতিয়ান। একটা রাস্তা আছে ধুবড়ি শহরে, যার নাম ছাতিয়ানতলা রোড।

এই ভেঁলো দিয়ে ভাল তক্তা হয়, বুঝলি রুদ্র। এজারম বলে

www.boiRboi.blogspot.com

একরকমের গাছ আছে, ওই দ্যাখ, পেয়েছি একটা। জিপটা দাঁড় করা। দ্যাখ কী সুন্দর গোলাপি ফুল ফুটেছে। এই তো সময় ফুল ফোটার। আর বাঁদিকে দ্যাখ শিমুল তুলোর বীজ ফেটে তুলোর আঁশ কেমন উড়ে যাচ্ছে আলতো প্রভাতী বৈশাখী হাওয়াতে। মনে হয় না, সব কাজকর্ম ছেড়েছুড়ে দিয়ে ওটা বীজফাটা তুলোর আঁশের সঙ্গে নিজেকে ভাসিয়ে দিই?

যা বলেছ।

আমরা সমস্বরে বললাম।

শুধু কি গাছ আর ফুল, পাখি?

আমি জিপ চালাতে চালাতে গেয়ে উঠলাম : "পাখি বলে চাঁপা আমারে কও/কেন তুমি হেন নীরব রও/প্রাণভরে আমি গাহি যে গান/সারা প্রভাতেরই সুরের দান, সে কি তুমি হৃদয়ে নাও/কেন তুমি নীরবে রও..."

তারপরই বললাম, পদ ভুলে গেছি।

তিতির গান গেয়ে বাণী পূরণ করল। গাইল, "চাঁপা শুনে বলে 'হায় গো হায়, যে আমারই পাওয়া শুনিতে পায় নহ নহ পাখি তুমি সে নও।"

ঋজুদা বলল, চল আমরাও একটা ব্যান্ড করে ফেলি, আমরা মানে তোরা তিনজন। নাম দে 'তিনসঙ্গী'—তাতে রবীন্দ্রনাথের গান যেমন থাকবে তাতে অন্যদের গানও থাকবে, থাকবে আমাদের নিজেদের লেখা গানও।

এখানে কী কী পাখি আছে ঋজুদা?

কী পাখি নেই তাই বল? সব পাখির নাম তো বলা যাবে না। তাছাড়া অনেক পাখিকেই তোরা চিনিস। কত রকমের ঈগল, ব্যাবলার, থ্রাশার, বাজ, শকুন, চিল, মৌটুসি, চন্দনা, পাপিয়া—যে

www.boiRboi.blogspot.com

পাখি কাল রাতে পাগলের মতো ডাকছিল। এদেরই আরেক নাম 'চোখ গেল'—আমাদের সময়ের একটি বিখ্যাত আধুনিক গানের প্রথম কলি : 'চোখ গেল, চোখ গেল, চোখ গেল পাখিরে—চোখ গেল পাখি।' এদের নাম যে Brain-fever তা তো বলেইছি। এদের Hawk Cuckoo (cuculus varius) ও বলে। পাখির কি শেষ আছে? কতরকমের প্যাঁচা আছে এখানে।

কী কী রকম?

ভটকাই শুধোল।

কত্তরকম আছে। লক্ষ্মী পেঁচা, খুরুলে পেঁচা, কুটুরে পেঁচা, ভুতুম পেঁচা।

কপারস্মিথ পাখি, যারা টক টক টক করে আওয়াজ করে এবং কাছ থেকেই তাদের দোসর ক্রমান্বয়ে সাড়া দিতে থাকে তাদের বাংলা নাম কী ঋজুদা? অনেকদিন তোমাকে জিজ্ঞেস করব ভেবেছি কিন্তু ভুলে গেছি।

একরকমের বসন্তবৌরি। আবার নীলকণ্ঠও।

ওদের নাম নীলকণ্ঠ বসন্তবৌরি।

এদেরই নাম বসন্তবৌরী।

এ ছাড়াও কতরকমের যে বুলবুল, মুনিয়া, মৌটুসি আছে তার ইয়ত্তা নেই।

তারপর বলল, আমি কি ORNITHOLOGIST? আমি জঙ্গলে আসি, বলতে পারিস কবির চোখ নিয়ে। অত বেশি জানলে ভালবাসাটাই মরে যায়। এ কথা বোধহয় জীবনের সব ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য। আমি পণ্ডিত হতে চাইনি কোনওদিনই, প্রেমিক হতেই চেয়েছিলাম। তবে পণ্ডিতদের প্রতি আমার কোনওরকম অসূয়া নেই। বরং শ্রদ্ধা আছে। তোদের মধ্যে যদি কেউ পণ্ডিত হতে চাস তবে

যখনই জঙ্গলে আসবি তখনই সালিম আলির বই সঙ্গে করে নিয়ে আসবি। কয়েক বছর আগে প্রণবেশ সান্যাল এবং বিশ্বজিৎ রায়চৌধুরির লেখা 'বাংলার পাখি' নামের একটি বই বেরিয়েছে। সেই বইটিও সঙ্গে রাখতে পারিস। খুব ভাল বই।

সে তো বাংলার পাখি। বিহারের বা আসামের তো নয়।

তা নয়, তবে বাংলার পাখিও যে অন্য অনেক রাজ্যেই দেখা যায়। পাখিদের তো এক রাজ্য থেকে অন্য রাজ্যে বা এক দেশ থেকে অন্য দেশে যেতে পাসপোর্ট-ভিসা লাগে না। তবে বলা যায় না, সুদূর ভবিষ্যতে একদিন হয়ত লাগতেও পারে।

আমি বললাম, আর কত পথ বাকি ঋজুদা?

কত পথ এলি?

মাইল কুড়ি তো হবেই।

তাহলে রাঙ্গা বস্তিটা আর মাইল দশেক হবে। কমও হতে পারে। তারও মাইল পাঁচেক বাদে রাঙ্গা নদী।

আমরা বস্তিতে দাঁড়াব, না নদীতে যাব সোজা?

দাঁড়াব বৈকি—নইলে বাঘের খোঁজখবর করব কী করে! বাঘ এখনও এ অঞ্চলে আছে না অন্যত্র চলে গেছে তার খোঁজ তো নিতে হবে। চলে গিয়ে থাকলে তো আমরা বেঁচেই গেলাম—ছুটিটা নিছক ছুটি হিসেবেই কাটানো যাবে। আর না চলে গিয়ে থাকলে তো ফেঁসে গেলাম।

আরও মিনিট পনেরো পরে জঙ্গল ফাঁকা হয়ে গেল। গ্রামের সীমান্তে এসে পৌঁছলাম আমরা। প্রায় কুড়ি-পঁচিশ ঘর মানুষের বাস—চাষাবাদের জন্যে জমি—তৃণভূমি—গরু-মোষও চরছে দেখলাম। মানুষজনও দেখলাম। নানা কাজে ব্যস্ত। তবে দিনের এই সময়ে যে কোনও গ্রামে যেমন হাঁকাহাঁকি ডাকাডাকি হয়, তার

লেশমাত্র নেই।

ঋজুদা বলল, আমি বছর পনেরো আগে এসেছিলাম যমদুয়ারে। তখন দুঃসাহসী কজন যাযাবর চুড়য়া মুসলমান, যারা ব্রহ্মপুত্রের চরে বর্ষার শেষ থেকে বর্ষার আরম্ভ অবধি যাযবরের মতো থাকত—এসে এখানে এই হাতি, বুনো মোষ আর বাঘের জঙ্গলে ঘর বেঁধেছিল। আর আজ কত বড় গ্রাম হয়ে গেছে। কী পরিমাণে বংশবৃদ্ধি হয়েছে ভাব। অবশ্য আরও নতুন মানুষও এসে থাকতে পারে। কিছু ভুটিয়া মুখও দেখলাম যেন। এরা কি ভুটান থেকে এসেছে? অনুপ্রবেশকারী?

তারপর বলল, জিপটা ওই করম গাছটার নীচে দাঁড় করা। নেমে দেখি, খোঁজখবর লাগাই।

আমাদের জিপের ইঞ্জিনের শব্দ পেয়েই পথের ওপরে জনাদশেক মানুষের একটা রিসেপশন কমিটির মেম্বারেরা জমায়েত হয়েছিল। ভটকাই আর তিতির জিপেই রইল। কতগুলি কৌতূহলী উলঙ্গ ও আধা উলঙ্গ শিশু জিপের পাশে ভিড় করল। এ পথে কোনও গাড়ি আসে না-মাসে ছ-মাসে। বাস-টাস তো নেইই। তা ছাড়া তিতিরকে দেখে ওদের কৌতূহলের মাত্রা ছাড়িয়ে গেছিল।

আমরা কিছু বলার আগেই রিসেপশন কমিটি বাড়ির বাইরের গোবর-নিকোনো বারান্দাতে মাদুর পেতে দিল। গাছগাছালি থাকাতে সে জায়গাটাতে ছায়া ছিল। একটা পেতলের কাঁসিতে করে মুড়ি আর বাতাসা নিয়ে এল আর বদনাতে করে জল।

ঋজুদা বলল, জিপটা এখানেই নিয়ে এসে ওই রাধাচূড়া গাছটার নীচে রাখতে বল। যতটুকু ছায়া পাবে, পাবে।

আমি হাত নেড়ে ওদের জানালাম। তিতিরই স্টিয়ারিংয়ে বসে জিপ চালিয়ে নিয়ে এল। তা দেখে গ্রামের মানুষের অবস্থা আরও

www.boiRboi.blogspot.com

সাঙ্ঘাতিক হল সম্ভবত। এ গ্রামে তো বিজলি নেই। এলেও, টিভি কেনার সামর্থ্য ওদের আরও অনেক বছরই হবে না। তাই মডেল কিংবা অভিনেত্রী কারওকেই তারা দেখতে পায় না, সিনেমা হলে গিয়ে কোনও ছবি দেখতে হলে তো প্রায় অন্য গ্রহে যাওয়ারই সমান ব্যাপার। তাই চোখ বড় বড় করে ওঠা বন্দুকধারী গাড়ি-চালানো সুন্দরী তিতিরকে দেখতে লাগল।

গ্রামের যে মোড়ল, তার নাম বসির সর্দার। রোগা-পাতলা মানুষটি—লালা-সাদা চেক চেক লুঙ্গি আর খয়েরি রঙা ফতুয়া গায়ে, মুখে সাদা দাড়ি, সেই আপ্যায়ন করে বসাল আমাদের।

ঋজুদা বলল, খাতির-যত্নের দরকার নেই, বাঘের খবর বলো সর্দার।

সর্দার মানুষটি বেশ সপ্রতিভ। সে বলল, বাঘের খবর বলব বলেই তো খাতিরযত্ন করছি। আমি এখানে কুড়ি বছর হল আছি—কোনওদিন মানুষখেকো বাঘের অত্যাচার ছিল না। এ বাঘটা অন্য জায়গা থেকে এসেছে। হয়ত ভুটান থেকে। সঙ্কোশের ওপারে ভুটানেও মানুষ মেরেছে বাঘটা। গত তিন বছর আগে শীত ফুরোতেই এখানে এল। এখানের মাদী বাঘের সঙ্গে জোট বেঁধে—আবার বর্ষা আসার আগে চলে গেল। রাঙ্গা নদীর পারের জঙ্গলে একটি মাদী বাঘ আছে প্রায় দশ বছর হল। সে কখনও কোনও ঝামেলা করে না। বাচ্চা হলে বাচ্চা নিয়ে এখানেই থাকে। ওই মদ্দা বাঘটা তিনটের মধ্যে দুটি বাচ্চা খেয়ে নিয়েছিল। আমাদের তো জঙ্গলে যেতে হয়, সব খবরই রাখতে হয়।

বাঘটা শেষ মানুষ মেরেছে কবে?

দিন পনেরো হল।

গ্রামের অন্য একজন লোক বলল, গত পূর্ণিমাতে মেরেছিল।

www.boiRboi.blogspot.com

কোথায়?

এই গ্রামেরই বাইরে লোকটি যখন তার গরু নিয়ে ফিরছিল সন্ধের আগে আগে।

গ্রামের কত বাইরে?

গ্রামের লাগোয়াই। রাঙ্গা নদীর শুকনো বুকে।

রাঙ্গা এত কাছে নাকি? আমার যেন ধারণা ছিল এখান থেকে মাইল পাঁচেক হবে।

আগে হয়তো তেমনই ছিল। নদী মন করেছে, পথ বদলেছে। কোনদিন আমাদের এই গ্রামকে খেয়ে ওর ওপর দিয়েই বইবে হয়ত। আমাদের এ জায়গা ছেড়ে যেতে হবে শিগগির আরও নানা কারণে।

কেন? আর কী কারণ?

বর্ডার জায়গা। এখানে মানুষ খুন করে, গ্রামের মেয়েদের ধরে নিয়ে খারাপ মানুষেরা ভুটানে চলে যাচ্ছে। একে তো এখানে পুলিসের কোনও কারবার নেই, বনবিভাগের মানুষেও আসে না তার পুলিস—তার ওপর খুব বড় বড় চোরাশিকারির দল শুকনো রাঙ্গা নদীর চরে মস্ত মস্ত মাচা বেঁধে তাতে অনেকে মিলে থাকে। দূরবীন লাগানো রাইফেল দিয়ে বড় বড় বুরুন্টিকা মেরে দাঁত কেটে নেয়—কখনও গণ্ডার পেলে তাও মেরে খড়্গ কেটে নেয়। তাদের কাছে মেশিনগান থাকে—মাচার ওপরে ফিট করে রাখে।

মেশিনগান মানে?

মানে একবার ঘোড়া দাবালে ঝর্ণার মতো গুলি বেরোতে থাকে আর থামার নামটি করে না।

ও বুঝেছি। এ কে ফর্টি সেভেন হবে।

নাম জানি না তবে তাদের চরিত্র জানি।

তারপর বলল, তেমন চোরাশিকারীদের সঙ্গে আপনাদের এই

সব পাখি মারা, হরিণ মারা বড় জোর বাঘ মারা অস্ত্র দিয়ে কী করে মোকাবিলা করবেন?

তা তারা জঙ্গলে থাকে, তোমাদের কীসের অসুবিধা?

এখানে এসেও যে হামলা করে। চাল ডাল নিয়ে যায়। মেয়েদের বে-ইজ্জত করে। আপনাদের সঙ্গে এমন সোন্দোর মাইকানা এনে কাজ ভাল করেননি। ওরা জানতে পেলে হামলে পড়বে।

এখানে গণ্ডারও আছে?

আছে বৈকি!

তিতির ততক্ষণে এসে বসেছে আমাদের পাশে। সে বলল, একবার এসে দেখুকই না।

ঋজুদা বলল, বোকা বোকা কথা বলিস না তিতির। ওদের কাছে এ কে ফর্টি সেভেন থাকে, ওরা ইচ্ছে করলে আমাদের সবাইকে উড়িয়ে দিতে পারে।

তিতির একটু বিরক্তির সঙ্গে বলল, এখন আমাদের প্রবলেমটা কী? ওই চোরাশিকারিরা? না মানুষখেকো বাঘ?

ভটকাই বলল, বেস্ট হচ্ছে ওদের মানুষখেকো বাঘ দিয়ে খাইয়ে দেওয়া।

ঋজুদা এবং আমরাও ভটকাইয়ের কথায় হেসে উঠলাম।

ঋজুদা বলল, তোর বু-দ্ধি-ই আলাদা।

আমি বললাম, বাঘে ফেরো ঋজুদা।

ঋজুদা বলল বসির সর্দারকে, হ্যাঁ, তারপর বলো সর্দার।

ও যখন ওর গরু নিয়ে গ্রামে ফিরছিল তখন বাঘ ওকে ধরল। গরুর দিকে ফিরেও তাকাল না। গরুটা বাঘ দেখে ঊর্ধ্বশ্বাসে দৌড় মেরে সোজা গ্রামে। গরুর চেহারা দেখেই গ্রামে যারা ছিল তারা বুঝেছিল যে গরুর মালিককে বাঘে নিয়েছে। আমাদের গ্রামে, মিথ্যে

www.boiRboi.blogspot.com

বলব না, দুটো গাদা বন্দুক আছে। তাতে বারুদ গাদা হল—অন্যরা বল্লম, রামদা, তীর-ধনুক নিয়ে তাদের সঙ্গে জুটল। এদিকে সন্ধে হয়ে আসছিল। ততক্ষণে চাঁদ উঠে গেছিল, পূর্ণিমার রাত, চারদিক পরিষ্কার দেখা যাচ্ছিল, তাই আমাদের সাহস হয়েছিল। আমরা দূর থেকে দেখতে পেলাম কালো বাঘ মুনসের আলির বুকে বসে তাকে খাচ্ছে। আমরা চিৎকার চেঁচামেচি করতে করতে এগোলাম। একটা বন্দুক দে সেইদিকে চোটও করা হল। তবে অনেক দূর ছিল। গুলি গিয়ে পৌঁছল না সেখান অবধি। তবে বাঘকে মারবার জন্যে তো চোট করা হয়নি। বাঘের গায়ে গুলি লাগলে বাঘ দৌড়ে এসে তিন-চারজনকে মেরে দিত। তীরও ছুঁড়ল কেউ কেউ। খুব চিৎকার করতে করতে বাঘকে তাড়াবার জন্যে আমরা এগিয়ে যেতেই বাঘ মুনসেরকে ফেলে আমাদের দিকে ভীষণ গর্জন করে তেড়ে এল। সে গর্জনে এখানের মহা মহা শালগাছও যেন পড়ে যাবে বলে মনে হল। হনুমান ডাকতে লাগল হুপ হুপ হুপ করে, ময়ূর ডেকে উঠল কেঁয়া কেঁয়া করে। আমরা পড়ি কি মরি করে দৌড়ে পালিয়ে এসে প্রাণ বাঁচালাম। দ্বিতীয় চোটটা হয়ত বাঘের গায়ে লেগেছিল নইলে বাঘ অমন রেগে তাড়া করে আসত না।

এই তো গোলমাল করো তোমরা। গাদা বন্দুক দিয়ে দূর থেকে গুলি করবে—তাতে আহত হয়ে ভাল বাঘ মানুষখেকো হয়ে যেতে পারে আর এ তো মানুষখেকোই।

তা কী করা যাবে। মুনসের বিয়ে করেছিল দু বছর আগে। একটা বাচ্চাও ছিল তার এক বছরের। তাকে তো গোর দিতে হত। শরীরের কিছুটা অন্তত পেলে আমাদের কাজ চলে যেত কিন্তু তা তো হল না। পরদিন সকালে গিয়ে হাড়গোড় আর মাথার অর্ধেকটা এনে গোর দিলাম।

তারপরে বাঘটার আর কোনও সাড়াশব্দ পাইনি। একটা বাঘ প্রায় দিনই সন্ধের আগে হুঁয়াও হুঁয়াও করে ডেকে ফেরে। সেটা বাঘ না বাঘিনী বলতে পারব না। আমরা তো জঙ্গলে এসেছি মাত্র ক'বছর হল। আমরা চড়ুয়া। আমরা নদীর মন বুঝি, নদীর ভাষা বুঝি, বাঘের ভাষা তেমন বুঝি না, তাদের ঘোঁৎ-ঘাতও তেমন বুঝি না। শিকারও তো করিনি কোনও জন্মে। তাই যা বলছি আমরা আন্দাজেই বলছি। শেষে মোদ্দা কথাটা বলি বাবু, এই বাঘটাকে মারতে না পারলে আমাদের এখান থেকে পাততাড়ি গোটাতে হবে। কিন্তু যাব কোথায়? গঙ্গাধর নদীও তাড়িয়ে দিল আমাদের! এখন তাড়াবে এই জঙ্গল থেকে। কিন্তু আমরা যাবটা কোথায়? কোথাও গিয়ে জমি কিনে বসত করব তেমন সাধ্য তো আমাদের নেই অথচ বেঁচে তো থাকতে হবে।

ঋজুদা বলল, বাঘ যদি আবার কোনও মানুষ ধরে তাহলে আমাদের সঙ্গে সঙ্গে খবর দেবে বসির মিঞা।

ইনশাল্লা, আর যেন মানুষ না নেয়। হারামজাদা কোন দিকে গেল কে জানে! যে বাঘটা ডাকে সেটা বোধহয় বাঘিনী—ওই বাঘটাকেই ডাকে হয়ত। কমু ক্যামনে?

তারপর বলল, মানুষ যদি আবারও মারে তাহলে খবর দেব কী করে?

আমরা তো যমদুয়ারের বাংলোতে আছি, সঙ্কোশ নদীর ওপরে।

ওই হারামজাদা বাঘ তো ওই নদী পারাইয়াই আসে ভুটান থিক্যা?

তুমি ক্যামনে জানতাছ?

সিওর কইতে পারুম না, তবে আমার শক হয় তেমনই।

হেঁটে যেতে তো অনেকই সময় লাগবে এখান থেকে যমদুয়ার।

হাঁইট্যা যামু না, আমার টাট্টু ঘোড়া আছে একখান, যেই যাক

www.boiRboi.blogspot.com

খবর দেওনের জন্যে ওই ঘোড়ায় চইড়ায় যাইবনে। এক ঘণ্টার মধ্যে পৌঁছাইয়া যাইব।

ঠিক আছে। আমরা একটু রাঙ্গা নদী থেকে ঘুরে আসি। চোরাশিকারিরা কি এখনও আছে নাকি?

তা কইতে পারুম না। আমরা তো ওই দিক এড়াইয়া চলি। দেখা হইলে কখন কি অর্ডার করইয়া বসে কে কইতে পারে।

ঠিক আছে। আমরা নিজেরাই দেখে নিচ্ছি।

এবার তিতিরকে স্টিয়ারিংয়ে বসতে দিয়ে আমি পেছনে গেলাম। রাইফেল লোড করে নিলাম। ঋজুদাও লোড করল তার পয়েন্ট থ্রি সিকটি সিক্স। আমার বন্দুকটা ভটকাইয়ের কাছে। সেটাও লোড করে নিল ভটকাই। তিতির তার কোমরে চামড়ার হোলস্টারে বেঁধে-রাখা পিস্তলটাকে হাতে নিয়ে ব্যারেলে গুলি আনল ম্যাগাজিন থেকে। তারপর পিস্তল রেখে হোলস্টারের বোতামটা খুলে রাখল।

দশ মিনিটের মধ্যেই আমরা একটি বিস্তীর্ণ শুকনো নদীখাতে এসে পৌঁছলাম। বেশ চওড়া নদী। যমদুয়ারের কাছের সঙ্কোশের প্রায় দুগুণ, কী বেশিও হতে পারে। মাঝে মাঝে এলিফ্যান্ট গ্রাসের ঝোপ, পাথর পড়ে আছে ইতস্তত—বর্ষাতে শরতে নদীর খাত বেয়ে গড়িয়ে আসা। একটা বড় শিমুলের নীচে শিমুল ফুলের কার্পেট বিছানো আছে। তার ওপরেই পার্ক করিয়ে রাখল জিপটা তিতির। তারপরে আমরা নেমে সিঙ্গল ফরমেশনে ঋজুদার পিছন পিছন চলতে লাগলাম নদীর গিরিখাতের বাঁদিক ঘেঁষে। প্রায় শ'দুয়েক গজ যাওয়ার পরে বাঁদিকের সামান্যই উঁচু পারে উঠে ঋজুদা থমকে দাঁড়াল। হাতছানি দিয়ে ডাকল আমাদের। আমরা ঋজুদার কাছে পৌঁছে পারে উঠে সামনে তাকিয়েই চমকে গেলাম।

বসির সর্দার মিথ্যে বলেনি। দু-তিনটে কুরুম গাছের মধ্যে মোটা

মোটা ডাল দিয়ে বানানো মস্ত একটা মাচা। এতবড় মাচা যে তাতে একসঙ্গে পঞ্চাশজন মানুষ শুয়ে বসে থাকতে পারে। মাচার নীচে মাটির পোড়া হাঁড়িকুড়ি, কাঠকয়লার ছাই পড়ে আছে। ওরা যখন ছিল তখন রান্না হত। আর সেই মাচার সামনে বিস্তৃত বন, এলিফ্যান্ট গ্রাসের। তার শেষ প্রান্তে মেঘ মেঘ নীল পাহাড়শ্রেণী। হিমালয়। বনটা ঘনসন্নিবদ্ধ নয়, ছাড়া ছাড়া, যাতে জানোয়ারের চরে বেড়াতে সুবিধা হয়।

আমি আর ভটকাই ঋজুদাকে বলে মাচাতে চড়লাম। চড়বার জন্যে চওড়া সিঁড়িও করা ছিল। ওপরে না উঠলে সেই ঘাসবনের ব্যাপ্তিটা ঠিক বুঝতে পারতাম না। অনেক দূরে দেখলাম একদল বুনো মোষ চরে বেড়াচ্ছে আর হাতির একটা মাঝারি দল। হাতিরা প্রায় পাহাড়শ্রেণীর কাছাকাছি ছিল। আফ্রিকান হাতিরা আমাদের দেশের হাতির চেয়ে অনেক বড় হয় দেখতে তবে আমাদের হাতিরা অনেক বেশি সুন্দর। খাদ্যর তফাতেই বোধ হয় এদের লাবণ্য বেশি। আফ্রিকান, বিশেষ করে পূর্ব-আফ্রিকান হাতিদের প্রধান খাদ্য হচ্ছে আকাসিয়া। আমাদের দেশের মতো এত জলও ওরা পায় না, ওয়ালোয়িং করবার খাবারও। এটা আমার আন্দাজ। ঋজুদা দিল্লি গেলে এস এস বিস্ত সাহবকে জিজ্ঞেস করে আসতে বলব। বিস্ত সাহেব এখন ডিরেক্টর, এলিফ্যান্ট প্রোজেক্টস। এই বিস্ত সাহেবই বক্সা টাইগার প্রজেক্টের ফিল্ড ডিরেক্টর ছিলেন যখন ঋজুদার সঙ্গে আমরা বক্সাতে যাই।

সেই মাচা থেকে দেড়শো গজ মতো সামনে একটি জলাভূমি ছিল বর্ষাতে—তা এখন শুকোতে শুকোতে এসে একটি ছোট্ট জলাতে পরিণত হয়েছে। এই জলার পাশে, সে জলা যত ছোটই হোক নানা জানোয়ারের পায়ের ছাপ পাওয়া যাবে। সেই কথা ঋজুদাকে বলতে

বলতে নামলাম ওপর থেকে। এই তৃণভূমি দেখে পূর্ব আফ্রিকার তানজানিয়ার সেরেঙ্গেটির কথা মনে পড়ে গেল আমার। এত বড় তৃণভূমি ভারতের আর খুব কম ট্রপিকাল বনেই আছে বোধহয়।

আমরা নামলে চারজনেই এগিয়ে গিয়ে সেই জলার কাছে পৌঁছলাম। কিন্তু খুবই বিপজ্জনকভাবে পৌঁছলাম। তিতিরের গোড়ালিতে একটা SPRAIN হল মচকে গিয়ে। এখানে জল যখন বেশি ছিল এবং এর আয়তনও বিরাট ছিল তখন হাতি, বুনো মোষ, গাউর, গণ্ডার নানা জাতের হরিণ এবং বাঘ ও চিতা নিয়মিত আসত। হাতি ও মোষরা জলে-কাদায় ডুবেও থাকত—ইংরেজিতে যাকে বলে WALLOWING। তখন কাদার মধ্যে হাতিদের অগণ্য পায়ের ছাপে হামান দিস্তার মতো গর্তের সৃষ্টি হয়েছিল। এখন সেই সব গর্ত শুকিয়ে গেছে এবং তার উপরে নানা বনজ লতা গজিয়ে গেছে, ফলে গর্তগুলো আর দেখা যায় না। যায় না বলেই পা পড়ে যায় গর্তে। এখন জলের যা আয়তন এবং প্রকৃতি তাতে কোনও জানোয়ারই গা ডুবিয়ে বসে থাকতে পারে না, বাঘ কী হরিণ-টরিণ ছাড়া—তবে সব হরিণ তো গা ডোবায় না, শম্বরেরা অবশ্য অনেক সময় ডোবায়।

জলটার তিনদিকে যে সব ছাড়া ছাড়া বড় গাছ আছে তাদের গায়ে বিভিন্ন উচ্চতাতে নানা জানোয়ারের কাদামাখা লোম লেগে আছে। বুনো মোষ, গাউর, শম্বর ইত্যাদিরা গায়ের পোকার চুলকানির উপশমের জন্যে গাছের সঙ্গে গা ঘষে, বিশেষ করে WALLOWING-এর পরে—তাই কাদামাখা গায়ের লোম আটকে আছে গাছের মোটা মোটা গুঁড়িতে। উচ্চতার রকমফের ও লোমেরও রকমফের দেখে অনুমান করতে হয় কোনটা কোন জানোয়ারের। এই জলেরই সামনে ঋজুদার তীক্ষ্ণ চোখ এতরকম শুকিয়ে যাওয়া পদচিহ্নের মধ্যে আবিষ্কার করল বাঘের পায়ের দাগ। একেবারে

www.boiRboi.blogspot.com

টাটকা না হলেও বাঘ গত এক-দুদিনের মধ্যে এখানে জল খেয়েছে। বেশ বড় বাঘ এবং হয়ত বুড়ো বাঘ। তার মানুষখেকো হওয়ার কারণটা বোঝা যাবে শুধুমাত্র তাকে মারার পরই, যদি মারা যায়। বাঘের পায়ের দাগ অনুসরণ করে ঋজুদা বাঘ কোথা থেকে এসেছে এই জলে জল খেতে তা দেখার জন্য উল্টোদিকের পথে চলতে লাগল। রাঙ্গা নদীর ওই শুকনো কাঁকরমেশা বালিতে বাঘের পায়ের দাগ সঠিকভাবে অনুসরণ করা আমাদের সাধ্য ছিল না। ঋজুদা চলছে তো চলছেই। আমরা পেছন পেছনে ডাইনে-বাঁয়ে এবং পেছনেও নজর রাখতে রাখতে। পুরো রাঙ্গা নদী পেরিয়ে গিয়ে ঋজুদা একটা শাখা ধারাতে এসে পড়ল। সেটাও পুরোপুরি শুকনো। সেই শাখা ধারাটির দুটি মুখ। অর্ধচন্দ্রাকারে শাখা ধারাটি রাঙ্গা নদীতে এসে মিশেছে দু-দিকে। দেখা গেল সেই শাখা নদী পেরিয়ে, বাঘ জল খেয়ে ওদিকের জঙ্গলে চলে গেছে যেদিকে এদিকের চেয়ে অনেক নিরিবিলি।

ঋজুদা মুখ নিচু করে বলল, কটা বাজেরে রুদ্র?

তিতির বলল, পৌনে দশটা।

—বাঘকে আরও একটা মানুষ খুন করার সুযোগ না দিয়েই তার আগেই যদি বাঘকে মারা যায় সেটাই তো সম্মানের, কি বলিস তোরা?

অবশ্যই। তা ছাড়া, তেমন মারা গেলে সেটা আমাদের TERMS-এ মারা হবে।

কিন্তু এখানের গাছে তো মাচা বাঁধা যাবে না।

কেন?

সবই তো শালগাছ এখানে এবং প্রত্যেকটাই শালপ্রাংশু শাল। প্রথম শাখাই বেরিয়েছে কুড়ি ফিট ওপরে। ওখানে মাচা কী করে বাঁধা

যাবে! আর যদি মাচা বাঁধা যেতও তবেও সে মাচা খুবই উঁচু হয়ে যেত। তা থেকে বাঘকে গুলি করার তেমন সুবিধেও হত না।

তবে একটা কথা, এ অঞ্চলে জলের জায়গা বোধহয় আর নেই। সন্ধে নামলেই বা বিকেল বিকেলই বাঘ জলে আসবেই। গরম পড়ে গেছে। সন্ধের সময়ে তার তৃষ্ণা নিবারণ করতে আসতেই হবে। তারও পরে আসতে পারে মধ্যরাতে কোনও শিকার ধরে খাবার পরে। খাবার পরে খুবই তৃষ্ণার্ত বোধ করে বাঘ। এই বাঘ সম্বন্ধে একটা কথা আমরা বলতে পারি—

বলেই ঋজুদা বলল, এখানে কথাবার্তা বড় বেশি হচ্ছে। চল জিপে গিয়ে জিপ নিয়ে যমদুয়ারে ফিরি। যেতে যেতেই প্ল্যানটা করা যাবে।

যেমন বলো। আমি বললাম।

তারপরে বললাম, তিতির তুমি পেছনে যাও, আমিই চালাই।

www.boiRboi.blogspot.com

৪

বসির সর্দারকে ঋজুদা বলে এসেছিল যে আমরা বিকেল চারটের মধ্যেই ফিরে আসছি। চান করে, খেয়ে।

রাতের খাওয়াটা এখানেই করবেন বাবু।

রাতের কথা রাতে। রাতে আমরাই খাই না বাঘ আমাদের খায় তার ঠিক কি? তবে আমরা চারটের মধ্যে ফিরে আসব। আমাদের সঙ্গে একজন লোক দিলেই হবে আমাদের জলের বোতল এবং কম্বল, টর্চ, ছুরি এসব বয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্যে। তাকে আটকাব না, ছেড়ে দেব।

বসির সর্দার একটা সাদা আর একটা লাল মুরগি আর আটটা ডিম দিয়ে দিল। ডিমগুলো বাঁশের চাঙ্গারিতে দিল টাটকা শালপাতার মধ্যে আর মুরগি দুটোর পা বেঁধে জিপের পেছনে রেখে দিল।

সোয়া এগারোটার সময়ে আমরা যমদুয়ারে ফিরে এক কাপ

করে চা খেয়ে চানে গেলাম।

তিতির বলল, এই তাড়াতাড়িতে মুরগি রান্না করার ঝামেলা না করে ফেনাভাত করতে বলে দিচ্ছি। আলু আর ডিম সেদ্ধ দিয়ে দিতে বলছি। এ ছাড়াও আলাদা করে আলু কাঁচালঙ্কা পেঁয়াজ দিয়ে আমি আলুকা ভাত্তা বানিয়ে দেব।

আমাকে টাটকা পেঁয়াজ ছুলে দিতে বলবি দুটো আর দুটো কাঁচালঙ্কা।

বলে দেব। আমি চান করেই রান্নাঘরে চলে যাচ্ছি।

কী করতে? চান করে উঠে এই বারান্দাতে বসে থাক। যমদুয়ারের দুপুরের শোভা দ্যাখ। বৈশাখের দুপুরের শোভা সব বনেই আলাদা আলাদা। হাওয়াটা একটু গরম লাগে বটে কিন্তু এই রুখু ভাবটাই বড় ভাল লাগার।

তা ঠিক।

খাব তো ফেনাভাত আর আবার কিচেনে গিয়ে কী করবি। সালাউদ্দিনকে বলে দে ডেকে আলুকা ভাত্তার জন্যে যেন আলাদা করে আলু সেদ্ধ করে। খাবার পনেরো মিনিটি আগে গিয়ে ভাত্তা বানিয়ে দিস।

আলুকা ভাত্তাই যখন বানাবে তখন আর আলু সেদ্ধ দিতে বলছ কেন?

ভটকাই বলল।

—আলু কড়কড়ে করে ভেজে দিতে বলব? ডিমও ভাজতে পারে, মানে ওমলেট।

তিতির বলল।

ঋজুদা যা বলবে।

খাওয়া-দাওয়ার ব্যাপারে কোয়ার্টার-মাস্টার ভটকাই যা বলবে

www.boiRboi.blogspot.com

তাই লাস্ট ওয়ার্ড। ও এসব করতে ভালও বাসে খুব। এ ব্যাপারটা ওর ওপরেই ছেড়ে দে।

আমার এখনও এমন অবস্থা হয়নি যে ফেনাভাত রাঁধবার জন্যে বাবুর্চিখানাতে যাব।

ভটকাই বলল।

তারপর বলল, চল রুদ্র, আমরা সঙ্কোশে সাঁতার কেটে চান করি গিয়ে। হরেনেরই তো বালতি করে জল তুলতে হয়। রাতের বেলা না হয় নিরুপায়, দিনের বেলা ওকে রিলিফ দি। তা ছাড়া ঠাণ্ডা স্বচ্ছ জল—চান করে আরামও হবে খুব।

কী পরে চান করবি?

কেন? আন্ডারওয়্যার পরেই। তিতির ওদিকে তাকাবে না।

আমার বয়েই গেছে।

ঋজুদা তুমিও যাবে নাকি?

চল। এক যাত্রায় পৃথক ফল করে কি লাভ?

কটায় আমরা বেরোব এখান থেকে রাঙ্গার দিকে?

তিতির বলল।

অ্যাট টু-ফিফটিন। শার্প।

ঠিক আছে।

৫

ঠিক সওয়া দুটোতেই বেরিয়ে পড়েছিলাম আমরা। রাঙ্গাতে যখন পৌঁছলাম গিয়ে তখন সাড়ে তিনটে বাজে। বসির সর্দার তৈরিই ছিল। আমাদের সঙ্গে একটি ভুটিয়া ছেলেকে দিয়ে দিল। বলল, ওর গাদা বন্দুকটিও নিয়ে যাচ্ছে। ও নিজেও ভাল শিকারি। শুধু ওই বদমাশ বাঘকে কব্জা করতে পারল না। তারপর হেসে বলল, ভুটানি বাঘ যদি খায় তো ভুটানিকেই খাক।

ছেলেটি হেসে বলল, খাক না, খেলেও হজম করতে পারবে না।

তোমার নাম কী?

নর্বু তামাং।

নর্বু তো নেপালি নাম।

আমরা নেপালিই। কিন্তু আমার ঠাকুর্দা ভুটানে চলে গেছিলেন।

কেন?

www.boiRboi.blogspot.com

এক সাহেবের খাস বেয়ারা ছিলেন ঠাকুর্দা। নেপালে মদের ব্যবসা ছিল সাহেবের। নেপাল ছেড়ে ভুটানে গিয়ে ব্যবসা শুরু করেন তখন ঠাকুর্দাকে নিয়ে যান।

তুমি তো তাহলে মদ্য-বিশারদ।

না বাবু। আমি ছাং ছাড়া কিছু খাই না, তাও উৎসব-টুৎসবে।

তোমার দাদু অত বড় সাহেব ব্যবসায়ীর খাস বেয়ারা ছিলেন, তুমি তো সহজে ভুটানেই ভাল কাজ করতে পারতে।

না বাবু, ভুটানে নেপালিদের কেউ পছন্দ করে না, যেমন নেপালে ভুটানিদের। তাছাড়া আমার দাদুকেও মদই খেল। পথের ভিখারি হয়ে গেছিল। বাপ-মা মরা আমার এর চেয়ে ভাল ব্যবস্থা আর কী হবে!

আমরা জিপটাকে রাঙ্গা নদীর মধ্যেই একটা ঘাসের ঝোপের মধ্যে লুকিয়ে রাখলাম যাতে বাঘের চোখে নদী পেরুবার সময়ে সহজে না পড়ে। নর্বু তিনটে বড় টর্চ, পাঁচ ব্যাটারির 'বল্ড'-এর এবং চারটে কম্বল নিয়ে নিল। জলের বোতলগুলো আমরাই নিলাম একেকটা করে।

যা বোঝা গেল, পুরো প্ল্যানটা আসতে আসতে ঋজুদা ছকে নিয়েছিল। আমাকে বলল, চল, আমরা ডানদিকে যাব। তুই আর আমি রাঙ্গার যে ছোট শাখানদীটা রাঙ্গাতে এসে পড়েছে ওদিকের জঙ্গল থেকে তার দুটি মুখ কভার করে বসব। আমাদের মাটিতেই বসতে হবে, মানে, সেই ছোট নদীর উঁচু পাড়ে। গাছে মাচা বাঁধা বা বসার যখন কোনও উপায়ই নেই এত স্বল্প সময়ে।

ম্যান-ইটার বাঘ। মাটিতে বসবে ঋজুকাকা?

তিতির বলল।

www.boiRboi.blogspot.com

নর্বু বলল, মাস ছয়েক আগে শিলং থেকে দুই শিকারি এসেছিল। তারা, একটি মানুষের মড়ির কাছেই মাটিতে একজনে অন্যজনের পিঠে পিঠ লাগিয়ে রাইফেল হাতে বসেছিল রাতে। বাঘ তাদেরই মধ্যে একজনকে টুঁটি কামড়ে তুলে নিয়ে গেছিল। অন্যজন নিশ্চয়ই ঘুমিয়ে পড়েছিল। সে নিজেও তন্দ্রা গিয়ে থাকতে পারে। তার বন্ধুকে বাঘ নিয়ে যেতে তার পিঠের ওপাশটা হঠাৎ খালি হয়ে যাওয়াতে আচমকা তন্দ্রা ভেঙে সে চিতপটাং হয়ে পড়ে যায়। তখন সে এতটাই ভয় পেয়ে যায় যে সঙ্গীকে বাঘে মুখে নিয়ে যাচ্ছে তা দেখতে পেয়েও কিছু করতে পারেনি—উল্টে তাকে বোবায় ধরেছিল—।

তারপর বলল, এই বাঘ সাঙ্ঘাতিক বাঘ। মেমসাহেব ঠিকই বলেছেন। বাঘে আপনাকে নিলে মেমসাহেব বিধবা হয়ে যাবেন এই বয়সে।

সে কথাতে আমরা হেসে উঠলাম সমস্বরে। যদিও বাঘের ডেরাতে পৌঁছে হাসাহাসি করাটা একেবারেই উচিত নয়। এখন এখানে কথা বলাও উচিত নয়।

ঋজুদা বলল, আমি ডানদিকে যাচ্ছি। তুই বাঁদিকে যা।

আর আমরা?

তুই আর তিতির গিয়ে ওই বড় মাচাতে ওঠ। বাঘ আমাদের সামনের জঙ্গল দিয়েই আসবে যদি আজও ওই জঙ্গলেই থেকে থাকে, অন্যত্র না গিয়ে থাকে। তাকে দেখামাত্র আমি বা রুদ্র গুলি করব। যদি আমরা দেখতে না পাই, আমাদের চোখে ধুলো দিয়ে যদি সে রাঙ্গা নদী পার হয়ে জলে যায় তাহলে তোদের মাচার সামনে দিয়েই তাকে যেতে হবে তখন তোরা মারার সুযোগ পাবি। জলটা বন্দুকের রেঞ্জের বাইরে থাকবে তবে রাইফেলের রেঞ্জের মধ্যেই থাকবে কিন্তু তিতির

তোর ওই লাইট রাইফেল দিয়ে রাতের বেলা মানুষখেকো বাঘকে অতদূর থেকে মারা উচিত হবে না। জলে গিয়ে পৌঁছবার আগেই গুলি করতে হবে তোদের যদি গুলি করার সুযোগ পাস।

দুজনে একসঙ্গে গুলি করব কি? সেটা কি স্পোর্টসম্যানের কাজ হবে? ভটকাই ম্যাগনানিমাসলি বলল।

ঋজুদা বলল, ভুলে যাস না যে বাঘটা মানুষখেকো। "Nothing is unfair in love and war"। দুজনে কেন, নর্বু তামাংও তার গাদা বন্দুক দিয়ে গুলি করবে—যাতে বাঘের বাঁচার কোনও উপায়ই না থাকে।

'শুটিং অ্যাট্য দ্যা জেনারাল ডিরেকশান' বলছ?

আমি বললাম।

ঋজুদা হেসে ফেলল।

এই জোকটা আমি আর ঋজুদাই জানতাম। জেঠুমণির শিকারের যাত্রাপার্টিতে সব শিকারি একই সঙ্গে বন্দুক তুলে মোটর বোটের ছাদ থেকে গঙ্গার একটি দ্বীপে, মির্জাপুরের কাছে একবার দ্বীপ-ভর্তি পাখিকে গুলি করে দু'টি পালক খসিয়েছিলেন মাত্র। অতিথিদের মধ্যে দুজন সাহেবও ছিলেন। গুলির ঝড় থামলে ওই রকম হতাশ চাঁদমারির পরে যখন জেঠুমণি জিজ্ঞেস করেছিলেন, 'বাই দ্য ওয়ে, হোয়্যার ডিড উ্য এইম অ্যাট?' তখন শিকারিরা সমস্বরে বলেছিলেন, হোয়াই? উই এইমড অ্যাট দ্য জেনারেল ডিরেকশান?'

নর্বুকে তাহলে ফেরত পাঠাচ্ছ না?

ওরা তিনজনে তো মাচাতেই বসবে। ওই মাচাতে তো আর বাঘ উঠতে পারবে না। কোনও রিস্ক নেই। তাছাড়া নর্বু নিজেও তো শিকারি। যারা গাদা বন্দুক নিয়ে এইরকম বিপদসঙ্কুল জঙ্গলে একা

www.boiRboi.blogspot.com

একা শিকার করে তাদের অভিজ্ঞতা এবং সাহসের অভাব থাকে না, তারা আমাদের চেয়ে অনেক ভাল শিকারি হয়। ছাত্তার এলে আমি আর ছাত্তারই বসতাম দু জায়গাতে তোদের কারোকেই নিতাম না। এ তো বাংলা ব্যান্ডের গান নয় যে পনেরোজন মিলে বাঘকে গান গেয়ে বলতে হবে 'তোমার দেখা নাইরে, তোমার দেখা নাই।' অথবা 'বাঘ ভালবেসে গান, গান ভালবেসে বাঘ, ডাবল-ব্যারেল শটগান'।

ঋজুদার এই কথাতে নিচু স্বরে হেসে উঠলাম আমরা সবাই।

ঋজুদা বলল, বাই-ই। সি উ্য এগেইন।

তারপর নর্বুকে বলল, নর্বু তোমার চোখ ওদের চোখের থেকে অনেক ভাল, তোমরা জঙ্গলেরই মানুষ। মাঝে মাঝে আস্তে আস্তে ঘাড় ঘুরিয়ে পেছনের নদীকেও দেখো। আমরা যদি বাঘকে দেখতে না পাই, মানে আমাদের সামনে দিয়ে সে যদি যাওয়া মনস্থ না করে অন্যদিক দিয়ে নদীতে পড়ে তাহলে আমরা না দেখতে পেলেও তোমরা তো পারবে। কারণ ওই জলে পৌঁছতে ওকে তোমাদের মাচার নিচ দিয়েই যেতে হবে।

মাচাটা এত বড় যে জিম করবেটের লেখা 'ট্রি-টপস'-এর কথা মনে পড়ে যাচ্ছে। যেখানে প্রিন্সেস এলিজাবেথ এবং প্রিন্স ফিলিপ এক রাত কাটিয়েছিলেন কিনিয়াতে।

ঠিক। আমি বললাম।

তিতির বলল, ওই ট্রিটপ-এই তো রাজকুমারী খবর পেয়েছিলেন ইংল্যান্ডের রাজা জর্জ দ্যা সিক্সথ মারা গেছেন। জিম করবেট ওই বইয়ে তাই লিখেছিলেন "She went up as the Princess of England and came down as the Queen".

ঠিক। ঋজুদা বলল।

তারপর আমরা যার যার কম্বল, টর্চ, জলের বোতল এবং বন্দুক-রাইফেল নিয়ে ডানদিকে চলে গেলাম শুকনো নদীর চর পেরিয়ে।

নর্বু বলেছিল, জিনিসগুলো পৌঁছিয়ে দিই আপনাদের?

না, না। কোনও দরকার নেই। তুমি যাও ওদের নিয়ে মাচায় বোসো। বাঘ আসার সময় হয়ে গেছে। এখন থেকে যে কোনও সময়ে আসতে পার।

আমি সেই শাখানদীর বাঁদিকে গিয়ে যেখানে সে নদী এসে রাঙ্গাতে পড়েছে তার কোথায় বসা যায় তাই দেখছিলাম। দেখলাম দু'নদীর সঙ্গমের পাশেই প্রায় এক মানুষ উঁচু পাড়ে একটা ঝড়ে-পড়ে-যাওয়া অশ্বত্থ গাছ পড়ে আছে তার কাণ্ড ও ডালপালা বিস্তার করে। ঝড়ে-পড়া সে গাছের গুঁড়িটা ভাল আড়াল হবে ভেবে আমি পাড়ে উঠে সেই গুঁড়ির আড়ালে বসলাম। পাশের গুঁড়িতে রাইফেল রাখারও সুবিধা হবে। জলের বোতল, টর্চ, কম্বল সব ওই গুঁড়ির আড়ালে রেখে যখন ঘড়ি দেখলাম তখন প্রায় পাঁচটা বাজে।

ঋজুদা আমার থেকে প্রায় আড়াইশো গজ দূরে ডানদিকে বসেছে ছোট নদীর পাড়ে। তাকে আমার জায়গা থেকে দেখতে পাচ্ছি না। চারদিক থেকে নানা পাখি ডাকছে। কিছু আমার চেনা-জানা, কিছু অচেনা। মাঝে মাঝেই টিয়ার ঝাঁক ট্যাঁ-ট্যাঁ-ট্যাঁ করে ডাকতে ডাকতে মাথার ওপর দিয়ে উড়ে যাচ্ছে। খুব কাছেই একটা কাঠ-ঠোকরা ঠাক ঠাক করে যাচ্ছে অবিরত। ময়ূর ডাকছে থেমে থেমে। বনমোরগ খুব জোরে কঁকর কঁকর করে ডাকছে। একটা OSPREY মাথায় ওপরে চক্কর মারতে মারতে তীক্ষ্ণস্বরে ডাকতে ডাকতে ঘুরছে। তখন পাঁচটা বেজে কুড়ি। ঠিক এমন সময়ে সামনের জঙ্গলের গভীর থেকে

www.boiRboi.blogspot.com

উঁ—আ-উ করে ডাকল বাঘিনী। বাঘিনী না বাঘ তা ঋজুদা বুঝলেও বুঝতে পারে হয়ত নর্বু তামাং কী আবু ছাত্তার বা বসির সর্দার বলতে পারে ডাক শুনে। কিন্তু আমার পক্ষে তা বোঝা সম্ভব নয়।

বাঘ যেই ডাকল অমনি সমস্ত বন নিস্তব্ধ হয়ে গেল। যদিও বাঘ এখনও অনেক দূরে আছে। বাঘকে কেন বনের রাজা বলে তা আগেও অনেকবার নানাভাবে বুঝেছি, শুধু মানুষেরই নয়, সব পশুপাখি—আবারও সে কথা বুঝলাম। প্রেক্ষাগৃহে যখন ফার্স্ট বেল, সেকেন্ড বেল পড়ে এই প্রকৃতির প্রেক্ষাগৃহেও তেমনি ফার্স্ট বেল পড়ল যেন। এখন মঞ্চে গিরিশ ঘোষ না সর্বশ্রী শিশির ভাদুড়ী না নটী বিনোদিনী না উত্তমকুমারের আগমন হয় তারই অপেক্ষায় থাকতে হবে।

আলো ক্রমশ কমে আসছে। সূর্যাস্তের আগে আলো হঠাৎ নদীর প্রপাতে নামার মতো এক লাফে নেমে আসে অন্ধকারের দিকে। তবে সূর্য ডুবে যাওয়ার পরেও অনেকক্ষণ বনের মধ্যে পশ্চিমাকাশে লাল আভা তারপরে সাদা আভা থাকে, সমুদ্রপারে যেমন থাকে আরও অনেকক্ষণ।

বনের মধ্যের সব শব্দ মরে গেছে। আর রাজা কিছুক্ষণ বাদ বাদ একবার করে ডাকছে আর প্রতিবারই ডাকটা জোর হচ্ছে, তার মানে বাঘ আমাদের দিকে এগিয়ে আসছে। বাঘ চলন্ত অবস্থাতে ডাকতে পারে না। পারে না অথবা ডাকে না। যখন চার্জ করে আসে তখনকার হুঙ্কারের শব্দ আলাদা। এখন যে ডাক ডাকছে তা সম্ভবত সঙ্গিনী বা সঙ্গী খোঁজার ডাক, ইংরেজিতে যাকে বলে মেটিং কল। ঋজুদার সঙ্গে তো কম বনে বাঘের মোকাবিলা করতে যাইনি আজ অবধি কিন্তু এমন বাঘের ডাক শোনার সৌভাগ্য আমার হয়নি। গা ছমছম করে

উঠছে।

আমার হাতের ঘড়িতে ঠিক যখন ছটা বাজতে দশ, সেই সময় বাঘটা খুব কাছ থেকে একবার ডাকল। এবারের ডাকটা নিচু গ্রামের এবং খুবই সংক্ষিপ্ত ডাক ডাকল একটা। আমি নির্নিমেষে চেয়ে রইলাম বাঘ কোথা দিয়ে জঙ্গল থেকে নামে নদীতে তা দেখার জন্যে। একটা গেম ট্র্যাক ছিল, যেখান দিয়ে বাঘ সমেত অন্য জানোয়ারেরাও যাওয়া-আসা করে। সেই গেম-ট্র্যাকটা যেখানে এসে নদীতে পড়েছে সেদিকেই বন্দুক শুটিং পজিশন রেখে অনিমিখে চেয়ে রইলাম। আলো ক্রমশ কমে আসছে। সূর্য পশ্চিমের জঙ্গলের আড়ালে চলে গেছে। তবে কমলা আভা না থাকলেও পশ্চিমের আকাশে সাদা আভা আছে। এখনও শটগান দিয়ে মারতে কোনও অসুবিধা হবে না। ডান ব্যারেলে লেথার বল রেখেছি আর বাঁ ব্যারেলে অ্যালফাম্যাক্সের পৌনে তিন ইঞ্চি এল জি। এই বন্দুকটা ঋজুদার। WW.GREENER বত্রিশ ইঞ্চি ব্যারেল—ডাবল-চোক—ডাবল-ইজেকটার—সাইড-লক। বিলেত থেকে জেঠুমণি ইমপোর্ট করিয়ে ঋজুদাকে প্রেজেন্ট করেছিলেন। চাবুকের মতো মার বন্দুকটার।

চেয়ে থাকতে থাকতে চোখের মণিতে ব্যথা ধরে গেল। কিন্তু বাঘের কোনও সাড়াশব্দ নেই। সে কি ঋজুদার দিকে চলে গেল? আমার উপস্থিতি কি সেই আড়াল থেকে বাঘ তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে দেখে টের পেয়েছে? ঋজুদার হাতে থ্রি সেভেনটি ফাইভ—ম্যাগনাম—ডাবল ব্যারেল রাইফেল—হল্যান্ড অ্যান্ড হল্যান্ডের। যে জানোয়ারই ঋজুদার এই রাইফেলের গুলি খেয়েছে তারা পঞ্চত্ব প্রাপ্তির আগে সকলেই জেনে গেছে যে এই গুলি মোটেই সুখাদ্যর মধ্যে গণ্য নয়। এবারে এই হেভি রাইফেলটি এনেছে ঋজুদা, থ্রি সিক্সটি-সিক্সের সঙ্গে,

www.boiRboi.blogspot.com

ওড়িশার বিরিগড়ে যেমন ফোর ফিফটি-ফোর হান্ড্রেড জেফরি নাম্বার টু-টা নিয়ে গেছিল। এবারে নিজের জন্যে আরেকটা ওভার-আন্ডার শটগান এনেছে, পয়েন্ট টুয়েলভ বোরের। টুয়েলভ বোরই ভারতে স্ট্যান্ডার্ড বোর। তার উপরের বা নীচের বোর সাধারণত ব্যবহৃত হয় না। তবে ঋজুদার একটা টোয়েন্টিবোরের টলি শটগান ছিল। ডাবল ব্যারেল। জেঠুমণি বরিশালের সাহেব জজ সাহেবের কাছ থেকে কিনেছিল। আসলে বন্দুকটা ছিল মেম সাহেবের। সরু সরু গুলি ছিল ওই বন্দুকের। ইংল্যান্ডের ইলি-কীনক কোম্পানিই বানাত। মেম সাহেবই পাখি মারতেন ওই বন্দুক দিয়ে তবে ছোট হরিণ এবং খরগোশ-টরগোসও মারা যেত। আরও দেখেছি টেন এবং এইট-বোর ডাক পান। সেই সব বন্দুকের গুলিতে অনেক বেশি ছররা থাকত টুয়েলভ বোরের বন্দুকের তুলনাতে। তাই চিলিকাতে বা অন্য বড় বিলে-কাদায়, যেমন পাবনার চলন-বিলে, পাখি মারতে রাজা-মহারাজা সাহেব-সুবোরা ওই বন্দুক ব্যবহার করতেন। ব্যারিস্টার কুমুদ চৌধুরী, তাঁর ভ্রাতুস্পুত্র জেনারেল চৌধুরী, মৈমনসিংয়ের সুষুঙ্গ-এর মহারাজা, যাঁদের শিকারের শখ ছিল, পাবনার লাহিড়ী চৌধুরিদের কেউ কেউও ওই বোরের শটগান ব্যবহার করতেন চলন বিলে। এসবই আমার ঋজুদার কাছে শোনা কথা, ঋজুদা শুনেছেন জেঠুমণির কাছ থেকে।

একা বসে থাকলে জঙ্গলে কত কথাই যে মনের মধ্যে ভিড় করে আসে। মানুষখেকো বাঘকে দোরগোড়ায় দাঁড় করিয়ে রেখে কত আজেবাজে ভাবনা ভাবছি—এই অন্যমনস্কতার সুযোগ নিয়ে বাঘ যে-কোনও সময়ে আমাকে তুলে নিতে পারে। শিলং থেকে আসা পিঠে-পিঠ লাগিয়ে বসা শিকারিদের একজনকে যদি তুলে নিতে

পারে সে তবে আমি তো কোন ছার।

এবারে টেনশন বেশ বেড়ে গেল। পুরোপুরি অন্ধকার হয়ে গেছে। যেহেতু আজ পূর্ণিমা নয় নবমী তাই চাঁদটা একটু পরেই উঠবে। ওঠার পরেও বেশ কিছুক্ষণ জঙ্গলের ভেতরে থাকবে চাঁদ। যতক্ষণ না দীর্ঘ শালের জঙ্গল ছাড়িয়ে সে ওপরের আকাশে উঠে আসছে ততক্ষণ চাঁদের আলো সব জায়গাতে ছড়িয়ে পড়বে না।

বাঘ তাহলে ঋজুদার কাছেও যায়নি। হঠাৎ মনে হল মাটিতে বসা ঋজুদাকে বাঘ তুলে নিল না তো? যেই না সে কথা মনে হল আমার গলার কাছে একটা দলা পাকিয়ে উঠল। ভয়ে, দুশ্চিন্তায়, অবরুদ্ধ কান্নায়। তারপর ভাবলাম, এমন বাঘ এখনও জন্মায়নি যে হাতে অস্ত্র থাকা সত্ত্বেও ঋজুদাকে তুলে নিয়ে যেতে পারে।

কিন্তু বাঘ তাহলে গেল কোথায়? বাঘ তাহলে আমাদের কারও সামনে দিয়েই না বেরিয়ে হয় আমার বাঁদিক নয় ঋজুদার ডানদিক দিয়ে আমাদের চোখ এড়িয়ে রাঙ্গা নদী পেরিয়ে জলে যাবে। আমাদের চোখ যদি এড়াতে পারেও সে মাচার ওপরে তিন জোড়া চোখ এড়িয়ে জলে যাবে কী করে? সে সাধ্যি মাছিরও নেই। মাচার নীচে ঝোপঝাড় আগাছা এসব কিছুই নেই, তাই বাঘ যে আড়াল নিয়ে যাবে তারও উপায় নেই।

আরও আধঘণ্টা কেটে গেল। বাঘ কি নদী না পেরিয়ে আমার অথবা ঋজুদার জন্যে নিঃশব্দে আড়াল নিয়ে সামনের জঙ্গলে বসে আছে? হতে পারে। শিকারিদের মধ্যে সবচেয়ে ভাল শিকারি বাঘ শিকার ধরার জন্যে নিশ্চুপ নিঃশব্দ হয়ে একই জায়গাতে প্রয়োজনে চার ঘণ্টাও বসে থাকতে পারে। তার ধৈর্য্যের কোনও অভাব নেই। সেও সাধক। তার সাধনা দেখে মুনি-ঋষিরাও লজ্জা পেতে পারেন

www.boiRboi.blogspot.com

যদিও তাঁদের সাধনার অভীষ্ট এক নয়।

তারপরে আরও আধঘণ্টা কাটল। বাঘ তো এতক্ষণে মাচার ওপরের শিকারিদের নজরে আসা উচিত ছিল। বাঘ কি ওদিকে যায়নি? তবে কি আমাদের একজনকে ধরার অপেক্ষাতে সে আছে? এখন সাড়ে সাতটা বেজে গেছে আমার ঘড়ির রেডিয়াম দেওয়া ডায়ালে দেখলাম। চাঁদও উঠে এসেছে ওপরে। এখন ঝরঝরিয়ে চাঁদের ঝরনা ঝরছে আকাশে—তমসার নাশ হয়েছে পুরোপুরি।

এবার আমি কম্বলটম্বল রেখে বন্দুকটা রেডি পজিশনে ধরে চারধারে খুব ভাল করে নজর করে আস্তে আস্তে উঠে দাঁড়ালাম। বাঘকে যদি একবার আমার বন্দুকের রেঞ্জের মধ্যে পাই তো একটা হেস্তনেস্ত হয়ে যাবে। কিন্তু বোঝাই যাচ্ছে যে এই বাঘ মস্ত দাবাড়ু। এত সহজে কিস্তিমাত সে করতে দেবে না। তার গুটি সাজাচ্ছে সে একটা একটা করে—আমাদের নাস্তানাবুদ করবে বলে।

উঠে দাঁড়াবার পরে কম্বলটাকে কাঁধে নিয়ে জলের বোতল আর টর্চটাকে ট্রাউজারের মধ্যে গোঁজা বুশ শার্টের বুকের বোতাম খুলে ঢুকিয়ে দিয়ে বোতাম বন্ধ করে দিয়ে বন্দুক হাতে আমি উঁচু পাড় থেকে নেমে এলাম রাঙ্গা নদীতে। তারপর ঋজুদা যেদিকে ছিল সেদিকে খুব সাবধানে সামনে পেছনে দু পাশে তীক্ষ্ণ নজর রেখে এগোতে লাগলাম। একটু এগোতেই দেখলাম ঋজুদাও আমার দিকে এগিয়ে আসছে।

আমরা দুজনে মিলিত হলে আমরা মাচার দিকে চলতে লাগলাম। এখন জ্যোৎস্নায় বন ভরে গেছে। নানারকম গন্ধ ভেসে আসছে ঝুরু ঝুরু করে বয়ে যাওয়া হাওয়াতে। কোথায় এই রাঙ্গা নদীর খাতের বালিতে বসে 'আজ জ্যোৎস্না রাতে সবাই গেছে বনে'

গাইতে গাইতে মুনলাইট পিকনিক করব না উৎকণ্ঠা উদ্বেগে কণ্টকিত হয়ে মানুষখেকো বাঘের সন্ধানে ঘুরছি। পিউ-কাঁহা না ব্রেইন ফিভার পাখিটা এমন করে ঝাঁকি দিয়ে বনময় পাগলের মতো উড়ে উড়ে ডাকছে যে মনে হচ্ছে তার বাড়িতে বুঝি ডাকাত পড়েছে।

আমরা যখন মাচার কাছে প্রায় পৌঁছে গেছি তখন আমি আর ঋজুদা যে উঁচু বিভাজিকার ওপরে বসেছিলাম সেখানে একটা ওয়াটেলভ ল্যাপউইঙ্গ ডিড-ড্যি-ড্যু-ইট, ডিড-ড্যি-ড্যু-ইট করে চমকে চমকে সংক্ষিপ্ত ডাকে আমাদের বুঝিয়ে দিল যে বাঘ ওদিক দিয়ে যে জঙ্গল থেকে সে জল খেতে এখানে এসেছিল সেখানে ফিরে গেল। তার চাতুরীতে আমরা হতবাক হয়ে গেলাম। তারপরই দুটি ময়ূর এবং একটি বার্কি-ডিয়ার ওদিক থেকে একইসঙ্গে ডেকে উঠে আমাদের সন্দেহ যে অমূলক নয় তা বুঝিয়ে দিল।

মাচার কাছাকাছি আমরা গিয়ে পৌঁছতেই ওরা তিনজনে আমাদের বলার অপেক্ষা না রেখে নিজেরাই নেমে এল আস্তে আস্তে মাচা থেকে।

আমি শুধোলাম ভটকাই আর তিতিরকে, কী হল?

বাঘ তো আসেনি।

ঋজুদা বলল, এত বড় ধূর্ত বাঘ আগে আর দেখিনি।

তারপর বলল, বাঘ এসেছিল।

এসেছিল?

ওরা সমস্বরে বলে উঠল।

কিন্তু নর্বু ওদের সঙ্গে গলা মেলাল না।

ঋজুদা কিছুক্ষণ নর্বুর দিকে চেয়ে থেকে বলল, ঘটনা কী ঘটেছিল নর্বু তামাং?

নর্বু লজ্জা লজ্জা ভাব করে বলল, বাঘের তো এই গরমে, সারাদিন বিশ্রাম নেওয়ার পরে জল না খেলে চলবে না আর এ তল্লাটে অন্য কোথাওই জল নেই। বাঘ মাচাতে বসা আমাদের দেখে নিয়ে মাচার অনেক দূর দিয়ে জঙ্গলে জঙ্গলে গিয়ে জলের উল্টোদিকে শেষ প্রান্তে চলে গেছিল। তারপর মাচা থেকে জলের যে জায়গাটা দেখা যায় না সেখানে জল খেয়ে আবার ওই পথেই ফিরে গেল।

তুমি কী করে বুঝলে নর্বু?

একটা হট্টিটি খুব জোরে জোরে ডাকতে ডাকতে জলার ওপারে ঘুরে ঘুরে উড়েছিল। তখনই আমার যা বোঝার তা হয়ে গেছে।

এখন এই বাঘ মারা যায় কী করে?

সে যদি আজ কোনও মানুষ ধরে তবে কালও তো সে সেই মড়ি খেতে আসবে, একদিনে পুরো মাংস খাবে না। তখন সেই মড়ির ওপরে মাচা করে বসতে হবে। নইলে কাল জলের ওদিকে যে দু-চারটে গাছ আছে তার ওপরের দিকে বসে থাকতে হবে। মাচা-ফাচা চলবে না। চোরেরা ওই মাচা তো বানিয়েছিল নজরদারি করার আর থাকার জন্যে। এখানে বসে দূরবীন দিয়ে ওরা দেখত কোথায় বুরুন্টিকা আছে, কোথায় বড় শিংয়ের মোষ বা গাউর, তারপর মারতে যেত। অবশ্য ওদের টেলিস্কোপিক লেন্স লাগানো রাইফেলও ছিল। ইচ্ছে করলে মাচা থেকেও মারতে পারত।

চলো, আমরা ফিরি আজ নর্বু।

তারপর বলল, কাল আমরা যমদুয়ারেই থাকব। আসবে কেবল এই রুদ্রবাবু। রুদ্রবাবু আর তুমি কালকে জলের ওদিকের দুটো গাছে বসবে এসে চারটের সময়ে। তারপরে বাঘ নিয়ে আসবে যমদুয়ারে।

www.boiRboi.blogspot.com

আমি হরেনকে বলে রাখব সঙ্কোশের ওপাড় থেকে ছাং নিয়ে আসতে, আর ভুটানি মেয়ে-পুরুষের নাচেরও বন্দোবস্ত করতে। কালকে অনেক রাত অবধি তোমরা নাচগান করবে। আমরা শুনব। বসির সর্দারকেও নিয়ে এসো আসার সময়ে আর যদি রাঙ্গা বস্তিতে কোনও ছেলেমেয়ে ভাল নাচতে পারে তাদেরও।

বাঘ নিয়ে জিপে জায়গাই হবে না। তা ছাড়া বাঘ সত্যিই মারা পড়লে বস্তির মানুষ সঙ্গে সঙ্গে নিয়েও যেতে দেবে না। ওখানেও নাচ-গান হবে। বাঘটা আমাদের সব আনন্দ নষ্ট করে দিয়েছে। সকালে আবার জিপ পাঠাবেন, তখন বাঘ নিয়ে গিয়ে চামড়া ছাড়াবেন।

ঋজুদা বলল, আমি বুড়ো হয়ে যাচ্ছি। চামড়া ছাড়াতে তোমাকেও আসতে হবে।

সে হবে'খন। বাঘ তো আগে মারা যাক।

গ্রামে বসির সর্দারের সঙ্গে কথাবার্তা বলে আমরা যমদুয়ারে ফিরে এলাম পৌনে আটটা নাগাদ। পথে ঋজুদা বলল, মানুষগুলোকে বিপদের মধ্যে ফেলে এলাম। আজ রাতেই বা কাল ভোরেই যে কোনও অসাবধানী মানুষকে গ্রাম থেকে নেবে না তার কি স্থিরতা আছে? আমাদের উচিত ছিল গ্রামের মধ্যেই ভানটেজ পয়েন্টস দেগে থেকে যাওয়া।

আমি বললাম, মানুষ যে নেবেই তারও কোনও স্থিরতা নেই কারণ এ বাঘ শুধুই মানুষখেকো হলে তিনদিন অন্তর অন্তর রেগুলার ইন্টারভ্যালে মানুষ নিত। তা তো নয়, এ তো পনেরো-কুড়িদিন বাদ বাদ মানুষ ধরছে। সে যে মধ্যবর্তী সময়ে হাওয়া খেয়ে থাকছে তা তো নয়, বন্যপ্রাণী নিশ্চয়ই ধরে খাচ্ছে। তার মানে এও বটে যে, সে

www.boiRboi.blogspot.com

বুড়ো বা অন্য কোনও কারণে অশক্ত আদৌ নয়, তাই হলে বন্যপ্রাণী স্বচ্ছন্দে ধরতে পারত না।

ঋজুদা বলল, সেটা অবশ্য ঠিক কথা।

ভটকাই বলল, তোমার কাছেই শুনেছি যে ঘোড়া হচ্ছে বাঘের বিশেষ প্রিয় খাদ্য, বিশেষ করে গ্রামের টাট্টু ঘোড়া। বসির সর্দারের বাহন ঘোড়াটি তো অক্ষতই আছে। এমন চাটনি হাতের কাছে থাকতেও সে তাকে ছেড়ে রেখেছে এ কেমন কথা!

তিতির বলল, ঘোড়াকে নিশ্চয়ই বাড়ির মধ্যের উঠোনে বেঁধে রাখে বন্ধ দরজার আড়ালে। মোটা, কাঠের দরজা ভেঙে সে ঘোড়াকে নিতে পারেনি হয়তো।

আহা ঘোড়াকে কি আর সব সময়ে উঠোনে রাখতে পারে কেউ! খায়ও তো সে নিজেই চরে-চরে। তার কি আস্তাবল আছে? না সহিস? যে তাকে দুবেলা জাবনা দেবে, দলাই মলাই করবে, সাবান দিয়ে চান করাবে। ঘোড়াটার গায়ে কী বোঁটকা গন্ধ দেখলে না?

তুই আবার ঘোড়ার গায়ের গন্ধ শুঁকলি কখন? চড়েছিলি নাকি?

চড়ব কেন? ও ঘোড়া চড়তে আমার বয়েই গেছে। বারাসাতের বাগান বাড়িতে আমার দাদুর দুধসাদা ওয়েলার ঘোড়া ছিল একটা। দুটো শেটল্যান্ড পনি। তাতে চড়েছি মেয়েবেলাতে।

তসলিমা নাসরিন এই শব্দটা ভাল চালু করেছেন। এত দীর্ঘ সময়ে সব মেয়েরাই 'ছেলেবেলাকে' মেনে নিল কেন তা ভেবে পাই না।

রুদ্র বলল, ছেলেবেলা মানে তো ছেলেদের ছেলেবেলা নয়, সব ছেলেমানুষেরই ছোটবেলা। তসলিমা নাসরিন পুরুষ-বিদ্বেষী বলে ছেলে শব্দটাকে নির্বাসন দিয়েছেন।

ভটকাইয়ের কথাই আলাদা। সব কিছুরই একটা রেডি

এক্সপ্লানেশন ওর কাছে পাওয়া যাবেই।

তা তো যাবেই। ও যে নারী-বিদ্বেষী।

তিতির বলল।

যমদুয়ারে পৌঁছে ভটকাই বলল, আমি এবারে একটু মুনলাইট স্যুইমিংয়ে যাব। এমনি চাঁদনি রাতে তোমরা কেউ এমন জঙ্গলে কখনও সাঁতার কেটেছ কি?

সকলেই স্বীকার করল যে কাটেনি, ঋজুদা শুদ্ধু। কলকাতার সব এলিট ক্লাবে, ক্যালকাটা স্যুইমিং ক্লাব থেকে টলি ক্লাব পর্যন্ত চাঁদনি রাত উপভোগ করার তো কোনও উপায় নেই। পূর্ণিমা-অমাবস্যাও বোঝার উপায় নেই।

তিতির হরেন গোগোইকে ডেকে পাঠিয়েছিল রাতের রান্নার কথা বলতে। হরেন সিঁড়ি দিয়ে উঠতে উঠতে আমাদের সাঁতারের কথা শুনেছিল। সে অযাচিতভাবে বলল, খবরদার ও কর্ম করবেন না স্যার। অন্ধকার নেমে আসার সঙ্গে সঙ্গে পাহাড় থেকে এই জঙ্গলে নানা ভূত-পেত্নী নেমে আসে। তা ছাড়া জলের মধ্যে জিন-পরীরা থাকে। আপনার পা ধরে হিড়হিড়িয়ে জলের গভীরে নিয়ে গিয়ে দুটো পাথরের মধ্যে মুণ্ডুটাকে গুঁজে দেবে আর আপনি হাত পা দাবড়াতে দাবড়াতে নিশ্বাস বন্ধ হয়ে মারা যাবেন।

ঋজুদা গম্ভীর মুখে বলল, সেই সব ভূতের নাম কী?

সব নাম কি আমি জানি। ছাং-ছিনা, জিঞ্জিঘুট, পিংলাপুতু—এরকম কত ভূত আছে।

রুদ্র-ঋজু বলে কোনও ভূত নেই এখানে?

হরেন একটু অবাক এবং আহত হয়ে বলল, ছার? আপনে কি ওনাদের লয়্যা ঠাট্টা করেন নাকি? ভুলেও করবেন না ছার! তাইলে

www.boiRboi.blogspot.com

রাতে হারজোমানা আইস্যা আপনের ঘুমের মধ্যেই ঘাড়খান মটকাইয়া যাইবনে।

তুমি এত ভূতের ভয় নিয়ে এইরকম জায়গাতে থাকো কেমন করে? ভয় করে না?

একা তো রাতে থাকি না বাংলোতে কেউ না থাকলে।

ফরেস্ট ডিপার্টের কোনও সাহেব চলে এলে?

এই ধ্যাদ্দেড়ে গোবিন্দপুরে রাতেরবেলা কেউই আসে না। তা ছাড়া আসবে কেমন করে? পথে তো তখন হাতিদের মিটিং চলে। সেই হাতির দল ভেদ করে রাতেরবেলা আসার সাহস কারোরই হয় না।

তিতির বলল, ভাত, মসুরের ডাল, কালো জিরে, কাঁচালঙ্কা, ফোড়ন দিয়ে, কড়কড়ে করে আলু ভাজা, আর মুরগির পাতলা ঝোল বানাও। তারপর বলল, সালাউদ্দিনকে বলো মুরগি কেটে ছাড়িয়ে পিস করে ঝোলটা ওই বানাক। যার কর্ম তার সাজে।

সালাউদ্দিন নাকি ভাল বিরিয়ানিও রাঁধে। ছোট খাসি পাওয়া গেলে তবে না জমত!

হরেন বলল, পাওয়া যাবে ছার। ছোট শুয়োরও পাওয়া যাবে।

শুয়োর দিয়ে কি বিরিয়ানি হয়? তা ছাড়া শুয়োর তো সালাউদ্দিনের হারাম। ও তো ছোঁবেও না।

রুদ্র বলল, পাওয়া গেলে এনো একটা শুয়োরছানা, পর্ক ভিন্ডালু রেঁধে দেব আমি। খেয়ে দেখবে, অমৃত।

শেষকালে আমরা তো বটেই তিতিরও চান করল। একটা সালোয়ার কামিজ এনেছিল সেটা কাজে লেগে গেল। অনেকক্ষণ ধরে আমরা নদীর জলের মধ্যে কিলবিল করা ইলিবিলি চাঁদের সাপেদের

মধ্যে এলেবেলে খেলা খেললাম। সব ক্লান্তি ধুয়ে গেল। তারপর জামাকাপড় পরে এক কাপ করে কফি খেয়ে গতরাতের মতো বারান্দাতে ধ্যানে বসলাম। চাঁদটা একদিনেই যেন অনেক বড় হয়ে গেছে।

বাবুর্চিখানাতে সালাউদ্দিন মুরগি চড়িয়েছে। মুরগির ঝোলের গন্ধে ম-ম করছে বাংলো। এদিকে মহুয়া ফোটে না কিন্তু মুড়কি বলে সাদা সাদা একটা ফুল ফোটে.বছরের এই সময় দু মানুষ সমান গাছে। ভারী মিষ্টি গন্ধ সেই ফুলের। কাল কেন তাদের গন্ধ পাইনি কে জানে! আজ হাওয়াটাও জোর হয়েছে আর তাদের গন্ধও উড়ছে সমানে। গন্ধটা মৃদু, করৌঞ্জের মতো মৃদু, আর হাসনুহানা আর চাঁপার মাঝামাঝি গন্ধটা। হাসনুহানার গন্ধ তীব্র হয়, চাঁপার গন্ধও তীব্র হয় কিন্তু সে তীব্রতা অন্য রকমের।

আজকেও আধঘন্টাটাক আমরা চুপ করে রইলাম সকলে, যার যার ভাবনা নিয়ে। পণ্ডিচেরীর অরবিন্দ আশ্রমে যেমন কমিউনিটি মেডিটেশন হয় অনেকটা তেমন। সে কথা তিতিরকে বলতেই তিতির বলল, রোজই একটা সময়ে ঘড়ি ধরে কোনও কিছু করার অভ্যেস ভাল কিন্তু সেটা যদি বাধ্যতামূলক হয়ে যায় তবে, আমার মনে হয়, আমি ভুলও করতে পারি, সেই RITUALS থেকে প্রাণ উবে যাবে। তার মধ্যে যতটা দেখনদারি থাকে ততটা ভক্তি বা প্রকৃত গভীরতা থাকে না। থাকতে পারেই না।

এ ব্যাপারে তোমার মতটা সকলের পক্ষে গ্রাহ্য নাও হতে পারে। ভটকাই বলল।

ঋজুদা তর্ক যাতে আর না বাড়ে তাই আমাকে জিজ্ঞেস করল ক'টা বাজেরে?

www.boiRboi.blogspot.com

সাড়ে দশটা।

বলিস কি? অবশ্য তা তো হবেই। আমরা তো যমদুয়ারে ফিরলামই আটটার পরে।

তারপর বলল, তিতির আজও একটা গান শোনা। আমাদের কমিউনিটি প্রেয়ারের পর গান অবশ্যই হওয়া উচিত।

ভটকাই ঋজুদাকে শুধরে দিয়ে বলল, কথাটা কমিউনিটি মেডিটেশান, প্রেয়ার নয়।

আমাদেরটার নাম দিলাম আমি কমিউনিটি কনটেমপ্লেশান। কারও আপত্তি আছে?

আমরা সমস্বরে বললাম, দারুণ।

তিতির বলল, এক্কেবারে APT।

তিতির শুরু করল, 'অনেক দিনের আমার যে গান আমার কাছে ফিরে আসে/তারে আমি শুধাই, তুমি ঘুরে বেড়াও কোন বাতাসে/যে ফুল গেছে সকল ফেলে গন্ধ তাহার কোথায় পেলে,/যার আশা আজ শূন্য হল কী সুর জাগাও তাহার আশে।'

ঋজুদা বলে উঠল, ওই দাড়িওয়ালা মানুষটি ভগবান ছিলেন, মানুষ ছিলেন না।

তাই তো সেই ভগবানকে আজ দশচক্র ভূত বানাতে উঠেপড়ে লেগেছে। কী লজ্জার কথা, গ্লানির কথা, কী বেদনার কথা!

৬

রাতে হারজোমানো ভূত এসে আমাদের ঘাড় মটকাবে কি মটকাবে না এই সব ভাবতে ভাবতে ঘুমিয়ে পড়েছিলাম। শেষ রাত থেকে বেশ ঠাণ্ডা ঠাণ্ডা ভাব হয় একটা। পায়ের কাছে রাখা কম্বলটা টেনে নিতে হয় গায়ে। ঘুমটাও ভোরের দিকে গভীর হয়। হরেন গোগোইকে বলা ছিল যে সাড়ে পাঁচটাতে আমাদের চা দেবে। আমরা চা খেয়েই বেরিয়ে যাব রাঙ্গার দিকে।

ঋজুদা শোবার আগে বলেছিল কালকেও সারাদিন যাবে ওই রাঙ্গার বাঘের খোঁজে! কালকেও হিল্লে না হলে হ্যান্ডস-অফফ করে নেব। আমরা তো কারওকে মুচলেকা দিয়ে আসিনি যে এই বাঘ মেরেই ফিরব! তোদের একদিন বুনোমোষের দল দেখাতে হবে। তারপর একদিন নিয়ে যাব হাতি-বাথানে। হাতির দল দেখাতে। আগে থাকতে মাচা করে মাচাতে বসে থাকব বিকেল থেকে। চাঁদনি রাত

আছে। ঘাসবনে বুনোমোষেদের দল চরে বেড়াচ্ছে দেখবি তারপর তারা সঙ্কোশ নদীর দিকে যাবে চলে। হাতির দলও জল খেতে, চান করতে যাবে নদীতে। অনেক সময়ে যমদুয়ার বাংলোর সামনেই চলে আসে হাতি। বড় দাঁতাল, মাকনা, গণেশ সব।

গণেশ কী?

তিতির জিজ্ঞেস করেছিল।

গণেশ বলে এক দাঁতি হাতিকে। প্রকাণ্ড বড় একদাঁতি গণেশ হয়। ডানদিকে দাঁত থাকলে তাকে এখানে বলে ডায়না গণেশ আর বাঁদিকে থাকলে বলে বাঁয়া গণেশ। লালজি যখন মূর্তির বিট অফিসারের বাড়িতে থাকতেন পশ্চিমবঙ্গ সরকারের অনুরোধে উত্তরবঙ্গের বুনো হাতি তাড়িয়ে অন্যদিকে সরিয়ে দেবার জন্যে, তখন তাঁর কাছে একটি পাহাড়ের মতো বাঁয়া গণেশ ছিল। গণেশদের অনেকে পুজো করে। রাজা মহারাজারা বাড়িতে গণেশ রাখতেন। সিদ্ধিলাভের জন্যে। ওই গণেশটাকে কেনবার জন্য যোধপুরের মহারানি ঝুলোঝুলি করেছিলেন অনেকবার। লালজি দেননি।

আর মাকনা?

মাকনা হল সেই পুরুষ হাতি যাদের দাঁত শুঁড়ের নীচে থাকে, বাইরে থেকে দেখা যায় না।

তখনও আকাশ পরিষ্কার হয়নি। বনমুরগি আর নানা পাখি ডাকাডাকি করছিল। ফুলের গাছেরা সারারাত হাওয়াতে গন্ধ উড়িয়ে এখন একটু শুয়ে নিচ্ছিল বোধহয়। চোখ বন্ধ করে এই সময়ে জঙ্গলে শুয়ে থাকতে ভারী লাগে কম্বলের নীচে।

হঠাৎ ঘুম ভেঙে গেল একটা ঘোড়ার হ্রেষাধ্বনিতে এবং নীচে হরেন ও সালাউদ্দিনের উচ্চকিত ও উত্তেজিত কথাবার্তাতে। দরজা

www.boiRboi.blogspot.com

খুলে বাইরে বেরিয়ে নীচে চেয়ে দেখি বসির সর্দার চেঁচিয়ে ডাকছে বাবুগণ! বাবুগণ!

কী ব্যাপার?

ততক্ষণে সকলেই বারান্দায় এসে দাঁড়িয়েছি।

ঋজুদা বলল, কী হল সর্দার?

সর্বনাশ হয়ে গেল বাবু। নর্বু লামাকে বাঘে নিয়ে গেছে। সে বারণ না শুনে তার বাড়ির দাওয়াতে দাওয়ার দেওয়ালে হেলান দিয়ে তার বন্দুক গেদে বসেছিল। তাঁর বাঁদিকে রেখেছিল মাটির তিন-চারটে বড় বড় জালা যাতে বাঘ ওইদিক দিয়ে আসার চেষ্টা করলে জালাগুলো পড়ে গিয়ে শব্দ হয় এবং ওর যদি তন্দ্রাও আসে তাহলে তা চটকে যাবে। আর সামনে ও ডানদিকে তো চেয়েই থাকবে। বাঘ যদি আসে তাকে ধরতে তো বাঘের বুকে নল ঠেকিয়ে সে বাঘকে সাবড়ে দেব।

আমি অনেক করে বারণ করেছিলাম। ও কিছুতেই শুনল না। বলল, তিনদিন হালায় না খাইয়া আছে আজ সে ঠিক মানুষ ধইরতে আইসব।

আমি বললাম, বাবুগণ তো কাল সকালেই আসবেন নাস্তা করে। তর এত তাড়াটা কীসের? এতদিনই যহনে গেল গিয়া। বাবুগণ আইলে, তহনেই যাস ওদের সঙ্গে।

তারপর একটু থেমে বলল, ও বোধহয় আপনাদের কাছে বাহাদুরি করতে চেয়েছিল। আপনারা আসার আগেই বাঘটাকে মেরে ও আপনাদের পিঠ চাপড়ানির আশা করেছিল আর দেখেন এখন আমরা হগগলডায় কপাল চাপড়াইয়া মরতাছি। গ্রামে ওই ছিল একমাত্র ভাল শিকারি। তারেও লইয়া গেল গিয়া বাঘে। এহনে আমরা

www.boiRboi.blogspot.com

কী করুম!

ঋজুদা বলল, হরেন, বসির মিঞাকে চা-বিস্কিট দাও। আমাদেরও দাও। সালাউদ্দিন তুমি তৈরি হয়ে নাও, তোমাকে আজ দরকার হতে পারে।

জি!

বলে সালাউদ্দিন লুঙি ছেড়ে পেন্টুলুন পরতে গেল।

হরেন তাড়াতাড়ি জল গরম করে ট্রেতে করে চা নিয়ে এল ওপরে। আমরা মুখ ধুয়ে চটপট তৈরি হয়ে নিলাম নিজের নিজের ওয়েপনস নিয়ে, চা খেয়েই নীচে নেমে এলাম।

ঋজুদা বলল, তোমার ঘোড়া এখানেই রেখে যাও। পরে জিপে করে এসে নিয়ে যেও। সালাউদ্দিন জিপ স্টার্ট করে বাংলোর নিচ থেকে জিপ বের করে ঘুরিয়ে স্টিয়ারিংয়ে বসল। সালাউদ্দিনের একটা খাকি টুপি ছিল। সেই টুপিটা আর সানগ্লাসটা পরে নিল ও। ব্যাঙলনের লালরঙা গেঞ্জির ওপরে একটা লালরঙা গামছা গলাতে জড়িয়ে নিল। ঋজুদা আর তিতির সামনে বসল। বসির মিঞাকে নিয়ে আমি আর ভটকাই পেছনে বসলাম।

ঋজুদা বলল, ডাইনে বাঁয়ে যাবার নেই। পথ একেবারে সোজা। জোরে চলো সালাউদ্দিন।

কখন ঘটল ঘটনাটা?

শেষ রাতে। সে তার বাড়ির দাওয়াতে বসেছিল রাতে খিচুড়ি খ্যায়া। আমার বিবিরে কইছিল খিচুড়ি রাঁধবার লইগ্যা। আচার দিয়া খিচুড়ি খাইয়া কইল ব্যাশ খাইলাম চাচি। আজ বাঘটা মারি—তাইলে বিরিয়ানি খাওয়াইবা তো?

বিবি বলল, সব হইব অনে। বেটা, বাঘ তো মারো তুমি। না

মাইরতে পারলেও খাওয়াইব।

মাটির জালাগুলো কিন্তু ভাঙেনি। তিনটে জালার মধ্যের ফাঁক দিয়ে এসে বাঘ তাকে বাঁদিক থেকে তুলে নিয়ে যায়। গুরুম করে একটা গুলির আওয়াজ হতেই আমরা সকলেই ভাবলাম বাঘ মেরেছে নর্বু। পড়ি কি মরি করে সকলেই লুঙি বেঁধে বাইরে ওর ঘরের দিকে কুপি হাতে করে এসে দেখি বন্দুকটা মাটিতে পড়ে আছে আর নর্বু নেই। কাছে গিয়ে দেখি চাপ চাপ রক্ত—বাঘ নর্বুকে হিঁচড়ে টেনে নিয়ে গেছে নদীর দিকে। ওর বাড়িই শেষ বাড়ি ছিল গ্রামের। ওর ঘরের পর আর ঘর ছিল না কোনও।

তারপর?

সালাউদ্দিন এত জোরে গাড়ি চালাচ্ছিল যে কিছু শোনা যাচ্ছিল না ভাল করে।

তারপর কী হল বসির সর্দার?

তারপর আমরা সেই রক্ত আর হিঁচড়ানোর দাগ দেখে এগিয়ে গিয়ে দেখি বাঘ রাঙ্গা নদীর বুকেই একটা হুঁয়ালো গাছের নীচে নাঙ্গা নর্বুকে উপুড় করে ফেলে রেখে তার পেছন থেকে মাংস খাচ্ছে। ততক্ষণে আকাশ ফর্সা হয়ে গেছে। আমাদের মধ্যে যারা তীর-ধনুক নিয়ে এসেছিল তারা হুঙ্কার দিয়ে তীর ছুঁড়ল আর বদরুদ্দিন, যার একটা গাদা বন্দুক ছিল সে তা দিয়ে চোট করল। অনেক দূর থেকে তো। বাঘের গায়ে চোট লাগল কি না বোঝা গেল না কিন্তু বাঘ হুঙ্কার দিয়ে আমাদের দিকে তেড়ে এল। আমাকে প্রায় ধরেই ফেলেছিল কিন্তু আমাদের ওপরে চড়াও হয়ে রাগে গরগর করতে করতে ফিরে গেল।

আর তোমরা?

আমরা আর কী করব? পড়ি কি মরি করে দৌড় লাগিয়ে সবাই ছত্রখান হয়ে গ্রামে ফিরলাম। বদরুদ্দিন যদি ভাল শিকারি হত আর যদি ওর সাহস থাকত তবে তখুনি ও বাঘের কাছে গিয়ে নিশানা নিয়ে গুলি করলে বাঘ মারতে পারত।

কী বলছে বদরুদ্দিন এখন? আবার বারুদ পুরে গেল না কেন বাঘের কাছে?

আবার কী যাবে? দৌড়ে আসতে গিয়ে ওর লুঙি খুলে পথের ওপরে পড়ে রইল। ওর মুখ দিয়ে খুব ফেনা বেরতে লাগল। কিন্তু কথা বলতে পারছে না ও। বোবা হয়ে গেছে।

তিতির বলল, বোবা হয়ে গেছে?

হ্যাঁ মেমসাহেব।

ঋজুদা বলল, কিল-এর ওপরেই আমাদের ওকে মারতে হবে। ওখানে পৌঁছেই আমাদের চারদিকে ছড়িয়ে যেতে হবে, যাতে বাঘ পালাতে না পারে এবং একস্ট্রা গুলি সকলেই নিয়ে নে থলে থেকে। রেঞ্জের মধ্যে এলেই গুলি করবি, গুলির পর গুলি। আমি ওর পালানোর পথ বন্ধ করার জন্যে ওর পেছনে চলে যাব, দেখিস কেউ আবার বাঘ মারতে গিয়ে আমাকেই গুলি করে বসিস না।

রাঙ্গা গ্রামে পৌঁছেই আমরা দেখলাম গ্রামের পথের দুপাশে ওরা ভিড় করে আছে। ওরা অনেক কিছু বলতে চাইল কিন্তু ঋজুদা সালাউদ্দিনকে বলল, তুমি এগিয়ে চলো সালাউদ্দিন। বসির সর্দার তুমি পথ দেখাও।

পথ দেখাবার কিছু ছিল না। রাঙ্গা নদীর শুকনো খাতের ওপর দিয়েই জিপ এগোল একটুখানি। বসির মিঞা আঙুল দিয়ে দেখাল ওই হুঁয়ালো গাছ। ঋজুদা তিতিরকে ধাক্কা দিয়ে বলল, নাম নাম। আমি

www.boiRboi.blogspot.com

আর ভটকাই পেছন থেকে লাফিয়ে নামলাম। ঋজুদা বলল, সালাউদ্দিন তুমি সর্দারকে নিয়ে গ্রামে ফিরে যাও। গুলির শব্দ শুনলে সকলে মিলে আসবে। একটা গুলি নয় হয়তো অনেকগুলো গুলির শব্দ শুনতে পাবে। আমরা চারজনে নেমে যেতেই সালাউদ্দিন জোরে জিপ ঘুরিয়ে চলে গেল। যে যেন বাঁচল বলে মনে হল।

ঋজুদাকে দেখতে পাচ্ছিলাম ডানদিকে, কাল আমরা যে শাখানদীর পাড়ে বসেছিলাম সেদিকে চলে যেতে। তিতির, রুদ্র আর আমি অর্ধচন্দ্রকারে বন্দুক, রাইফেল রেডি পজিশনে ধরে তাড়াতাড়ি এগোতে লাগলাম সেই হুঁয়ালো গাছের দিকে। একটু এগিয়েই নর্বুকে দেখতে পেলাম। কিন্তু বাঘ নেই তার ওপরে। হুঁয়ালো গাছটার নীচে—এলিফ্যান্ট গ্রাসের একটা বড় ঝোপ ছিল। বাঘ হয়তো সেখানে গিয়ে আড়াল নিয়েছে জিপের আওয়াজ শুনে। আমি ফিসফিস করে রুদ্রকে বললাম, তুই আর তিতির তাড়াতাড়ি মাচার দিকে যা। বাঘ ওইদিক দিয়েও পালাবার চেষ্টা করতে পারে। ওরাও বাঁদিকে সরে গেলে বন্দুক কাঁধে তুলে আমি ট্রিগারে হাত দিয়ে নর্বুর দিকে এগোতে লাগলাম। বাঘের কোনও সাড়াশব্দ নেই। আমি কোনও রিস্ক নিলাম না। ঝোপটা লক্ষ্য করে বাঁদিকের ব্যারেলের এল.জি. বাঘের উচ্চতা অনুমান করে ফায়ার করলাম। সঙ্গে সঙ্গে বাঘ ছিলা ছেঁড়া ধনুকের মতো একটা প্রকাণ্ড লাফ দিয় উঠল সোজা ওপরে। পেটে গুলি লাগলে অনেক সময়েই বাঘ বা চিতা ওরকম করে দেখেছি। বাঘ যখন শূন্যে, যখন নেমে আসছে শূন্য থেকে জমিতে আমি ডানদিকের ব্যারেলের লেথাল বল ফায়ার করলাম কোনও বিশেষ জায়গা লক্ষ্য না করেই। বাঘ কিন্তু কোনও শব্দ করল না। আমার গুলির শব্দ শুনেই তিতির আর ভটকাই এদিকে দৌড়ে

এল। ওরা বাঘকে লাফাতে দেখেছিল কি না বুঝতে পারলাম না। আমি ঝোপের দিকে দেখলাম তাড়াতাড়ি বন্দুকে গুলি রি-লোড করতে করতে। ওই ঝোপের দিকে এইম করে তিতির আর রুদ্রও ওদের বন্দুকের আর রাইফেলের এক রাউন্ড করে গুলি ছুঁড়ল। আর পরক্ষণেই ঝোপের মধ্যে একটা আলোড়ন তুলে ঝোপ ভেঙে বাঘ ডানদিকে দৌড় লাগাল ঋজুদা যেখানে ওই নদী পাড়ে হেলান দিয়ে দাঁড়িয়ে রাইফেল তুলে তৈরি ছিল। ঋজুদার অনুমান যে এতখানি সত্যি হবে তা বুঝতে পারিনি। বাঘ সোজাই যাচ্ছিল হঠাৎ ঋজুদাকে দেখতে পেয়েই গতি পরিবর্তন করে নিজের বাঁদিকে রাঙ্গা নদীর বুক ধরে দৌড়ে গেল। কিন্তু বেশিদূর যেতে পারল না। ঋজুদার থ্রি সেভেনটি ফাইভ ডাবল-ব্যারেল রাইফেলের দুটি সফ্‌ট-নোজ্‌ড গুলি বাঘের বুক এবং কানে লাগল। কী ক্ষিপ্রতার সঙ্গে যে গুলি দুটো করল ঋজুদা তা নিজের চোখে না দেখলে বিশ্বাস করতাম না। রাইফেলের হোল্ডিং স্থির রেখে তর্জনী ও মধ্যমা দিয়ে রাইফেলের দুটি ব্যারেল প্রায় একই সঙ্গে ফায়ার করার অভ্যাস বহুদিন থেকেই রপ্ত করেছিল এবং দু চোখ খুলে গুলি করার অভ্যেস। 'মাস্টার আই' কোন চোখটা তা আমাকেও হাতে ধরে শিখিয়েছিল এবং কী করে দু ব্যারেল প্রায় একই সঙ্গে মধ্যমা ও তর্জনী দিয়ে পুল করতে হয় তাও। কিন্তু এখনও ওই দুরুহ বিদ্যাতে পারঙ্গম হতে পারিনি। আরও অনেক সময় লাগবে মনে হয়।

বাঘটা বালির ওপরে শুয়ে পড়ে কয়েক মিনিট থরথর করে কেঁপে স্থির হয়ে গেল।

পেছনে ফিরে দেখি জিপ নিয়ে সালাউদ্দিন এবং জিপের মধ্যে কম করে দশ-পনেরোজন মানুষ এবং তাদের পেছনে পেছনে আরও মানুষ

www.boiRboi.blogspot.com

দৌড়ে আসছে। বসির মিঞা দৌড়ে এসে সবচেয়ে সামনে আমাকে পেয়ে জড়িয়ে ধরে কাঁদতে লাগল। আমি আঙুল দিয়ে ঋজুদাকে দেখিয়ে বললাম, ওই যে, বাবুই মেরেছেন বাঘ। গ্রামের অর্ধেক মানুষ বাঘের দিকে দৌড়ে গেল আর অর্ধেক গেল ঋজুদার কাছে।

ঋজুদা বলল, এবার নর্বুর দাহ করার বন্দোবস্ত করো। মুখে আগুন কে দেবে?

ওর তো কেউ নেই। শাদিই করেনি। তবে আমাদেরই গ্রামের এক মেয়ের সঙ্গে ওর আসিয়ানা ছিল।

হিন্দু সে?

না। মুসলমান।

তাতে কী? মানুষ তো। সেই দেবে মুখে আগুন।

তারপর বিড়বিড় করে বলল,

না তু হিন্দু হ্যায়,
না মুসলমান,
ইনসানকি আওলাদ হ্যায়,
তু ইনসানহি বনেগা।

———

www.boiRboi.blogspot.com

আমার কিছু কথা

আমার একটা স্বপ্নের বাস্তবায়ন হলো এই ওয়েবসাইটের মধ্য দিয়ে। ছোটবেলা থেকেই আমার বইপড়া অভ্যাস। আমার পড়া প্রথম উপন্যাস শ্রী শরৎ চন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের 'পথের দাবী',তখন আমি প্রাথমিক বিদ্যালয়েও ভর্তি হইনি।তারপর থেকে প্রায় ২০ বছর ধরে অসংখ্য বই আমি পড়েছি,সংগ্রহের ইচ্ছা থাকলেও আর্থিক অবস্থা আমাকে সেই সুযোগ দেয় নি। ইন্টারনেটের সাথে পরিচিত হওয়ার পর থেকেই আমি বাংলা বই ডাউনলোডের সুযোগ খুঁজতাম,কিন্তু এক মূর্চ্ছনা ছাড়া আর তেমন কোন সাইট আমি পাইনি। মূর্চ্ছনাতেও নিয়মিত বই আপডেট হয়না বলে আমি নিজেই আমার অতিক্ষুদ্র সামর্থ্যের (এতই ক্ষুদ্র যে গ্রামীনের ইন্টারনেট চার্জ টা আমাকে টিউশনি করে জোগাড় করতে হয়।

তবু আমি আমার চেষ্টা অব্যাহত রাখব, নতুন পুরাতন সমস্ত (বিশেষ করে পশ্চিমবাংলার লেখকদের বই) লেখাই আমি এখানে দেওয়ার আশা রাখি।

আপনাদের কাছে একটা ছোট্ট অনুরোধ, আমাকে একটু সাহায্য করুন,তবে টাকা দিয়ে নয়। আমার এই ওয়েবসাইটে কিছু Google এর বিজ্ঞাপন আছে,যে কোনো একটা বিজ্ঞাপন মাসে একবার (হ্যাঁ,মাসে একবারই,তার বেশী নয়) যদি একটু ১০ মিনিট ব্রাউজ করেন,তাহলে আমি একটু উপকৃত হই। আপনাদের পছন্দের বইগুলো যদি ডাউনলোড চান তাহলে মেসেজবক্সে আমাকে মেসেজ দেবেন। আমি চেষ্টা করব বইটা দেওয়ার। যদি সফটওয়্যার দরকার হয়,তাহলে যান http://www.download-at-now.blogspot.com/ এই ঠিকানায়। সব সফটওয়্যার সিরিয়াল/ক্রাক/কিজেন যুক্ত। কোন সফটওয়্যার তৈরী করার দরকার হলেও আমাকে বলতে পারেন,আমি একজন সফটওয়্যার ডেভেলপার।

মোবাইল: ০১৭৩৪৫৫৫৫৪১
ইমেইল: ayan.00.84@gmail.com